হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ



এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে ফিরে যাবনা। পথে যদি মৃত্যু আসে, আসুক, দুঃখ নেই।

(গুয়াঝাউ থেকে যাত্রাকালে)

আপনি আমার দেহকে আটকে রাখতে পারেন আমার মনকে নয়।

(তুরফান রাজাকে)



জন্ম কোলকাতায় চল্লিশের দশকে।

আশুতোষ কলেজ থেকে আই.এস.সি, তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.সি.ই উত্তীর্ণ স্নাতক।

কর্মজীবনের শুরু উত্তাল সত্তরের দশকে। সাহিত্য-অনুরাগী ও ভ্রমণ পিয়াসী। দশের দশকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ ও বিবিধ বিষয়ক চর্চায় কালযাপন।

১৯৯৮ থেকে এ যাবৎ নানা স্বাদের আটটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে।

❖ পার্লহার্বার
❖ কার্গিল কাশ্মীর

❖ অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী দর্শন
❖ কুমায়ুন ভ্রমণ
❖ সাগরে মন্দিরে নীলাচল

❖ প্রলয় দানব সুনামি
❖ ঈশ্বর দেবতা ও সৃষ্টি
❖ ধর্ম ভাবনা ও বিজ্ঞান ভাবনা

হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ

বিপুল সাহা



অনুভাব প্রকাশনী

Hiuen Tsanger Bharat Vraman
by Bipul Saha
published by Anubhab Prakashani

Price : Rs.60.00

গ্রন্থসত্ত্ব : ভারতী সাহা

প্রকাশ কাল : আগস্ট, ২০০৮

প্রকাশক : বিপ্রদাস ভট্টাচার্য
অনুভাব প্রকাশনী
১৪৪বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলকাতা - ৭০০০২৫

মুদ্রক : আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি
১৩, ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদচিত্র : হিউয়েন সাঙের ব্রোঞ্জ মূর্তি ও
জুয়ান জ্যাঙ মেমোরিয়াল হল, নালন্দা, বিহার

প্রচ্ছদ রূপায়ন : রূপা পাল

অক্ষরবিন্যাস : লেখক

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট -৭৩
আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট -৭৩
পাত্রজ পাব্লিকেশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট -৭৩
এবং
পি-২৪৫/১ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড -১০
দূরভাষ - ০৩৩-৩২৫৫-০২৯১

মূল্য : ৬০ টাকা

মহামানব বুদ্ধ

ও

পরিব্রাজক
হিউয়েন সাঙ

স্মরণে

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে হিউয়েন সাঙের মুদ্রিত চিত্রটি আমাদের খুব আকর্ষণ করত। চৈনিক পর্যটকের পৃষ্ঠদেশে থাকা বাঁকানো জিনিসটা নিয়ে অনেক গবেষণার পর ইজিচেয়ার-কাম-ছাতার মতো কিছু একটা বলে মনে হয়েছিল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ঐ বস্তুটি তাঁর শয়ন-উপবেশনের জন্য দারুণভাবে কাজের। ভাবনায় ছিল, যদি কখনো দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়ে পড়ি তবে ওটা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। বড়ো হয়ে অনেক ঘুরলাম বটে কিন্তু হিউয়েন সাঙের সেই ইজিচেয়ার-কাম-ছাতা আর বানানো হল না।

সম্প্রতি বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে হিউয়েন সাঙের নামে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে। সেখানে ঐ মহান পরিব্রাজকের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছি। ভাবলাম – এই সুযোগে একবার দেখে আসা যাক। রাজগৃহ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে 'জুয়ান জ্যাঙ মেমোরিয়াল হল'। স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা। অন্য দর্শক নেই বললেই চলে। ইতিহাস নিয়ে আজকাল কে আর মাথা ঘামায়! সবুজ উদ্যানের মুক্ত পরিবেশে উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত হয়েছে সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মূর্তি। অবিকল ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে-আসা হিউয়েন সাঙের চিত্র। মাথার উপর ওটা ছাতাই তো। তা থেকে সামনের দিকে ঝুলছে ঘট। ওটা আলোকদীপ না ধূপদানী? পিঠের উপর বাঁকানো ইজিচেয়ারের মতো সেই জিনিসটা আছে। ইজিচেয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাক বা না-যাক রুকস্যাক হিসেবে অভিনব। দুরন্ত পর্যটকের পরনে হাঁটু অবধি ঝোলা পোষাক। গায়ে ঢোলাহাতা চিনা কামিজ। পায়ে স্যান্ডাল। এ বেশেই উনি চিন থেকে বেরিয়েছেন? মূর্তির পিছনে বড়ো সভাকক্ষ। ভিতরে হিউয়েন সাঙ ও শীলভদ্রের ছবি আছে। সামনে আরাধ্য মূর্তি। দু'পাশে সোনালি রঙে আঁকা বিশাল দুটি চিত্র। স্মৃতিমন্দিরে হিউয়েন সাঙের পুস্তিকাদির খোঁজ করে নিরাশ হতে হল।

সেখানেই ব্যাপারটার ইতি হল না। প্রবাদ আছে, নেই কাজ তো খই ভাজ। ভ্রমণ-গুরু সম্পর্কে তত্ত্বতালাশ শুরু হল। তারই ফলশ্রুতি – অযোগ্য হাতে সাধারণ পাঠককুলের জন্য তাঁর ভ্রমণকথা তুলে ধরার চেষ্টা। ইতিহাসের সুদূর অতীতেও যে এমন আশ্চর্য দেশকালের ধূসর গন্ধমাখা ভ্রমণকাহিনী আছে যদি তা কারো ভালো লেগে যায়, এই আশায়।

হিউয়েন সাঙের জীবনকাহিনী লিখেছেন তাঁর শিষ্য হুই-লি এবং ইয়েন-সাঙ। চিনা ভাষায় রচিত জীবনকথার সমগ্র দশটি অধ্যায় ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লি-ইয়াং-সি ১৯৫৮ সালে। পিকিংয়ের চিনা বৌদ্ধসঙঘ প্রকাশ করে। পুনর্মুদ্রিত প্রকাশনা হয় ২০০৫ সালে নিউ দিল্লির অক্ষয় প্রকাশন থেকে। স্যামুয়েল বিল ১৮৮৪ সালে চিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ

করেন 'সি-ইউ-কি বুদ্ধিস্ট রেকর্ড অব দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড'। ১৯৯৫ সালে তারই পুনর্মুদ্রিত খণ্ড হাতে পেয়েছি। আর টমাস ওয়াটার্স লিখেছেন 'অন ইউয়েন চোয়াংস ট্রাভেল ইন ইণ্ডিয়া' ১৯০৪-০৫ সালে। পরে সম্পাদনা করেছেন রিস ডেভিডস ও বুসেল। ২০০৪ সালে তার পুনর্মুদ্রন দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের রচনাটিও সেখানে আছে। এগুলি বর্তমান রচনার আকর গ্রন্থ।

এ ছাড়া সাহায্যলাভ করেছি শ্রী অনুকুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম', শ্রী সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধদেব', শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়ের 'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ ফা হিয়েন', শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'বৌদ্ধদর্শন', শ্রী রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস', ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর 'বৌদ্ধদের দেবদেবী', ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে) রচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' ও ডঃ সাধন চন্দ্র সরকারের 'বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য' নামক গ্রন্থাবলী থেকে। কিছু তথ্য আন্তর্জাল (ইন্টারনেট) ঘেঁটে পেয়েছি।

আলোচ্য গ্রন্থ ঠিক অনুবাদ নয় – ইতিহাস অবিকৃত রেখে আশ্চর্য ভ্রমণের আনন্দধারায় অবগাহনই প্রধান উদ্দেশ্য। কিছু কিছু স্থান নাম, বৌদ্ধ দেবদেবী ও বৌদ্ধাচার্যের চৈনিক নাম দেওয়া হয়েছে চিনা পরিব্রাজকের স্মরণে। প্রাচীন সেই সকল রাজ্য ও নগর বর্তমানে অন্য নামে পরিচিত – তার কিছুর হদিশ মিলেছে, কিছুর নয়। বিবরণে নানা অলৌকিক কাহিনী আছে। আছে নানা জাতক কাহিনী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জুড়তেই হয়েছে অর্থবোধে সাহায্য হবে বলে। কিছু কাহিনী বর্জিত হয়েছে। কিছু কাহিনীর ক্ষেত্রে ঘটেছে সংক্ষিপ্ত অবতারণা। উদ্দেশ্য – গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি করে পাঠকসমাজের আরো শিরঃপীড়ার কারণ না হই এবং গ্রন্থমুদ্রণের জন্য অর্থদণ্ড কিঞ্চিৎ সীমিত রাখা যায়।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমস্ত দূরত্বের হিসেব দিয়েছেন 'লি' নামক স্কেলে। সাধারণভাবে ১৬ লি = ৩ মাইল। এক লি এক মাইলের এক-পঞ্চমাংশের মতো। পর্যটন মানচিত্র হুই-লি ও ইয়েন চাঙের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। হিউয়েন সাঙের একটি ছবিও।

ভ্রাতৃ প্রতীম শ্রী দুর্গাদাস চক্রবর্তী একেবারে শেষলগ্নে অধুনা দুষ্প্রাপ্য শ্রী প্রেমময় দাশগুপ্তর 'হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত' গ্রন্থের প্রতিলিপি দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। প্রচ্ছদ রচনায় শ্রীমতী রূপা পাল ও মুদ্রণে শ্রী সঞ্জীব সাহা সাহায্য করেছে। প্রকাশকের ছত্রছায়া দান করেছেন শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। মুদ্রণব্যয় বহনে অভাবিত দায় নিয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সন্দীপ্ত। সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

এখন পাঠক সমাজের কাছে কিঞ্চিৎ সমাদৃত হলেই তবে সকলের সকল শ্রম সার্থক।

– বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা -১০

এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে ফিরে যাব না। পথে যদি মৃত্যু আসে, আসুক, দুঃখ নেই। (পৃঃ ১৯)

পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমদেশে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে, তবে তাই হোক। (পৃঃ-২২)

রাজন, আপনি আমার দেহকে আটক রাখতে পারেন। আমার মনকে পারেন না। (পৃঃ-২৪)

ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতি নিবেদন করতে যাত্রা করেছি। পথে হিংস্র জন্তু থাকলেও যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হবো না। আর ডাকাতরাও তো মানুষ। (পৃঃ-৪৯)

হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ

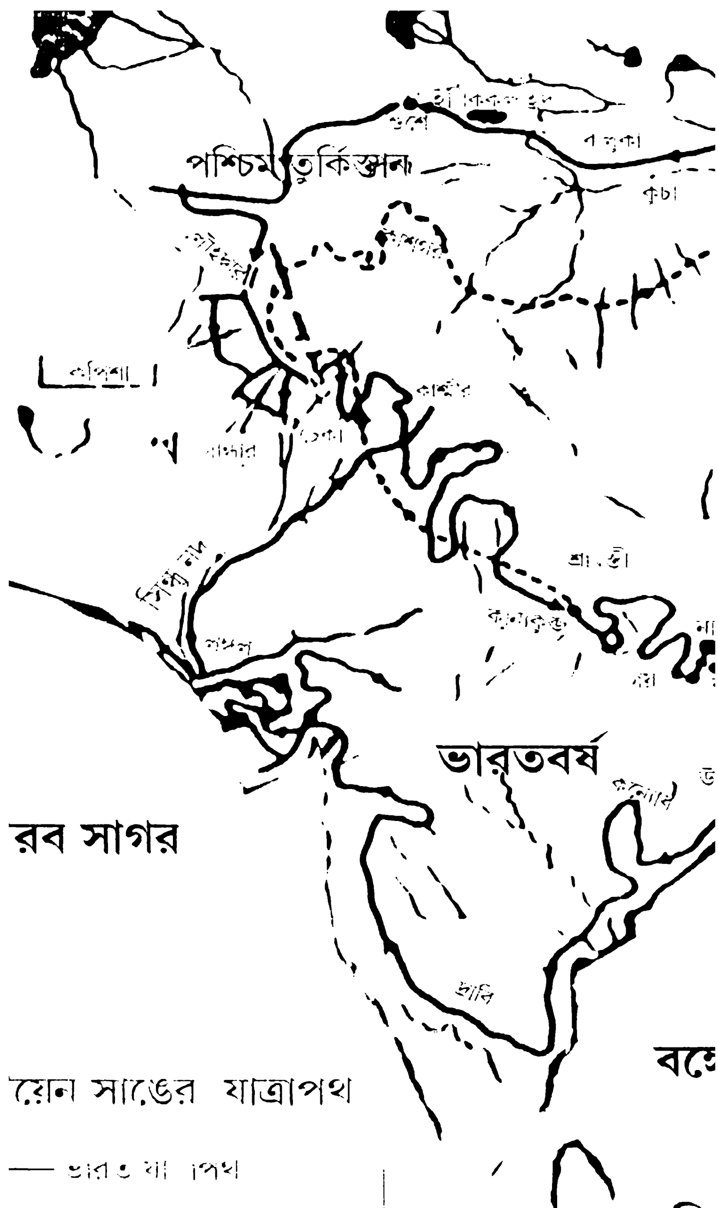
১। পটভূমি

'পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে তবে তাই হোক।' আজ থেকে ১৩৭৮ বছর আগে একথা বলেছিলেন ভারত ভ্রমণে উন্মুখ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। যাত্রা করেছিলেন সুদূর চিন থেকে জু-লাই (ভগবান বুদ্ধ)-র লীলাভূমি ভারতবর্ষের দিকে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিশায়। ঠিক পশ্চিমও নয়, বলা উচিত দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে।

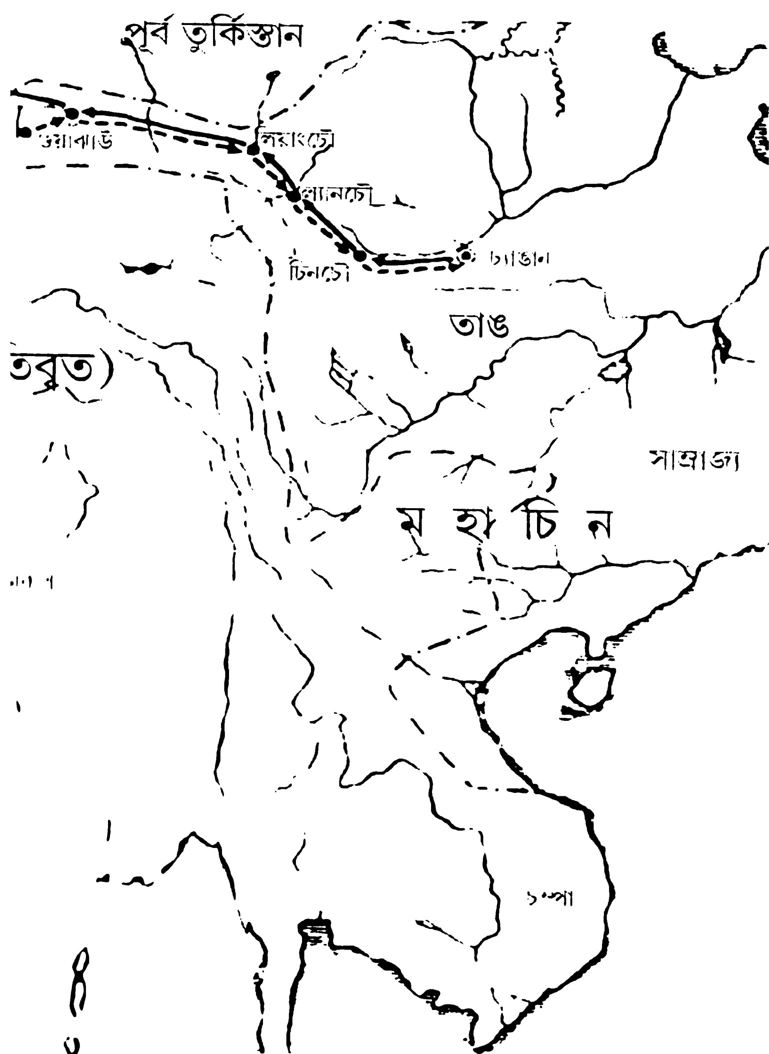
তখন দ্রুতগামী যন্ত্রযান ছিল না, মানুষ পদব্রজে অতিক্রম করত দুর্গম গিরি কান্তার মরু। নয়তো অশ্বারোহণে বা গজপৃষ্ঠে বা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। প্রাচীনকাল থেকে বণিকের দল পণ্য নিয়ে পথে নেমেছে ও সমুদ্রযাত্রা করেছে। ব্যবসার প্রয়োজনে। তারাও অতিক্রম করেছে জলেস্থলে সহস্রাধিক মাইল। আর পর্যটক পথে নেমেছে কখনো একান্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতে বা নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় অথবা তীর্থভ্রমণে। স্বার্থসিদ্ধি নয়। জাগতিক মঙ্গল ভাবনায় বা পরমার্থ সাধনায়।

মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, মার্কোপোলো, ইবন বতুতা প্রমুখ পর্যটকবৃন্দের কথা আমরা জানি। মেগাস্থিনিস আনুমানিক ৩০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস নিকোতারের দূত হিসেবে মৌর্য সম্রাট স্যান্ড্রোকোট্টাস (চন্দ্রগুপ্ত)-এর রাজসভায় দূত হিসেবে মগধরাজ্যে আসেন। ইতিপূর্বে আরাকোসিয়া (কান্দাহার)-তে কর্মরত ছিলেন। অথবা সেখানে বাস করতেন সাইবিরটিয়াসের সঙ্গে। জন্ম গ্রীক-এশিয়া মাইনরের আইয়োনিয়াতে। জীবনকাল আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দ । ব্যবিলন জয়ী সম্রাট সেলুকাসের রাজত্বকাল ৩১২ থেকে ২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শুরু আনুমানিক ৩২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর রচিত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ অন্য লেখকের কাহিনীতে পাওয়া গিয়েছে। ইনি ছিলেন রাজদূত। রাজকীয় কর্তব্য পালনে এসেছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (জীবনকাল আঃ ৩৭৩ - আঃ ৪২২ খৃষ্টাব্দ) চিন থেকে ভারতে এসেছিলেন স্থলপথ ধরে। ইনি পিং-ইয়াঙের উ-ইয়াং নামক এলাকা থেকে আগত। পারিবারিক পদবী কুং। চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠতম। অগ্রজ ভ্রাতারা শৈশবকালে গত হয়েছে। সেকারণেই বুঝি শিশু কুংকে বৌদ্ধমঠের নানা কাজে যুক্ত করে রাখেন তাঁর পিতৃদেব। শিক্ষানবিশী হিসেবে। পনেরো বৎসর হলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ



পশ্চিম তুর্কিস্তান
কাশ্মীর
ভারতবর্ষ
রব সাগর
বঙ্গে
কুচা
কান্যকুব্জ


পূর্ব তুর্কিস্তান
চিনচৌ
তাঙ
সাম্রাজ্য
মহাচিন

করে ভ্রমণ হতে পারবেন। ইতিমধ্যে বালক কুং একবার ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তাঁকে মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুস্থ হয়ে তিনি মঠেই থেকে যান। সংসারে ফিরে যান নি। দশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হল। তারপর আত্মীয়স্বজনেরা অনেক অনুরোধ করল। তবু তিনি মঠ ছেড়ে ঘরে ফিরে গেলেন না। বললেন – 'আমি পিতৃ ইচ্ছাপূরণে মঠে আসিনি; ধূলিধূসর কুৎসিত জীবনযাপন থেকে দূরে থাকতে এসেছিলাম, মঠের জীবন গ্রহণ করেছিলাম।' কিছুকাল পরে মাতৃদেবী গত হলেন। অন্তিম সংস্কার করে আবার মঠে ফিরে গেলেন। বিশ বৎসর বয়সে পুরোপুরি উপসম্পদা গ্রহণ করে পূর্ণ ভিক্ষু হলেন ও সঙেঘর সর্ববিধ অধিকার লাভ করলেন। বিনয়পিটকের সম্পূর্ণ পাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর ভারতে আগমন।

চীন থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর হবে। পশ্চিম চিন থেকে গোবি (তাকলামাকান) মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত হয়ে সাচাউ ও লপনর হয়ে খোটান এলেন। তারপর পামির অতিক্রম করে উদয়ন (সোয়াট) হয়ে তক্ষশিলা-পুরুষপুর পৌঁছলেন। ভারতে অবস্থান করেন ৪০১ থেকে ৪১০ খৃষ্টাব্দ অবধি। তখন এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তরাজাদের রাজত্বকাল। রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক। ফা-হিয়েন তিন বছর পাটলীপুত্রে বাস করে রাজগৃহ-গয়া হয়ে কাশী চলে যান। দর্শন করেছেন কপিলাবাস্তু, বোধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর। ৪০৯ সালে বোধগয়ায় এসেছিলেন। রাজগৃহের গৃধকূট শিখর দর্শন করেছিলেন। দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বসবাস করেন। তখন তমলুক সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল। আজকের তমলুক দেখে তা বোঝার সাধ্য নেই। তাম্রলিপ্ত থেকে থেকেই জলপথে তিনি স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করেন। সিংহল-জাভা হয়ে চিনে প্রত্যাবর্তন করেন ৪১৪ খৃষ্টাব্দে।

হিউয়েন সাঙের পরে অন্তত দুজন বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকের নাম উল্লেখ করতে হয়। মার্কোপোলো আর ইবন বতুতা। ভেনিসের পর্যটক মার্কোপোলো (জীবনকাল ১২৫৪-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) পর্যটনে বেরিয়েছিলেন ১২৭১ সালে। বাবা নিকোলো এবং কাকা মাফেও পোলোর সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স ষোলো-সতেরো। মরোক্কোবাসী ইবন বতুতা ছিলেন আরেক বিশ্বপর্যটক। জন্ম ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু ১৩৬৮ বা ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের পর্যটন জীবনে ইনি ৭৩,০০০ মাইল পথ পরিক্রমা করেছেন। মার্কোপোলো ভারতে আসেননি। সিল্করুট ধরে যাতায়াত করেছেন। ইবন বতুতা ভ্রমণ যাত্রায় বেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন। আমরা ভারতভ্রমণে এঁদের তেমন করে পাই না, যেমন পাই ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙকে। দুজনের মধ্যে ফা-হিয়েন পথিকৃৎ হলেও কার্যকরী প্রভাব বেশি হিউয়েন সাঙের। শ্রেষ্ঠ পর্যটক বলতে নাম উঠে আসে হিউয়েন সাঙের।

২। প্রস্তুতি

হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন সপ্তম শতকে। ২০০৮ সাল থেকে হিসেব কষলে ঠিক ১৩৭৯ বৎসর আগে। ভগবান বুদ্ধ ১,১১২ বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন (অবশ্য যদি তাঁর দেহান্তকাল খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ ধার্য করা যায়)। এ ঘটনা ফা-হিয়েনের ভারতভ্রমণের ২৩০ বৎসর পরবর্তীকালের।

চিনা ভাষায় তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে নানা প্রস্তাব আছে। ইংরেজি অক্ষরবিন্যাসে তাঁকে কখনো বলা হয় জুয়ান জ্যাঙ, কখনো বা ইউয়েন চোয়াঙ। আরো অনেক উচ্চারণের কথা আমরা শুনি। আমাদের কাছে তিনি হিউয়েন সাঙ নামেই অধিক পরিচিত। আমরা সেই শব্দকল্পই ব্যবহার করছি।

ইনি ছিলেন একাধারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও অনুবাদক অন্যদিকে অসামান্য পর্যটক। বাষট্টি বছরের জীবনকালের মধ্যে একটানা ষোলো-সতেরোটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন প্রায় দশ হাজার মাইল পথ পরিক্রমায়। চিন থেকে পদব্রজে ভারতে এসেছেন। সমগ্র ভারতভূমি ভ্রমণ করেছেন এবং তারপর চিনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর প্রাণাধিক আকাঙ্খা ছিল ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শন করে মূল বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করবেন। তারপর শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করে দেশে ফিরে মূল শাস্ত্র থেকে চিনা ভাষায় সেসব অনুবাদ করবেন। তাঁর সমস্ত বাসনা সফল হয়েছিল।

জন্ম হয় চিনের সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পূর্বপুরুষগণ হোনান প্রদেশের চেনলিউ (বর্তমান কাইফেং) এলাকায় বসবাস করতেন। পরবর্তী কোন অধস্তন পুরুষ হোনানের তাইচিউ শাসনাঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হিউয়েন সাঙের প্রপিতামহ চিন ছিলেন শানসি প্রদেশের ইয়াঙ-তুং (শাঙ-তুঙ) কাউন্টির প্রধান শাসনকর্তা। পিতামহ চেন-ক্যাঙ রাজধানীর ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক। হোনান প্রদেশের চৌনান (বর্তমান নাম লুয়োইয়াঙ বা লোইয়াঙ) এলাকায় তাদের যথেষ্ট জায়গাজমি ছিল। তা থেকে খাজনা বাবদ যে উপার্জন হত তাতে পরিবারটি আর্থিকভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছলই ছিল বলা যায়।

তাঁর পিতার নাম হুই। ইনি অতীব রক্ষণশীল কনফুসিয়াস ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ছিলেন ক্লাসিক সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকও। শোনা যায় তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুই রাজবংশের শেষের দিকে ওই এলাকায় রাজনৈতিক শান্তিশৃঙ্খলা ভয়ানক ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। তখন তিনি অসুস্থতার দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছায় শাসনকর্তার রাজপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা গভর্নর বা গ্যারিসন কম্যাণ্ডার কোন পদেই রাজকর্মচারী হিসেবে যুক্ত থাকতে সম্মত হলেন না। চলে গেলেন চেন-পাও-কু গ্রামে। নতুন করে বসবাস শুরু করলেন। এই গ্রামেই সম্ভবত হিউয়েন সাঙের জন্ম হয়।

জীবনীকার লিখেছেন – ৬০২ খৃষ্টাব্দে চিনের হোনান প্রদেশের লোইয়াঙের কাছে সাং-শেন-পাও-কু (বা চেন-হে বা চেন-লিউ) গ্রামে তাঁর জন্ম। মতান্তরে জন্মকাল ৬০০ বা ৬০৩ খৃষ্টাব্দ। কোন কোন সূত্র অনুসারে তিনি নাকি ৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা তাঁর জন্মকাল ৬০২ খৃষ্টাব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি। পাঠক-পাঠিকা সচ্ছন্দে অন্য জন্মকাল নির্বাচন করে নিতে পারেন।

হিউয়েন সাঙের পারিবারিক নাম চেন। বাল্যনাম চেন-হুই। চার সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। জন্মের পরে হিউয়েন সাঙের মাতৃদেবী নাকি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে শ্বেতবসন পরিহিত তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান পশ্চিম দিকে চলেছেন। 'কোথায় যাচ্ছ' প্রশ্ন করতে উত্তরে জানায় – 'আমি সত্যধর্মের সন্ধানে যাচ্ছি।' হিউয়েন সাঙ যে একদা পশ্চিম দিশায় ভারতভূমি পরিভ্রমণে যাবেন তারই পূর্বাভাষ ছিল যেন ওই স্বপ্নে।

আট বছর বয়স থেকেই কনফুসিয় রীতিপ্রকরণ মান্য করার বিষয়ে বালক চেন হুইর চমৎকার মেধা ও আন্তরিকতা দেখে পিতৃদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্যান্য সন্তানের মতো তাঁরও পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বিষয়ে সাবেকী রচনা এবং গোঁড়া কনফুসিয় যাজককর্ম নিয়ে প্রচলিত রচনাদি সম্বন্ধে তাঁকে আগ্রহী করে তোলায় ব্যাপারে পিতার বিশেষ নজর ছিল।

দ্বিতীয় অগ্রজ ভ্রাতার নাম চেনসু। পরবর্তী কালে ইনি পরিচিত হন চ্যাওজিয়ে নামে। এর প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিসীম। চেনসু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বসবাস শুরু করেন লোইয়াঙের জিংতু (পবিত্র ভূমি) মঠে। তখন লোইয়াঙের ঐ বৌদ্ধমঠের পৃষ্ঠপোষক ছিল সুই রাজবংশ। কনফুসিয় পরিবারে জন্মেও বাল্যবয়সে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন অগ্রজ চেনসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ক্রমে জিংতু মঠে চেন হুইর যাতায়াত বেড়ে যায়। একজন শিক্ষানবীশ মঠ-সন্ন্যাসী হিসেবে নিযুক্ত হন মাত্র ছয় বৎসর বয়সে। অর্থাৎ নির্ধারিত বয়সের এক বছর আগেই। কথিত আছে, যথাবিহিত পরীক্ষাদির পরেই তাঁর সেই নিয়োগকার্য হয়েছিল। মঠেই নাকি তাঁর নতুন নাম হয়েছিল হিউয়েন সাঙ বা জুয়ান ঝাঙ।

জিংতু মঠে শুরু করেন পবিত্র শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন। চিঙ নামক শিক্ষকের কাছে 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' অধ্যয়ন করেন। ইয়েন নামের আরেকজন শিক্ষকের কাছে 'মহাযান-সংগ্রহ' পাঠ করেন। এই গ্রন্থটি এতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে একদমে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করেছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর তিনি ঐ মঠে ছিলেন। মূলত সেই সময় বৌদ্ধ থেরবাদী এবং মহাযানী শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। তবে তাঁর অনুরাগ গড়ে উঠেছিল নাকি শেষোক্তটির প্রতি।

বাল্যকালেই তাঁর বিস্ময়কর মেধার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কোন শাস্ত্রগ্রন্থের উপর একবার মাত্র বক্তৃতা শুনে এবং তারপর আরেকবার মাত্র নিজে অধ্যয়ন করে সমগ্র

গ্রন্থটি কণ্ঠস্থ করার মতো আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। সহযোগী অন্য ছাত্রগণ তাঁকে তখন থেকেই প্রতিভাসম্পন্ন বালক বলেই মনে করত।

৬১১ খৃষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বৎসর। চার বৎসর পরেই বৌদ্ধমঠে যোগদানের বাসনা প্রকাশ করেন। মঠাধ্যক্ষ জেঙ শ্যাঙয়ু (চেং শান-কুয়ো)-র তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কেননা ইতিমধ্যে তিনি ওই বিস্ময় বালকের নিষ্ঠা, আচরণ ও শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

একবার মঠে সাতাশ জন শিক্ষার্থীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে বলে শতাধিক প্রার্থী সমবেত হয়েছে। অল্প বয়সের জন্য মঠে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এক বালক তবু সরকারী ভবনদ্বারে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখে রাজপ্রতিনিধি কৌতূহল প্রকাশ করল। প্রশ্নের উত্তরে সুশীল বালক দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর জানিয়েছিল – আমি কম সময় শাস্ত্র পাঠ করেছি বলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নেবার উপযুক্ত হতে পারিনি।

কেন তাঁর মঠে প্রবেশ করতে এত আগ্রহ। এ প্রশ্নের উত্তরে বালকটি জানাল – তথাগতের কর্মধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে আর তাঁর বাণীর গৌরব বৃদ্ধি করতে মঠে যোগ দিতে চাই।

তারপর রাজপ্রতিনিধির বিশেষ ক্ষমতাবলে মঠে তাঁর প্রবেশাধিকার মঞ্জুর হল। নিয়মভঙ্গ করেই তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এভাবে ৬১৫ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো।

৬১৮ সালে সুই রাজবংশের পতন হল। সেই সঙ্গে হোনানে ঘোর অশান্তি শুরু হয়ে গেল। পীতনদী থেকে হো নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তখন লুঠেরাদের স্বর্গে পরিণত হল। বিশেষ করে বৌদ্ধদের জীবনযাপন অতি দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তারা রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট তাঙ ততদিনে সিনইয়াঙ থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চ্যাঙান দখল করেছেন। হিউয়েন সাঙ এবং তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা চ্যাঙান পালিয়ে গেলেন। চ্যাঙানের বর্তমান নাম জি-অ্যান। সুই রাজবংশের পরে চিনের শাসনভার বর্তায় নবাগত তাঙ রাজবংশের উপর। তাদের রাজধানী স্থাপিত হল চ্যাঙানে যার অর্থ 'চির শান্তি'।

দুই ভাই সেখানে পৌঁছে দেখেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে তখনো চলছে যুদ্ধের পরিস্থিতি। শিক্ষাসংস্কৃতির পরিবেশটাই নেই। সুই রাজবংশের সময় যে সকল স্বনামধন্য শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন তাঁরা কে কোথায় আছেন কে জানে! নিরূপায় হয়ে দুই ভাই চিনলিঙ পর্বতমালার জু-উ উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণের সেচুয়ানের (ঝেচুয়ান) দিকে পা বাড়ালেন। এসে উপস্থিত হলেন হানচুয়ান (বর্তমানে সেনসি প্রদেশের নানচেঙ কাউন্টি। সেখানে দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক কাঙ ও চিঙের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হল। মাসাধিককাল তাঁদের নিকট শিক্ষালাভ করলেন। তারপর আরো দক্ষিণে সেচুয়ানের পার্বত্য প্রদেশের চেংদু (চেংতু বা শেঙতু) নামক স্থানের কোং-হুই মঠে আশ্রয় নিলেন।

এভাবে মঠে মঠে নানা শাস্ত্র পাঠ করে দুজনেই জ্ঞানলাভে ব্যস্ত। 'মহাযান-সংগ্রহ' ও 'অভিধর্ম-সমুচ্চয়' অধ্যয়ন করলেন খ্যাতনামা শিক্ষাগুরু তাও-চি ও পাও-শিয়েনের নিকট। আরেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তাও-চেনের নিকট শিক্ষালাভ করলেন কাত্যায়ন রচিত 'অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র'। প্রায় দুই থেকে তিন বছর তাঁরা কোং-হুই মঠে বসবাস করেন। তারপর কুড়ি বছর বয়সে হিউয়েন সাঙ পুরোপুরি বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসেবে ঐ মঠে যোগ দিলেন। সময়কাল ৬২২ খৃষ্টাব্দ। ততদিনে নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী ভিক্ষু হিসেবে তাঁর সুনাম হয়েছে।

অনতিকালের মধ্যে হিউয়েন সাঙ লক্ষ্য করলেন যে চিনা ভাষায় অনুদিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে বহুবিধ ভেদাভেদ আছে। বহু অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। পারস্পরিক বিরোধিতা আছে। শিক্ষকগণ এই মতভেদ নিরসণ করতে এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দূর করতে অপারগ। এর কারণ হয়তো চিনা ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট পারদর্শী নয় এমন বিদেশীদের দ্বারা বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের চিনাভাষায় অনুবাদকর্ম হয়েছিল। যার ফলে চিনা ভাষায় মূল গ্রন্থের প্রকৃত অর্থভাব পরিস্ফুট হয়নি।

ক্রমশ হিউয়েন সাঙ অনুভব করছিলেন ধর্মের প্রকৃত অর্থ জানতে তাঁকে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল যেদেশে, সেই ভারতে গিয়ে মূল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

চেংদু মঠে আর কিছু শিক্ষা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই দেখে হিউয়েন সাঙ অস্থির হয়ে পড়লেন। রাজধানী চ্যাঙানে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। এদিকে অগ্রজ ভ্রাতা সেনসি রাজ্যের ওই রাজধানী যেতে রাজি নয়। হিউয়েন সাঙের তখন এমন অবস্থা যে তিনি অগ্রজের সঙ্গ পরিত্যাগ করতেও রাজি। তাঁর প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণার নিবারণ হয়নি যে!

একদিন একাকী কোন বণিকদলের সঙ্গে ইয়াংসি নদীপথে ভেসে পড়লেন। তিনটি গিরিখাত অতিক্রম করে উঠলেন নদীর ভাটিতে চিংচাউ (হুপে প্রদেশের কিয়াংলিং কাউন্টি) নগরে। সেখানকার তিয়েন-হুয়াং মঠে যোগ দিলেন। তাঁর ধর্মচেতনা ও জ্ঞানভাণ্ডার ইতিমধ্যে তাঁকে বিখ্যাত করেছে। শ্রমণদের অনুরোধে মঠে ধর্মপ্রচার করলেন কিছুকাল। তারপর অগ্রসর হলেন উত্তরের দিকে। অন্য গুরুর সন্ধানে। পৌঁছলেন সিয়াংচাউ (হোনান প্রদেশের আনিয়াং কাউন্টি)। দেখা পেলেন গুরু হুই-সিউর। সন্দিগ্ধ মনের অন্ধকার দূর করতে তাঁর কাছে যা যা জানার ছিল, সেসব জানার চেষ্টা করলেন।

তারপর এগিয়ে গেলেন চাওচৌ (হুপেই প্রদেশের চাও কাউন্টি) নামক নগরের দিকে। সেখানে আছেন গুরু তাও-শেন। তাঁর নিকট 'সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র' অধ্যয়ন করলেন। পাঠ সমাপ্ত হলে পাড়ি দিলেন রাজধানী চ্যাঙান। সেখানকার মঠে যোগ দিলেন। সেখানে আবার স্বনামধন্য গুরু তাও-ইয়োর কাছে 'অভিধর্ম-কোষ' পাঠ করলেন।

ক্রমশ উপযুক্ত গুরুর প্রাদুর্ভাব অনুভূত হল। রাজধানীতে হীনযান ও মহাযান শাস্ত্রে পণ্ডিত দুই খ্যাতনামা গুরু ছিলেন ফা-চ্যঙ এবং সেং-পিয়েং নামে। বহু লোক তাঁদের

কাছে শিক্ষালাভ করেছে। হিউয়েন সাঙও ঐ শিক্ষকদ্বয়ের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের নিকট পাঠ গ্রহণ করলেন। অনতিকালের মধ্যে সেই শিক্ষাপর্বও সাঙ্গ হয়ে গেল।

গুরুদ্বয় হৃষ্টচিত্তে বললেন — 'বৌদ্ধধর্মে তোমার আশ্চর্য জ্ঞানলাভ হয়েছে। অতঃপর জ্ঞানসূর্যের আরো দীপ্তি প্রকাশিত হবে কিনা তা একান্তভাবে তোমার উপর নির্ভর করছে। দুঃখ এই যে আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, সেই সুদিন প্রত্যক্ষ করতে বেঁচে থাকব না।'

রাজধানীতে এই যুবক তপস্বীর কথা প্রচারিত হল। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে দেখা হয়ে গেল এক ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য শীলভদ্র কর্তৃক সমুদ্রপথে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি। ঐ ধর্মপ্রচারক হিউয়েন সাঙের ভারতযাত্রার কথা শুনলেন। তাঁকে বললেন — 'শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থ জানতে হলে অবশ্যই তাঁকে পূর্ব ভারতের জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে এবং আচার্য শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করতে হবে।' ইতিমধ্যে তিনি ফা-হিয়েন ও চিয়েনের স্মৃতিকথা পড়েও ভারতভ্রমণের জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠেন হয়তো।

বিভ্রান্ত হিউয়েন সাঙের কাছে তৎক্ষণাৎ একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর আগামী জীবনের কর্তব্যকর্ম কি হবে তার রূপরেখা তৈরী হয়ে গেল যেন ঐ ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের উপদেশের মধ্য দিয়ে। পুণ্য ভারতভূমিতে পৌছে বিশ্ববন্দিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করাই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। সেখান থেকে 'সপ্তদশ-ভূমি শাস্ত্র' ও 'যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র' সংগ্রহ করে তবে দেশে ফিরবেন।

ইতিমধ্যে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। সেই সময় হয়তো তিনি বৌদ্ধ যোগাচার ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করছিলেন। এছাড়া মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক ভাষা, অধুনালুপ্ত টোকারিয়ান ভাষা, শিখে নিয়েছিলেন।

সম্পূর্ণ অচেনা অজানা রাজ্যে পদার্পণ করতে হবে একা একা। দুর্গম বন্ধুর পথে। প্রচুর দৈহিক শ্রম আছে। অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে তার জন্যে। ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালেন — তাঁর অভিষ্ট যেন সিদ্ধ হয়। সমস্ত দেবতার কাছে মিনতি জানালেন যেন তাঁর যাত্রা সফল হয়।

৬২৭ খৃষ্টাব্দে তাঙ রাজবংশের সম্রাট তাঙ-ঝেন-গুয়ান (তাঙ তাইজং) রাজসিংহাসনে বসলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৬২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ।

এর ঠিক দু'বৎসর পরের কথা।

এক রাতে হিউয়েন সাঙের স্বপ্নদর্শন হল। দেখলেন মহার্ণবের মধ্যে রয়েছে রত্নে সুসজ্জিত সুমেরু শৃঙ্গ। প্রাণপণে তিনি শৃঙ্গে আরোহণের জন্য চেষ্টা করছেন। বারংবার। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। নৌকা নেই, ভেলা নেই। প্রবল তরঙ্গদোলা। পৌছবেন কি করে শৃঙ্গের কাছে? এমন সময় প্রস্তর নির্মিত এক কমলাসন জলতরঙ্গের উপর দিয়ে এগিয়ে এল।

তার উপর পা রেখে সমুদ্রলহরী পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর যেই না ঐ পর্বতের পাদদেশে উপনীত হলেন, অমনি কমলাসনখানি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি পর্বতের পাদদেশ থেকে পর্বতশীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হচ্ছিল না। তখন এক প্রবল বাত্যাপ্রবাহ ধেয়ে এল। আর তাঁকে অক্লেশে পর্বতশীর্ষে তুলে নিয়ে গেল। তখন আকাশ ও সমগ্র জগত স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও নির্মল মনে হচ্ছিল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, এ নিছক স্বপ্ন নয়। এক প্রগাঢ় ইঙ্গিত বহন করছে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পরম দেবতার শুভ আশির্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উপর।

এই ঘটনার পরেই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে হিউয়েন সাঙের যাত্রার সিদ্ধান্ত একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর।

স্বপ্নদর্শন – মানুষ আসলে যা আন্তরিকভাবে কামনা করে, তাই তো তার কাছে স্বপ্নে ধরা দেয়। জাগরণে যা অধরা, স্বপ্নের শুভেচ্ছায় তাই ধরাছোঁয়ার আওতায় পা রাখে।

তখন চিনে প্রবল রাজনৈতিক সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে। তাঙ রাজবংশ ও পূর্বদেশীয় তুর্কি (গোরতুর্ক বা গোকতুর্ক)-দের মধ্যে প্রায়শ সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। সেকারণে চিনসম্রাট তাঙ তাইজং দেশবাসীর বিদেশগমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। বিশেষত পশ্চিম দেশে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হল। নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে বাদ গেল কেবল বিদেশী পর্যটক ও বণিকেরা। হিউয়েন সাঙকে ভারতে যেতে হলে পশ্চিমের পথেই যেতে হবে। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ সিল্ক রুট ধরে।

তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে ভারতভূমি যাত্রার সম্মতিপত্রের (গুয়ো শুয়ো) জন্য রাজার কাছে আবেদন করলেন। প্রত্যাশিতভাবেই প্রশাসন অসম্মতি জ্ঞাপন করল। সকলে খুব হতাশ হয়ে পড়ল। হাল ছাড়লেন না লক্ষ্যে অবিচল হিউয়েন সাঙ।

৩। যাত্রা - চ্যাঙান থেকে তুরফান

চ্যাঙান- চিনচৌ - ল্যানচৌ - লিয়াংচৌ - গুয়াঝাউ- ইউমেনকুয়ান- ইউ- কুমুল- তুরফান

একদিন **চ্যাঙান** থেকে বেরিয়ে পড়লেন অজানা পশ্চিমের দিকে। সময় চেঙ-কুয়ানের তৃতীয় বর্ষের অষ্টম মাস। মোটামুটি ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। লক্ষ্য ভারতবর্ষ। লক্ষ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ্য ভগবান বুদ্ধের পুণ্যভূমি দর্শন এবং মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন। রাজধানীতে সিয়াও-তা নামে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' অধ্যয়ন সাঙ্গ করেছেন। দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশ চিনচৌ (সিন-সাউ, কানসু প্রদেশের টিয়েনসুই কাউন্টি)। হিউয়েন সাঙ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন **চিনচৌ**। একরাত কাটালেন সেখানে। পরিচয় হল আরেক যাত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন কানসু প্রদেশের রাজধানী **ল্যানচৌ**।

সাক্ষাত হল আরেকদল যাত্রীর সঙ্গে। তারা লিয়াংচৌ ফিরে যাবে। নগরটির অবস্থান বর্তমান কানসু (গনসু) প্রদেশের উওয়েই কাউন্টিতে। তাদের সঙ্গে পৌঁছে গেলেন **লিয়াংচৌ** (লিয়ংঝউ)। চিনের পশ্চিমতম সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত হোসি প্রদেশের রাজধানী ছিল এই লিয়াংচৌ। চিন ও মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ সিল্ক রুটের দক্ষিণতম নগরপ্রান্ত। পামির মালভূমির পূর্বদিকের রাজ্যাদি থেকে এই নগরে নিরন্তর বণিকদলের সমাগম লেগেই থাকে। হিউয়েন সাঙ সেখানে বসে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। ইতিমধ্যে নগরবাসী বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও জনতার অনুরোধে হিউয়েন সাঙ সত্যধর্ম নিয়ে উপদেশ দিলেন। ব্যাখ্যা করলেন 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র', 'মহাযান-সংগ্রহ', 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র'। পূর্বদেশ থেকে আগত বণিকদলও তাঁর ধর্মদেশনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা সকলে নানা মূল্যবান উপহার দিল। হিউয়েন সাঙ যে পশ্চিমের দেশ হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেশে যেতে চান সেকথা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন। তারাও স্বদেশে ফিরে গিয়ে প্রচার করে দিল নবীন চৈনিক শ্রমণের কথা যিনি ভগবান বুদ্ধের দেশে গমনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই যাত্রা করবেন।

লিয়াংচৌর গভর্নর লি-তালিয়াং রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মান্য করার পক্ষে। কোন চিনা নাগরিকের পশ্চিমের দেশে পা রাখা নিষেধ। গভর্নর খোঁজখবর নিলেন। হিউয়েন সাঙের বিদেশ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য কি তা জানতে চেষ্টা করলেন। সব শুনে গভর্নর তাঁকে রাজধানী চ্যাঙান ফিরে যেতেই পরামর্শ দিলেন। তবে তা গৃহীত হল না।

ধর্মদেশনা করতে করতে ইতিমধ্যে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। হুই-উয়েই নামের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত হোসি প্রদেশে ছিলেন। তিনি হিউয়েন সাঙের সত্যধর্ম প্রচারের

কথা ও তাঁর অপূর্ব দেশনার কথা শুনেছেন। আরো শুনেছেন তাঁর ভারত ভ্রমণের কথা। তাঁর দুই শিষ্য, হুই-লিন ও তাও-চেঙ। তাদের পাঠিয়ে দিলেন হিউয়েন সাঙের কাছে। জানালেন যে এরা তাঁকে পশ্চিমে পৌঁছে দেবে। গভর্নরের নিষেধ থাকায় কাজটা গোপনে করতে হবে। ঠিক হল, তাঁরা রাতে পথ চলবেন আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকবেন। এভাবে তাঁরা **গুয়াঝাড** (কুয়াচাউ) পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কানসু প্রদেশের আনশি কাউন্টির পূবদিকে ঐ জনপদ। গভর্নর টুকু-তা সাদরে গ্রহণ করল তাঁকে।

গুয়াঝাউ পৌঁছে পশ্চিমে যাত্রাপথের হালহকিকত সম্পর্কে সন্ধান করলেন স্থানীয় লোকজনের কাছে। জানা গেল, পঞ্চাশ লি উত্তরে হু-লু (সু-লেহ-হো বা বুলুঙ্গির) নদী আছে। নদীটি নিচের দিকে চওড়া কিন্তু উজানে সংকীর্ণ। তবে প্রচণ্ড জলস্রোত সেখানে। হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব। অথচ ওটাই ইউমেন-কুয়ান পৌঁছনোর একমাত্র পথ। 'কুয়ান' মানে গিরিপথ। কুয়ান পেরিয়ে তবে পশ্চিমে যাওয়া যাবে। আর সেটাই একমাত্র পথ। তারপর সুবিস্তৃত মরু প্রান্তর। একদিকে গোবি অন্যদিকে তাকলামাকান। মাঝখানে চিন সরকারের গোটা পাঁচেক প্রহরা-ঘাঁটি (নিরীক্ষণ বুরুজ) আছে। কমবেশি একশ' লি অন্তর ব্যবধানে। পথে জল নেই। একবিন্দু ঘাস পর্যন্ত নেই। বুরুজ পেরিয়ে শুরু হচ্ছে মো-হো-ইয়েন মরুভূমি। আর তার মধ্যে ইউ কাউন্টির জনপদ হামি। সেই দুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। এদিকে তাঁর বাহন ঘোড়াটি মারা পড়েছে। মনে মনে ভাবছেন, এবার কি করা যায়, কিভাবে এগোনো যায়।

ইতিমধ্যে লিয়াংচৌ থেকে সংবাদ আসে গুয়াঝাউতে। জনৈক সন্ন্যাসী, নাম হিউয়েন সাঙ, পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে পারে। তাঁর কাছে বৈধ অনুমতিপত্র নেই। তাঁকে আটক করার নির্দেশ আছে। গুয়াঝাউর শাসনকর্তা টুকু-তা সোজাসুজি হিউয়েন সাঙকে প্রশ্ন করে জেনে নেয় তিনিই সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি না। ঘটনাচক্রে ঐ রাজকর্মচারী ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। তিনি সত্যটা জানতে চান এবং সম্ভব হলে যে সহযোগিতাই করবেন তারও আভাষ দিলেন । হিউয়েন সাঙ সব কথা খুলে বললেন। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ঐ রাজকর্মচারী তাঁর সামনেই সরকারী নির্দেশনামা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন – 'আর দেরী নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা করুন।'

সাহায্যকারী দু'জনের মধ্যে চাও-চেঙ ইতিমধ্যে তুন-হুয়াং চলে গিয়েছে। সঙ্গে আছে কেবল হুই-লিন। পথকষ্ট সহ্য করা তার মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বিবেচনা করে তাকে বিদায় দিলেন। নতুন ঘোড়া কেনা হল। এবার দরকার একজন ভালো পথপ্রদর্শকের। মঠে বসে হিউয়েন সাঙ প্রার্থনা জানান – মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব যেন এবার কোন উপায় করে দেন।

এমন সময় মঠের বিদেশী সন্ন্যাসী, নাম ধর্ম, এগিয়ে এসে অদ্ভুত সবকথা জানালেন। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন যে কমলাসনে বসে হিউয়েন সাঙ পশ্চিমে চলেছেন।

আবার স্বপ্ন ও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শুভ ইঙ্গিত। তবে বুঝি তাঁর ভারতভূখণ্ডে যাত্রা বাস্তবায়িত হবেই হবে। মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকেন তিনি।

আরেকজন বিদেশী অতিথির আবির্ভাব হল। তার নাম – পান-তো-শি। হুঁইয়েন সাঙকে প্রদক্ষিণ করে ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করল। তিনি তাকে পাঁচটি নীতিবাক্য দান করলেন। একটু পরে ঘুরে এসে পান-তো-শি গুরুর জন্য কিছু ফল ও কেক নিয়ে এল। বিদেশী পান-তো-শিকে দেখে শক্তসমর্থ ও বুদ্ধিমানই মনে হয়েছিল। তার কাছে ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ একান্ত বাসনার কথা প্রকাশ করে বসলেন। সব শুনেটুনে ঐ বিদেশী তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হল।

পরদিন বিদেশী যাত্রীর জন্য ঘোড়া ও পোষাক সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে ঝোপের অন্তরালে অপেক্ষা করছিলেন। পান-তো-শি আবার সঙ্গে করে নিয়ে এল আরেকজন বয়োবৃদ্ধ মানুষকে। সেও বিদেশী। সঙ্গে তার লাল রঙের ঘোড়া। সেটিও বেশ বুড়ো। তবে লোকটি ওদিরকার। পথঘাট খুব ভালো চেনে। বার তিরেশেক অন্তত ইউ কাউন্টিতে যাতায়াত করেছে।

লোকটি হিউয়েন সাঙকে পথের ভয়াবহতার কথা জানাল – 'মরুপথে তপ্ত বালুঝড় আছে। দানো আছে। পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। সেই দুর্গম পথে মান্যবর একাকী যাত্রার বাসনা করেছেন। দয়া করে আরেকবার ভেবে দেখুন।'

হিউয়েন সাঙ জানালেন – 'এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে ফিরে যাব না। পথে যদি মৃত্যু আসে, আসুক, দুঃখ নেই।'

'– তবে ভদন্ত আপনি আমার এই ঘোড়াটি নিয়ে যান। এটিও এপথে বার পনেরো যাতায়াত করেছে। আপনার ঘোড়াটি এ পথে চলার জন্য বড়োই আনকোরা।'

একথা শুনে তাঁর মনে পড়ে গেল, চ্যাঙানের হো-হাং-তা যাদুকরের কথা। যাদু, ডাকিনীবিদ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীতে তার খুব সুনাম ছিল। সে বলেছিল – 'আপনার প্রার্থিত যাত্রা সফল হবে। এক বুড়ো শীর্ণকায় লাল ঘোড়ায় চেপে আপনি পশ্চিমে যাবেন। আর দেখবেন, ঐ ঘোড়ার জিনের সামনে লোহার টুকরো বাঁধা থাকবে।'

হিউয়েন সাঙ দেখতে পেলেন ঐ বুড়ো লাল ঘোড়াটির জিনেও লোহার টুকরো বাঁধা। তবে তো সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক মিলে গেল। আনন্দিত মনে ঘোড়া বদল করে নিলেন। তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। রাতের অন্ধকারে।

পথে যেতে যেতে নদী পড়ল। বুলুঙ্গির (হু-লু) নদী। অল্প দূরে **ইউমেন-কুয়ান** দেখা যাচ্ছে। উজানপথে আরো দশ লি এগিয়ে গেলেন। নদী সেখানে ফুট দশেকের মতো চওড়া। সঙ্গীটি বড়ো বড়ো গাছের ডালপালা কেটে তার উপর ঘাস-বালি বিছিয়ে সেতু নির্মাণ করে ফেলল। ঘোড়াদুটি অনায়াসে পার হয়ে গেল তার উপর দিয়ে।

বড়ো বাঁধা অতিক্রম করা গিয়েছে দেখে হিউয়েন সাঙ আনন্দিত মনে শয্যা পেতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। অবাক কাণ্ড! একটু পরে দেখেন – পথসঙ্গী পান-তো-শি উন্মুক্ত তরবারী হাতে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। মনে মনে কী কুমতলব ছিল কে জানে! খানিকটা এগিয়ে এসে তারপর কি মনে করে পিছিয়ে গেল। সজাগ হয়ে হিউয়েন সাঙ মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নাম জপ করছিলেন। একটু পরে লোকটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন পান-তো-শি সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করল। পথ দুর্গম। শাস্ত্রীদের প্রহরা ঘাঁটি ছাড়া আর কোথাও জল নেই। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ বুরুজের কাছে গিয়ে জল আনতে হবে। তারা যদি টের পায় তবে মৃত্যু অনিবার্য। তার থেকে ফিরে যাওয়াই ভাল। এই সব কথা বলছিল।

হিউয়েন সাঙ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একপাও পিছনে যাবেন না। দুজনে আরো কয়েক লি পথ অতিক্রম করল। এবার লোকটি পুরোপুরি বেঁকে বসল। জানাল যে তাকে এক বড়ো পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয়। দেশের আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বোঝা গেল – এই লোকটিকে দিয়ে জোর করে কিছু করা যাবে না। তাকে বিদায় করাই মঙ্গল। সেই সঙ্গে পান-তো-শি-র কাছে হিউয়েন সাঙকে প্রতিজ্ঞা করতে হল যে শাস্ত্রীদের হাতে ধরা পড়লে তিনি কখনো তার নাম উচ্চারণ করবেন না।

এখন সর্বার্থে চিনা ভিক্ষু একা। সামনে মরুভূমি। পথপ্রদর্শক নেই কেউ। জনমানবহীন পথ। পথই বা কোথায়! মানুষের কঙ্কাল আর ঘোড়ার মল দেখে পথের হদিশ করে নিতে হচ্ছে। সেসব দেখতে দেখতে আরো ভয় চেপে বসে। এই মৃতদের স্তূপে তারই মতো পশ্চিমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া পর্যটকরাও নিশ্চয়ই আছেন। আর এই কঙ্কালে তাদের অন্তিম পরিণতি! কি ভয়ঙ্কর আর অনিশ্চিত এই পথপরিক্রমা। কতদূরে ভগবান বুদ্ধের দেশ। যতদূরেই হোক না কেন সেখানে যে তাঁর পৌঁছোনো চাই-ই চাই। জন্মভূমি থেকে শিক্ষাভূমির দিকে। সত্যজ্ঞানের উৎস যেখানে সেই দেশের উদ্দেশে। জ্ঞানের তো কোন দেশ নেই। সত্যের কোন প্রাদেশিকতা নেই। তা সর্বত্র বিচরণ করে। তাকে সর্বজনহিতায় ভেবে গ্রহণ করলেই তবেই না মঙ্গল।

পথে আচমকা কয়েকশ' মানুষের কাফিলা নজরে এল। অশ্বারূঢ় একটি দল। তাদের পরনে মোটা পশমের পোষাক। হাতে পতাকা ও বল্লম। এরা কি ডাকু-লুঠেরা? এগিয়ে আসছে আবার যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কাছে এসে পড়ার বদলে হঠাৎ তারা উধাও হয়ে গেল। তবে কি এরাই সেই দানো যাদের কথা আগে শুনেছিলেন? হঠাৎ কোথা থেকে কে যেন বলে উঠল – 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।'

আশি লি-র মত দূরত্ব অতিক্রম করার পরে প্রথম নিরীক্ষণ বুরুজটা নজরে এল। তাড়াতাড়ি খাদের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। রাতের অপেক্ষায় বসে রইলেন। অন্ধকার

ঘন হয়ে এলে বুরুজের পশ্চিমে যেখানে জল আছে সেখানে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে জলপান করলেন। হাতমুখ ধুয়ে সঙ্গে-আনা জলপাত্র ভর্তি করতে যাবেন, অমনি সাঁ করে তীর ছুটে হল। প্রায় তাঁর হাঁটু ঘেঁষে। পরক্ষণেই আরেকটি। বুঝতে পারলেন তিনি আর গোপন নেই। মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন – 'আমি রাজধানী থেকে আগত এক সন্ন্যাসী, তীর ছুঁড়ো না।'

এগিয়ে গেলেন বুরুজের দিকে। ঘাঁটির সর্দার ওয়াং-সিয়াং দীপালোকে দেখলেন – সত্যি ইনি এক সন্ন্যাসী। তবে হোসির লোক নয়। হিউয়েন সাঙ জানিয়ে দিলেন যে তিনি রাজধানী থেকে আগত সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে পশ্চিমে না-যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

সর্দার চাইছিলেন তুনহুয়াং-এর লোক তুনহুয়াং-এ ফেরত পাঠানো যাক। সেখানে চ্যাঙ-চিয়াও নামে এক পণ্ডিত আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলল। কিন্তু সন্ন্যাসী পিছন দিকে ফিরে যেতে সম্মত নয়। জানালেন – দুই রাজধানী চ্যাঙান আর লোইয়াং থেকে সেখানকার সকল গুরুদের কাছ থেকে সমস্ত শিক্ষালাভ করেছেন। দেশীয় গুরুদের কাছ থেকে নতুন জ্ঞানলাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই। এবার তাঁকে যেতে হবে পশ্চিমদেশে। ভারতভূমিতে। যেতে তাঁকে হবেই। সর্দার যত ইচ্ছে শাস্তি দিতে চায়, দিতে পারে। তিনি ফিরে যাবেন না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সন্ন্যাসীর কথা শুনে সর্দার বিস্মিত হয়ে গেল। এমন একজন ব্যক্তির মনোবাসনা ব্যর্থ হোক এটা করা সম্ভব হল না। পরিবর্তে তাঁর রাতের বিশ্রামের সুব্যবস্থা হল। পরদিন সকালে বিদায়কালে পাত্র ভরে জল দেওয়া হল। সেই সঙ্গে কিছু খাদ্যসম্ভার। তারপর ভিক্ষু সন্ন্যাসীর সঙ্গে এগিয়ে গেল দশ লি পথ।

বিদায় জানিয়ে বললেন – 'মান্যবর, আপনি এই পথে চলে যান। চতুর্থ বুরুজে পৌঁছে যাবেন। সেখানে পৌঁছে আমার নাম করবেন সর্দার ওয়াং পাই-লাঙের কাছে। আমার আত্মীয় সে। বলবেন যে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। সম্ভবমতো সাহায্য করবে আপনাকে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

সাশ্রু নয়নে বিদায় জানাল সর্দার ওয়াং-সিয়াং।

সন্ধ্যা নাগাদ চতুর্থ বুরুজ পৌঁছলেন। ভাবলেন – চুপিচুপি একটু জল ভরে নিয়ে চলে যাবেন। কে জানে আবার তাঁকে আটক করে বসবে কি না! জল নিতে এগোচ্ছেন, অমনি তীর ছুটে এল। বিলম্ব না করে আগের মতোই নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে দিলেন। বুরুজের দিকে এগিয়ে গিয়ে জানালেন প্রথম ঘাঁটির সর্দার ওয়াং-সিয়াং পাঠিয়েছে তাঁকে। অমনি কেল্লার পরিবেশ বদলে গেল। রাতের আশ্রয় জুটে গেল নির্বিঘ্নে।

পরদিন সকালে পাত্রভরা জল পেলেন। সেই সঙ্গে কিছু পশুখাদ্য। সর্দার ওয়াং পাই-লাঙ তাঁকে বললেন – 'পঞ্চম বুরুজ এড়িয়ে আপনি এই পথে এগিয়ে যান।

একশ' লির মতো দূরত্বে মিষ্টি জলের ঝর্ণা পাবেন। আসলে ঐ বুরুজের সর্দার লোকটি ভালো নয়।'

বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলেন। সামনের দিকে আটশ' লি দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ভয়ঙ্কর '**মো-হো-ইয়েন**' মরুভূমি। প্রাচীনকালের লোকেরা বলত একে মরুনদী। দিনের বেলা প্রবল উত্তাপ আর রাতে ভীষণ শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রার এই বিশাল ব্যবধান মরণতুল্য। এ পথের পথিককে সহ্য করতে হবে। এখানে পাখি ওড়ে না। কোন প্রাণী বিচরণ করে না। গোটা পথে একবিন্দু জল নেই। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। সর্বত্র যেন মৃত্যুর ফাঁদ বিছানো। আর সেই হাড় হিম করা মরুদেশের মধ্য দিয়ে একাকী এক সন্ন্যাসী পথিক ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। চারদিকে মৃত মানুষের চিহ্ন ছড়ানো। সেসব দেখতে দেখতে আরো ভয় চেপে বসে। হিউয়েন সাঙ ক্রমাগত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নামজপ করেন। আর 'প্রজ্ঞাপারিমিতাহৃদয় সূত্র' আবৃত্তি করেন।

একশ' লির মতো পথ পার হলেন। তারপর পথ হারিয়ে বসলেন। মরুভূমিতে পথ হারালে একই বৃত্তে বারংবার ঘুরে মরতে হয়। সেটাই হচ্ছিল। কোথায় সেই মিষ্টি জলের ঝর্ণা! সঙ্গে যে সামান্য জল ছিল, হাত থেকে পাত্র পড়ে গেল আর সমস্ত জল খোয়া গেল। ফিরে যাবেন বলে পূর্বদিশায় চতুর্থ বুরুজের দিকে পা বাড়ালেন কিছুদূর এগিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর শপথ ছিল – সামনে এগোবেন, কখনো পিছনের দিকে যাবেন না। পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমদেশে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে, তবে তাই হোক।

এভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। কী ভয়ঙ্কর মরুদেশ! কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। দিনের বেলা প্রবল বালুঝড়। রাতের আকাশে বুঝি বা অশরীরী আত্মারা জ্বলজ্বল করছে। তেষ্টায় প্রাণ কণ্ঠাগত। জল নেই। ক্ষুধায় জর্জরিত দেহ। খাদ্য নেই। তবু অকুতোভয়। চার রাত আর পাঁচটা দিন ধরে মরীচিকায় পড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। এক সময় বালির উপর শুয়ে পড়লেন। আর উঠে চলার ক্ষমতা নেই। উঠে দাড়ানোর শক্তি নেই। সাক্ষাৎ মৃত্যু শিয়রে। আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন। আর নাম জপ করছেন। কোন ধনসম্পদের লোভে তাঁর এই পরিব্রজন নয়। কোন যশাকাঙ্খার জন্য এই পর্যটন নয়। এ তো শুধু মহান সত্যকে জানার তীব্র আকাঙ্খায়। বোধিসত্ত্ব কি তাঁকে রক্ষা করবেন না? তাঁর প্রার্থনা কি তিনি শুনবেন না?

মধ্যরাতে শীতল বাতাস বইল। কোথা থেকে এল কে জানে! সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি শীতল জলে স্নান সেরে উঠলেন। অবসন্ন শরীরে তন্দ্রা এল। মনে হল কে যেন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এক বিশাল দীর্ঘকায় ব্যক্তি। তাঁর হাতে বল্লম। ইনি কি দেবতা? তিনি বলছেন – 'ওঠো, ভিক্ষু ওঠো, নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে যাও। ভগবান বুদ্ধ তোমাকে রক্ষা করবেন।'

প্রাণে সাহস এল। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়ালেন সামনের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ বাহনটি গতিমুখ পরিবর্তন করল। উত্তেজিত হয়ে প্রাণীটি মরুভূমির এক দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিপর্যস্ত পথিক রাশ আলগা করে বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে। মরুভূমিতে চলাফেরায় অভ্যস্ত ঘোড়া এটি। দেখা যাক ভাগ্য তাঁকে কোথায় নিয়ে যায়! সেই অশ্ব তাঁকে নিয়ে এল এক মরুদ্যানে। সামনে সবুজ ঘাস। প্রাণীটি বাঁচল। আরেকটু এগিয়ে তিনি পেলেন জল। তাঁরও প্রাণ বাঁচল।

একটা গোটা দিন বিশ্রাম নিলেন সেই জলাধারের পাশে। তারপর জল আর ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দুদিন চলার পরে মরুভূমি পার হতে পারলেন। **ইউ** (ই-গু) রাজ্যের নগর এসে গেল। কাও-চ্যাঙ রাজ্যের অধীন ক্ষুদ্র রাজ্য এটি। সেখানকার মঠে দেখা হল তিনজন চিনা সন্ন্যাসীর সঙ্গে। দূরদেশে স্বদেশবাসীর দেখা পেয়ে তাঁরা আবেগমথিত। তারপর পার হয়ে এলেন ইগুর কুমুল তথা হামি নামক মরুদ্যান। এটি সমৃদ্ধ জনপদ।

চলার পথের ডানহাতে টিয়েনশান পর্বতমালা। কুমুল ত্যাগ করে টিয়েনশানের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে চু নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। এসে পৌঁছলেন **তুরফান** রাজ্যে। সময় ৬৩০ খৃষ্টাব্দ। তুরফান রাজ্য গাও-চ্যাঙ বা কাও-চ্যাঙ নামেও পরিচিত। তার অর্থ হচ্ছে 'উন্নতির শিখর'। রাজা চৈনিক বংশোদ্ভূত, নাম ক্যু-ওয়েন-তাই (চু-ওয়েন-তাই)। কুকা নামেও ডাকা হয়। শক্তিমান রাজা। একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধও বটে।

হিউয়েন সাঙ যখন ইউ-রাজ্যে পৌঁছেছিলেন, তখনই তুরফানের রাজা মান্য সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। ফলে পরিব্রাজকের যে পরিকল্পনা ছিল তুরফানের উত্তর দিকের খানস্তূপ (কাগান স্তূপ, বিশবালিক বা পেইতিং) হয়ে অগ্রসর হবেন, তা বাতিল করতে হল। তিনি দক্ষিণ মরুভূমি পার করে ছ'দিন পরে এসে পৌঁছলেন তুরফান রাজ্যের সীমান্ত নগর পাই-লি (পিহলি, পিহচ্যান বা পিহচ্যাং)। সন্ধ্যা নাগাদ। বিশ্রাম নেওয়া হল না। মধ্যরাতে এসে পৌঁছলেন রাজধানী কিয়াওহোর রাজপ্রাসাদে।

কিয়াওহোর আধুনিক পরিচয় ইয়ারখোতো। তুরফানের কুড়ি লি পশ্চিমে অবস্থিত সেই রাজধানী। অন্য সূত্রে রাজধানীর নাম হুও-চউ বা কারাখোজো। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে কিয়ু নামক চিনা রাজবংশ তুরফানে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউয়েন সাঙ যখন তুরফানে আসেন তখনও ওই বংশের রাজত্বকাল বহাল ছিল।

রাজপ্রাসাদে রাজা-রানি জেগে বসেছিলেন। চিনা পণ্ডিতকে দর্শন করতে। তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাতে। তারপর পথশ্রমে ক্লান্ত পরিব্রাজকের ভার খোজার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। পরদিন সকালেই আবার রাজারানি উপস্থিত হলেন। প্রাতরাশে আপ্যায়ন করে প্রাসাদ সংলগ্ন বিহারে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেবার জন্য নিযুক্ত হল জনাকয়েক খোজা।

রাজ্যে তুয়ান নামে একজন পণ্ডিত বৌদ্ধ ছিলেন। আর ছিলেন আশি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ রাজগুরু। নাম ওয়াঙ। তুরফানের রাজার ইচ্ছা – হিউয়েন সাঙ ভারতভ্রমণের মতো দুর্গম যাত্রা বাতিল করে তুরফানে পাকাপাকি বসবাস করুন। সেই প্রস্তাব পেশ করতে রাজগুরুকে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, চৈনিক পরিব্রাজক সেকথা কানে তুললেন না।

দিন দশেক তুরফান রাজ্যে বাস করলেন। তারপরে বিদায়ের জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁকে তুরফান রাজ্যে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আরেকটু ভাবতে অনুরোধ জানালেন। আসলে রাজা ক্যু-ওয়েন-তাই ভেবেছিলেন – হিউয়েন সাঙের মতো বিদগ্ধ জ্ঞানী পুরুষ যদি আজীবন রাজসভার ধর্মীয় প্রধান হিসেবে থেকে যান, তাতে তাঁর ও রাজ্যের বিশেষ উপকার হবে। দেশবাসীর কল্যাণ হবে।

তারপর কথায় কথায় রাজা তাঁকে জানালেন – 'ভদন্ত, আমি আপনাকে প্রভূত সম্মান করি। স্থির করেছি আপনাকে আমার কাছেই রেখে দেব। আপনি আমার এই পরমর্শ গ্রহণ করুন। যদিবা পামির পর্বতমালার স্থানপরিবর্তন সম্ভব হয় তবু আমার সিদ্ধান্ত বদলানো সম্ভব হবে না। দয়া করে আমার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করুন। আমাকে সন্দেহ করবেন না।'

পরিব্রাজকের কাছে এ এক নতুন রকমের সমস্যা। একদিকে পরোপকারী রাজার বিরোধিতা করা যায় না। অন্যদিকে তাঁর স্বপ্নসাধ ও সত্যসাধনা ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। তাঁকে এই রাজার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই হবে। তিনি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। রাজাকে টলনো গেল না। এদিকে তিনিও নত হলেন না।

এক সময় প্রবল ক্ষোভে রাজা বলে উঠলেন – 'আপনাকে কবজা করার অন্য উপায় আমার জানা আছে। আপনি নিজে নিজে রাজ্য ছেড়ে কি করে চলে যাতে পারেন দেখি। দরকার হলে আপনাকে আমি আপনার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেব। এখনো সময় আছে, দয়া করে ভালো করে সবকিছু খতিয়ে দেখুন। মনে হয়, আমার অনুরোধ রক্ষা করাই আপনার পক্ষে সবদিক থেকে ভালো।'

হিউয়েন সাঙ বললেন – 'রাজন, এই দুর্গম যাত্রাপথে বেরিয়ে এখানে এসেছি মহান ধর্মের জন্য এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে। পথে আজ এমন এক কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হলাম। রাজন, আপনি আমার দেহকে আটক রাখতে পারেন। আমার মনকে পারেন না।'

একথা বলে পরিব্রাজক কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর কথা বলতে পারলেন না। কি করবেন তিনি? কি করে মুক্তি পাবেন? নিরুপায় হয়ে আহারনিদ্রা ত্যাগ করলেন। জলগ্রহণ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। এতদিন ভোজনকালে রাজা স্বহস্তে আহার্যদ্রব্য একটি পাত্রে তাঁকে নিবেদন করতেন। ঐ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ ভিক্ষু তা অস্বীকার করলেন। এভাবে

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন চলে গেল। চতুর্থ দিনে তাঁর শ্বাসপ্রক্রিয়া মৃদু হয়ে গেল। রাজা সংবাদ পেয়ে চিন্তিত। চিনাভিক্ষুর জীবনহানির সম্ভাবনায় সম্বিত ফিরে পেলেন। রাজা তাঁকে বললেন – 'ঠিক আছে মান্যবর, আপনাকে আপনার গন্তব্যে চলে যেতে দেবো। দয়া করে এবার কিছু খাদ্য গ্রহণ করুন।'

হিউয়েন সাঙ ভগবান বুদ্ধের সামনে ও রাজমাতা চ্যাঙের উপস্থিতিতে সেই প্রতিজ্ঞা কবুল করিয়ে নিলেন। তারপর আহার গ্রহণ করলেন। রাজাও পরিবর্তে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে ভারতভ্রমণ সাঙ্গ করে দেশে ফেরার পথে তিনি তিনটি বৎসর তার রাজ্যে বসবাস করবেন। আর ভারতে চলে যাওয়ার আগে আরো একটি মাস তুরফান রাজ্যে অবস্থান করে 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' সম্পর্কে দেশনা দেবেন। হিউয়েন সাঙ সানন্দে সম্মত হলেন।

তারপর একদিন বিশাল সমাবেশের আয়োজন হল। রাজা এলেন। রাজমাতা চ্যাঙ এলেন। রাজগুরু ওয়াং ও মন্ত্রীদল এলো। সভায় তিন শতাধিক লোকের সমাগম হল। সকলে বসে তাঁর কাছে ধর্মকথা শ্রবণ করল।

ইতিমধ্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ সন্ন্যাসীর যাত্রার বিশাল আয়োজন চলছে। তুরফানের রাজা তাঁকে শুধু যে যাত্রার অনুমতি দিলেন তা নয়। প্রচুর রসদ দিয়ে সাহায্য করলেন। তাঁর জন্য তৈরী হল ত্রিশ প্রস্থ পোষাক। শীত নিবারণের জন্য দস্তানা-মোজা-জুতোর সঙ্গে মুখ ঢাকার অবগুণ্ঠন। দিলেন একশ স্বর্ণ-মুদ্রা, ত্রিশ হাজার রজত মুদ্রা ও পাঁচশ' বাণ্ডিল সিল্ক। মোট বহন করার জন্য ত্রিশটি ঘোড়া, পঁচিশখানা গাড়ি আর আর জনা পঁচিশ লোক। আরো সঙ্গে দিলেন চারজন শিক্ষানবীশ সেবক। এ ছাড়া সেই সঙ্গে দিলেন চব্বিশজন রাজার কাছে চব্বিশখানা পত্রলিপি। তার মধ্যে কুচার রাজার কাছে একটি পত্র ছিল। প্রত্যেক রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ এক বাণ্ডিল করে সূক্ষ্ম রেশম। তারপর প্রাসাদের কর্মচারী হুয়া-সিন ও আরেক রাজকর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন হিউয়েন সাঙকে সম্রাট সেহু খানের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। সেহু খানের জন্য পাঁচশ' বাণ্ডিল রেশম ও দুই গাড়ি ফল পাঠানো হল। আর তাকে পত্রে লিখলেন – 'পত্রবাহক তীর্থযাত্রী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার মতোই তাঁর সঙ্গে সমুচিত ব্যবহার করতে অনুরোধ জানাই।'

বিদায় নেওয়ার আগে হিউয়েন সাঙ এক দীর্ঘ পত্র লিখে রাজ-উদারতার প্রভূত গুণগান করলেন। তিনি লিখলেন – '...কাশ্যপ মাতঙ্গ ও সঙঘবর্মন উ এবং লো দেশে ধর্ম গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, ধর্মরক্ষ ও কুমারজীব চিন ও লিয়াঙে তা সুশোভিত করেছেন।

অথচ বুদ্ধের অনন্য শিক্ষা আজ দুই চরম মতবাদে বিভক্ত, মহাযানের মতো অসাধারণ তত্ত্ব উত্তর ও দক্ষিণের সম্প্রদায়ে বিভাজিত। ... কুড়ি বৎসর ধরে অনেক চর্চা করেও তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারা যায়নি। ... তাই এই যাত্রা আপনি মহান রাজা ...

ক্রোরেইনা ও কারাশহর, বেশবালিক ও ল্যাঙওয়াঙের মতো রাজ্যও আপনার করুণা ও সদগুণে প্রভাবিত। ... আপনি আমাকে ভ্রাতা বলে সম্মান জানিয়েছেন। ... আর পাথেয় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আমার ভারতভ্রমণে বিশ বছরের রসদ।'

পত্রশেষে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। তারপর রাজ-বদান্যতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবোদ্যমে ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। আর তিনি রাজ্য থেকে পলায়নপর এক বৌদ্ধ শ্রমণ মাত্র নয়। এখন তিনি রাজ অনুজ্ঞায় লালিত সুপরিচিত তীর্থযাত্রী। রাজারানি ভিক্ষু অমাত্যবর্গ ও জনতার ঢল তাঁকে নগরের পশ্চিম প্রান্ত অবধি এগিয়ে দিল। রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অশ্রুধারা প্রবাহিত তাঁদের নয়নে। রানিদের প্রাসাদে ফিরিয়ে দিয়ে রাজা ও ভিক্ষুরা আরো কয়েক লি দূরত্ব অবধি তাঁকে সঙ্গ দিলেন। তারপর বিদায় জানালেন।

তুরফান রাজার কাছে লিখিত পত্রে হিউয়েন সাঙ কয়েকজন ধর্মপ্রচারকের নাম করেছেন। ভারত থেকে সর্বপ্রথম যে দুজন ধর্মপ্রচারক চিনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কশ্যপ মাতঙ্গ (চু মো-তেং)। ইনি ৬৭ খৃষ্টাব্দে হান শাসক মিঙতির আমন্ত্রণে চিনের লোইয়াংঙে পৌছান। অন্যজন ধর্মরত্ন (চু-ফা-লান)। এঁদের জন্যই শ্বেতাশ্ব বিহার নির্মিত হয়। এঁরা বৌদ্ধশাস্ত্রাদি চিনা ভাষায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মধ্য এশিয়ার ধর্মরক্ষ (চু-ফা-হু) জীবনকাল ২৩০ থেকে ৩১৭ খৃষ্টাব্দ। ভারত থেকে শিক্ষালাভ করে তৃতীয় শতকে চিনে ফিরে গিয়েছিলেন। তুনহুয়াং তাঁর জন্মস্থান। ইয়েচিহ বংশোদ্ভূত এই বহু ভাষাবিদ জীবনের অনেকটা সময় শ্বেতাশ্ব বিহারে অতিবাহিত করেন। এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ভাষান্তরিত করেন। এক বিদ্বান বংশে জন্মগ্রহণ করেন কুমারজীব (৩৪৩-৪১৩ খৃঃ)। কাশ্মীরের অমাত্যপদ পরিত্যাগ করে তিনি বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করেছিলেন। মধ্য এশিয়ার খোটান-কাশগর-ইয়ারকন্দ সহ পূর্ব তুর্কিস্তানে তাঁর অনেক শিষ্য। তিনি যখন কুচা রাজ্যে অবস্থান করছিলেন তখন উত্তর চিনের সম্রাট ফু-কিয়েন তাঁকে চিনে পাঠিয়ে দিতে কুচের রাজাকে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ রক্ষা করতে কুচা অসম্মত হয়েছিল। চিনসম্রাট সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে যুদ্ধ করে ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবকে বন্দী করে চিনদেশে নিয়ে যান। দীর্ঘ বন্দীদশা থেকে মুক্তি মেলে চিন সম্রাট ইয়াও-চিঙের সময়। ৪০১ খৃষ্টাব্দে। তাঁকে রাজগুরু (কুয়োশিশ) হিসেবে রাজধানী চ্যাঙানে প্রতিষ্ঠিত করেন। চ্যাঙানের মহাবিহারে কেটে গিয়েছিল কুমারজীবের জীবনের অন্তিম বারোটা বছর। তিনি প্রচুর গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

৪। তুরফান থেকে বামিয়ান

তুরফান - কারাশার - কুচা - অকসু - লেক ইশিককুল - টোকম্যাক-তালাসু - ইসফিদজাব - কুইউ - নেইকেন্দ - তাশখন্দ - সমরকন্দ - কোচানিয়া - খরগন - বোখারা - কসন্না - লৌহদ্বার-তুহুয়োলো - কূন্দুজ-বলখ-তাপাসু - বল্লুক-যুমধ - গুজগন - গচি - বামিয়ান

মধ্য এশিয়ার ভৌগলিক চেহারা আমাদের কাছে সাধারণভাবে অচেনা। মহাচিনের পশ্চিমে আর তিব্বতের উত্তরে চিনা তুর্কিস্তানের কথাটা হয়তো জানা। পামির গ্রন্থির পূর্বদিকে আর হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত। তিব্বতের উত্তরে কারাকোরম-কুনলুনশান ও আস্তিনতাগ-নানশান পর্বতমালা তিব্বতকে ঘিরে রেখেছে। আরো উত্তরে তাকলামাকান মরুভূমি বিস্তৃত রয়েছে চিনের সিনকিয়াং অঞ্চলে। মহাচিনের পশ্চিমে এরই অন্য নাম চিনা তুর্কিস্থান। সিনকিয়াং এলাকা ঘিরে রেখেছে দক্ষিণে কুনলুন-আস্তিনতাগ ও উত্তরদিকে টিয়েনশান পর্বতমালা। চিনা তুর্কিস্তানের উত্তরে টিয়েনশান পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালের কোল ঘেঁষে রয়েছে কয়েকটি ঐতিহাসিক নগর – কাশগর, অকসু, কুচা, কারাশার, তুরফান ও হামি। আর দক্ষিণে কুনলুনশান আস্তিনতাগ ও নানশান পর্বতমালার উত্তর ঢালের কোল ঘেঁষে রয়েছে কাশগর ছাড়িয়ে খোটান ইয়ারকন্দ ইত্যাদি নগর। পামির থেকে পশ্চিমে দুই বাহুর মতো প্রসারিত টিয়েনশান ও কুনলুনশান। যেন ঘিরে রেখেছে তাকলামাকান মরুভূমিকে। ঐ মরুদেশের দুদিকের নগরসকল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুটি বাণিজ্যপথ আছে সিল্ক রুট নামে। তারই পূর্বপ্রান্তে তুনহুয়াং আর পশ্চিমে কাশগর নগর। কাশগর থেকে তাসখন্দ-সমরখন্দ ও ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে যাওয়ার পথ আছে। বলখ ও খোটান থেকে রাস্তা গিয়েছে তক্ষশীলার দিকে। মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উক্ত নগরগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আমাদের পরিব্রাজক যে পথ ধরে স্বদেশ থেকে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন, ঠিক সেই পথ দিয়েই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নি। প্রথম দফায় তাঁকে তুরফান থেকে কারাশাহর কুচা ও অকসু হয়ে পশ্চিমে যেতে হবে। তারপর টিয়েনশান পর্বতমালা পার হতে হবে তাসখন্দ-সমরখন্দের পথে।

তুরফান থেকে চৈনিক পরিব্রাজকের গতিমুখ পুরোপুরি পশ্চিমের দিকে। অতিক্রম করলেন **উপাওন** ও **তোসিন**। অনন্তর প্রবেশ করলেন অগ্নি রাজ্যে। পথে পড়ল আর্ঘাই-বুলক নামের ঝর্ণা। গুরু ঝর্ণা বা টিচারস ফাউনটেন। এমন নামকরণের পিছনে নাকি কাহিনী আছে। একটি রাত ঝর্ণার পাশে কাটিয়ে পরদিন পার হলেন সু-উচ্চ কুমুশ পর্বত (রজত পর্বত)। কুমুশ পর্বতে সত্যি সত্যি প্রচুর রূপো পাওয়া যায়। রূপো নয়, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক ডাকাতদলের। পর্বত পার হয়ে। তবে ডাকাতদলটি মোটের উপর ভালো লোকের ডাকাতদলই হবে। কেননা তারা কিছু এটাসেটা হাতে

পেয়েই খুশিমনে সরে পড়ল। যাত্রীদলটিকে এক রাত পথেই কাটাতে হল। পরদিন যেতে যেতে চোখে পড়ল এক শিহরণকারী দৃশ্য। ডাকাতের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে ছিন্নভিন্ন একদল বণিক পথে পড়ে আছে। দুঃখিত মনে তাঁরা রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। কাওচাঙ থেকে অগ্নিরাজ্য ৯০০ লি দূরে।

অগ্নি রাজ্যকে উকি বা **কারাশার** বা ইয়েনচি রাজ্যও বলে। হিউয়েন সাঙ অবশ্য বলেছেন – অ-কি-নি। ইয়াঙ্কি নামেও পরিচিতি আছে। ফা-হিয়েন একে বলেছেন উই রাজ্য। রাজধানী নান-হো-চেং অথবা ইয়ুন-কুতে। সম্ভবত নগরটি বগরাস (বোসটাং, বরাশহর) লেকের কয়েক লি উত্তরে কারাশারে অবস্থিত। উত্তরে সত্তর লি দূরে আক-তাগ পর্বত (শ্বেত পর্বত)। রাজ্যটি দৈর্ঘ্যে ৬০০ লি ও প্রস্থে ৪০০ লি। রাজধানীর সীমানা ছয়-সাত লির মতো। কারাশার (যার অর্থ কালো শহর) খাদিক-গোল নদীর তীরে অবস্থিত। নগরটি বড়োসরো বটে কিন্তু ভয়ানক নোংরা।

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু হয়েছে অকিনি থেকে। বৃত্তান্তের শুরু ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে। আমরা জীবনীকারের কাহিনী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে পরিব্রাজকের ভারতভ্রমণের কথা জানার চেষ্টা করব।

অকিনি রাজ্যের চারদিকে পাহাড়। রাস্তা কঠিন। নগরটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষায় সুরক্ষিত। উত্তরের শ্বেত পর্বত থেকে জাত অসংখ্য জলধারা যুক্ত করে বইছে খাইদু নদী। জোয়ার, গম ও সুগন্ধী জুজুবে নামক গুল্ম, আঙুর, নাসপাতি ও শুকনো কুল চাষের ব্যবস্থা আছে। জলবায়ু মনোরম। মানুষজন সৎ। চুল ছোটো করে ছাঁটা, মাথায় পাগড়ি নেই। পোষাক মোটা ও সূক্ষ্ম পশমের। অনেকটা ভারতীয়দের মতো লিখনরীতি। রাজ্যে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। অগ্নিদেশের রাজা (লুঙ-তুকিচি) সাহসী তবে চতুর নয়। বলতে গেলে রাজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই। দশটির বেশি বিহার আছে। দু হাজারের উপর বৌদ্ধ শ্রমণের বাস। সকলেই হীনযানী সর্বাস্তিবাদী শাখার। তারা তিন রকমের 'শুদ্ধ মাংস' গ্রহণ করে।

(বৌদ্ধদের মধ্যে শুদ্ধ মাংসভোজন? জানা দরকার ব্যাপারখানা কি! বৈশালীর অভিজাত সামন্ত সীহ বুদ্ধের সময়কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদের মাংস সরবরাহ করতেন। এ নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে ও কোলাহল শুরু হয়। বুদ্ধের কাছেও এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। তিনি সমস্ত ভিক্ষুদের জড়ো করে জানালেন – 'যে প্রাণীকে তারা হত্যা করতে দেখেছে বা তাদের জন্য হত্যা করা হয়েছে বলে শুনেছে অথবা তাদের জন্য হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে, সেই প্রাণীর মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হল।' তদর্থ অন্য তিনভাবে (অদৃশ্য, অশ্রুত বা সন্দেহহীনভাবে) পশুহত্যা হলে তা শুদ্ধ বা নীতিসম্মত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এরকম ভাবনা 'ক্রমিক শিক্ষা' নামে পরিচিত। বিপরীতে যে শিক্ষায় পশুমাংস সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বলা হয়, তা 'তাৎক্ষণিক শিক্ষা'।)

আগ্নি রাজ্যের অরণ্যবিহারটি সর্ববৃহৎ। ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য ধর্মগুপ্ত এখানে এসেছিলেন। রাজ্যের রাজা ও সভাসদগণ হিউয়েন সাঙকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করল বটে তবে তাঁকে ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করল না। কিছুদিন আগে কাওচাং-এর ডাকাতেরা তাদের রাজ্যে লুঠতরাজ চালায়। সেই ক্ষোভ তখনো তাদের বিচলিত রেখেছে। একরাত অগ্নিরাজ্যে থেকে হিউয়েন সাঙ বিদায় নিলেন। গতিমুখ হল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

পরদিন ২০০ লি দূরের পাহাড় পেরিয়ে একটি বড়ো নদী পেরোতে হল। নদীর নাম খাইদু বা কাইদু বা কাইদিক বা হাইদিক বা তান। এক নদীর কত নাম! আসলে নানা ভাষায় নানা নাম হয়েছে। নদী পার হয়ে তারপর কয়েক শ' লি দূরত্ব মোটামুটি সমতল প্রান্তর পড়ল।

প্রায় ৭০০ লি দূরত্ব পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন কুচি বা কুচা রাজ্যে। রাজ্যের আয়তন একদিকে ১০০০ লি, অন্যদিকে ৬০০ লির মতো। রাজধানী সতোরো-আঠারো লি সীমানা বিশিষ্ট। রাজ্যে জোয়ার, গম, ধান, আঙুর, ডালিম, নাসপাতি, কুল, পীচ ও খোবানির চাষ হয়। উৎপন্ন হয় সোনা, লোহা, তামা, সীসা ও টিন। ভারতীয় লিপিমালা অনেকটাই পরিবর্তন করে গৃহীত হয়েছে। তারা পশমের বস্ত্র পরিধান করে। চুল ছোট রাখে ও মাথায় পাগড়ি থাকে। পাইপ ও তারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী।

কুচা রাজ্যের রাজার নাম পাই। লু-কুয়াঙের বংশধর। রাজা, অমাত্যবর্গ ও মোক্ষগুপ্ত নামের পণ্ডিত সন্ন্যাসী প্রাসাদ ছেড়ে এগিয়ে এসে হিউয়েন সাঙকে অভ্যর্থনা জানাল। সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাজধানীর পূর্ব প্রবেশদ্বারের বাইরে তাবু খাটিয়ে সেখানে অপেক্ষারত ছিল। পরিব্রাজক এসে পৌঁছতেই প্রবল অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল। তাবুতে নিয়ে পুষ্পস্তবক ও দ্রাক্ষারস দিয়ে সম্মান জানানো হল। কাওচ্যাঙের কিছু সন্ন্যাসী নগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি পৃথক বিহারে বাস করছিল। তারা পথশ্রমে ক্লান্ত পরিব্রাজককে প্রথম রাত তাদের মঠে কাটানোর জন্য আহ্বান জানাল।

পরদিন মান্য অতিথির রাজপাসাদে সাদর আমন্ত্রণ। তিনপ্রকার 'শুদ্ধ মাংস' ভোজনের জন্য দেওয়া হল। বৌদ্ধদের মধ্যে যারা মাংসাহার বর্জন করতে পারে না, তাদের জন্য বিশেষ ছাড় – পশুহত্যা না দেখে, না শুনে, ও না জেনে হলে মাংসাহার চলতে পারে। তা সত্ত্বেও হিউয়েন সাঙ তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক দেখে রাজা বিস্মিত। তখন জানানো হল – মাংসাহার বিষয়ে দুটি মতধারা আছে; এটি একমতে প্রচলিত হলেও অন্যমতে নয়। চিনা পরিব্রাজক নিষ্ঠবান মহাযানী – পশুমাংস গ্রহণে অসমর্থ। তখন তাঁকে অন্য ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হল। আহারান্তে তিনি নগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আশ্চর্য বিহারে গমন করলেন।

কুচা রাজ্যে শতাধিক মঠ আছে। পাঁচ হাজার শ্রমণ বাস করে। থেরবাদীদের প্রাধান্য বেশি। কুচার পূর্বদিকস্থ নগরের উত্তরে যে দেবমন্দির আছে তার সামনে বিশাল নাগ-

সরোবর আছে। সেখানে নাগেরা নিজেদের অশ্বে রূপান্তরিত করে অশ্বিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এসব নিয়ে আরো অলৌকিক কাহিনী পচলিত আছে। সরোবরের নাগকুল মানবরূপ ধারণ করে রাজ্যের মানবীর সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের মিলনে জাত সন্তানেরা শক্তিমান, সাহসী ও দৌড়বীর ছিল। ক্রমে রাজ্যের সকল প্রজাই নাগপিতা ও মানবমাতার সন্তান হয়ে গেল। তারা রাজ্যশাসন না মেনে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন রাজা তুর্কদের সাহায্য নিয়ে সমস্ত পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করল। ফলে স্থানটি বসতিহীন জঙ্গল হয়ে গেল।

চল্লিশ লি উত্তরে নদীর ওপাড়ে পাহাড়ের ঢালে এক পরিত্যক্ত নগর আছে। সেখানে দুটি বিহার আছে। উভয়কেই চাও-হু-লি বিহার বলে – পূর্ব ও পশ্চিমের চাও-হু-লি বিহার। ঐ বিহারের বুদ্ধমূর্তিগুলি অসাধারণ শিল্পকর্ম। পূর্ব চাও-হু-লি বিহারের বুদ্ধ-সভাকক্ষে দু'ফুট চওড়া হালকা হলুদ পান্নার শিলা আছে। তার উপর বুদ্ধের কুড়ি ইঞ্চি দীর্ঘ পদচিহ্ন অঙ্কিত। উপবাসের দিনে তা থেকে নাকি উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়।

রাজধানীর পশ্চিমদ্বারের বাইরে বুদ্ধের দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। প্রধান সড়কের দুপাশে। নব্বুই ফুট উঁচু মূর্তি। এখানে পাঁচ বৎসর অন্তর মহামেলা আর প্রতি বৎসর শরৎমেলা বসে। বেশ বড়ো মেলা। সারা দেশ থেকে প্রভূত জনসমাগম হয়। তখন রাজা রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করে। সমস্ত বিহার থেকে বুদ্ধমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। মেলামাঠের উত্তর-পশ্চিমে নদীর অন্যপারে আ-শে-লি-ই (আশ্চর্য) বিহার। বিশালাকার সভাকক্ষ ও বুদ্ধের চমৎকার মূর্তি আছে সেই বিহারে। লোকপ্রবাদ – বিহারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অনেক অলৌকিকতা। কুমারজীবের সমসাময়িক বিমলাক্ষ এই আশ্চর্য বিহারের ছাত্র ছিলেন। ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য ধর্মগুপ্ত নাকি এখানকার কোন বিহারে বাস করেছিলেন।

আশ্চর্য মঠে তখন বৌদ্ধগুরু মোক্ষগুপ্ত বাস করছেন। ইনি বিশ বৎসর ভারতে ছিলেন। বহু শাস্ত্রবিদ ও শব্দবিদ্যায় পারদর্শী। হিউয়েন সাঙকে বললেন – 'এদেশেই তো রয়েছে 'সম্যুক্তাভিধর্মহৃদয় শাস্ত্র', 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'বিভাষা শাস্ত্র'। এর অধ্যয়নই যথেষ্ট হবে। মান্যবর অতিথিকে সেজন্যে কষ্ট করে ভারতে না গেলেও চলে।'

হিউয়েন সাঙ জানতে চান – 'আপনাদের কাছে 'যোগাচার্যভূমি শাস্ত্র' আছে?'

'– ওই বিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্র দিয়ে কি হবে? প্রকৃত বৌদ্ধরা তা শিক্ষণীয় বলে মনে করে না।'

তর্ক শুরু হয়ে গেল। হিউয়েন সাঙ বললেন – 'ভদন্ত! 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'বিভাষা শাস্ত্র' অগভীর; চরম সত্য নয়। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কর্তৃক প্রকাশিত মহাযানী 'যোগাচার্যভূমি শাস্ত্র' শিক্ষার জন্য আমার ভারত যাত্রা।'

মোক্ষগুপ্ত 'বিভাষা শাস্ত্র' ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুঁথিসকল সুগভীর ও তত্ত্বদর্শী হিসেবে মানেন। এদিকে হিউয়েন সাঙ যখন তাঁকে 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' থেকে উদ্ধৃতি দিতে

বললেন, মোক্ষগুপ্ত ভুল করে বসলেন। হিউয়েন সাঙ অন্য একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করে অর্থনির্ণয় করতে বললেন। এবারও মোক্ষগুপ্ত ব্যর্থ হলেন। লজ্জিত হয়ে নতমুখে বসে রইলেন। আর স্বীকার করে নিলেন যে চৈনিক সন্ন্যাসী অতি উচ্চমার্গের পণ্ডিত।

শীতের সময়। চারদিকে তুষার জমাট-বাঁধা। বরফ না গলা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ। পথ চলাচল অসম্ভব। বাধ্য হয়ে হিউয়েন সাঙকে অগ্রবর্তী যাত্রা পিছিয়ে দিতে হচ্ছিল। দু'মাসের উপর তাঁকে কুচা নগরেই বসে থাকতে হল। তারপর পথ খানিকটা বরফমুক্ত হতে আবার বেরিয়ে পড়লেন। কুচার রাজা উট, ঘোড়া ও লোকজন দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করল। নগরপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বিদায় জানাল পণ্ডিত পরিব্রাজককে।

পথে পথে দুদিন গেল। ৬০০ লির মতো দূরত্ব অতিক্রম করে ছোট একটি মরুভূমি পড়ল। সেসব পেরিয়ে পৌঁছলেন পো-হ-লু-কা (বালুকা) রাজ্যে। প্রাচীনকালে কুমো, কিমো, কিমে বা কুমে নামে পরিচিত ছিল। তুর্কী ভষায় কুম মানে বালি বা মরুভূমি। বালি – বালুকা থেকে পোহলুকা। বর্তমান নাম **অকস**।

ছোট রাজ্য – দৈর্ঘ্যে ৬০০ লি, প্রস্থে ৩০০ লি। রাজধানী পাঁচ-ছয় লি পরিধির। নাম নানচেঙ বা পোহান। কোন কোন মতে রাজধানীর নাম খর-ইয়ারগুন। সঠিক অবস্থান নির্ণীত হয়নি। কুচ রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের অমিল খুবই কম। কেবল কথ্য ভাষাটি অন্যরকম। এ রাজ্যের সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র ও ফারের দ্রব্যাদি অন্য রাজ্যে খুবই সমাদৃত। দশটি সঙঘারাম আছে ও এক হাজার সর্বাস্তিবাদী শ্রমণ। হিউয়েন সাঙ একরাত পোহলুকার রাজধানীতে থাকলেন। পরদিন থেকে গতিমুখ হল উত্তর-পশ্চিমে।

আসলে অকসু থেকে কাশগর হয়ে পামির অতিক্রম না করে তিনি পামিরের উত্তর দিক দিয়ে অগ্রসর হতে চাইলেন। বণিকের দল নাকি দুর্গম পামির পার্বত্যভূমি এড়িয়ে এপথেই বেশি যাতায়াত করে। পাথুরে মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ৩০০ লি পথ পেরিয়ে এসে উপনীত হলেন পামির গ্রন্থির উত্তরভাগে। সেদিকে রয়েছে টিয়েনশান পর্বতমালা যার একপ্রান্তে অবস্থিত তুষারমৌলি লিঙশান (পিঙশান) – চিনের জিনজিয়াং ও কিরঘিজস্তানের মধ্যে টিয়েনশানের সর্বোচ্চ পর্বত এটি। তুর্কি ভাষায় বলে মুসুর-দবগন। নামই তার তুষার পর্বত। এদিকটা সাঙলিঙের উত্তর দিক আর এখান থেকে উদ্ভূত সমস্ত জলপ্রবাহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় সে এক অনন্ত তুষাররাজ্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে বরফ জমেছে গিরিখাতে, তা বুঝি কখনো বিগলিত হয়নি। পথে একাধিক হিমবাহ অতিক্রম করতে হবে। শীত-কুয়াশা আর ঘন মেঘের জমাট আস্তরণে সবকিছু অদৃশ্য। চারদিকে কেবল বরফ আর বরফ। যখন বরফচূড়া ভেঙে পড়ে রাস্তা জুড়ে তখন কয়েক শ' ফুট উঁচু হয়ে পথ আগলে পড়ে থাকে। রাস্তা বড়োই বন্ধুর। চলাফেরা অতি দুর্গম। তার উপর হিমশীতল প্রবল বাতাস আর নীহারপুঞ্জ। দুয়ে মিলে শীতের অসহ্য বাতাবরণ

তৈরী করে রেখেছে। দুটো জুতো ও দুটো ফারের কোট পড়েও হি হি করে কাঁপতে হচ্ছে। অভিযাত্রীদের পদে পদে বর্বর নাগ তথা ড্রাগনের ভয় – লাল পোষাক পরা চলবে না, অলাবু পাত্র (কালাবাশ) বহন করা চলেবে না আর শব্দ করা চলবে না। যে কোন সময় ঘোর বিপত্তি ঘটে যেতে পারে। কখন যে উপর থেকে শিলাপতন ঘটবে কেউ জানে না। শয়ন বা রান্না করার জন্য শুকনো জায়গা নেই একদম। রাতে শুতে হবে বরফের উপর। সাত দিন লাগল সেই দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে। দলের মধ্যে বারো-চৌদ্দ জন লোকের প্রাণ গেল। কয়েকজন মারা গেল ঝঞ্ঝাতাড়িত হিমবাহের ভাঙা বরফটুকরোর আঘাতে। কেউ মারা পড়ল তুষারধ্বসে। কেউ তুষারসৃষ্ট ফাটলের গভীরে তলিয়ে গেল। কেউ বা স্রেফ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা পড়ল। মানুষের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় মারা পড়ল বাহক পশু। হিউয়েন সাঙ তবু অকুতোভয়। পথচলায় বিরত নয়। তাঁকে এগিয়ে যেতে হবেই।

পণ্ডিতগণের অনুমান, তিনি সাত হাজার ফুট উঁচু গিরিপথে খান টেংরি আরোহণ করেন। এভাবে টিয়েনশান পর্বতমালার বেদাল (বেদেল) গিরিপথ দিয়ে পর্বত অতিক্রম করে পৌছেছিলেন কিরঘিজস্তানে। বেদাল যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই মুজার্ত গিরিপথ ধরে গিয়েছিলেন। একদা এই বেদেলকে ধরা হত মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথের অন্যতম জংশন বলে। বর্তমানে পামির মালভূমির অংশ।

বোধহয় ৪০০ লি পথ পেরোতে হল। আজাকতাশ (চেন-চু) নদী পার হয়ে অনতিদূরে পড়ল স্বচ্ছ জলের ৎসিং লেক বা **ইশিককুল** হ্রদ। ১১২ মাইল দীর্ঘ ও ৩৮ মাইল প্রশস্ত। ইশিককুল মানে 'উষ্ণ জলের' লেক। চারদিকে বরফের পর্বত তবু লেকের জল কখনো জমে যায় না, তাই এই নাম। চিনারা বলে জো-হাই, মঙ্গোলরা বলে তেমুর্তু-নর। বর্তমানে লেকের অবস্থান কিরঘিজস্তানে। লেকের চারদিকে পাহাড়। অনেক স্রোতধারা এসে পড়েছে ঘন আকাশী নীল রঙ জলে। লবণাক্ত স্বাদের জন্য এর অন্য নাম 'লবণ হ্রদ'। বিশাল জলরাশিতে প্রবল তরঙ্গদোল ওঠে। মীন ও নাগকুল যথেচ্ছ বিহার করে। কখনো কখনো এখানে অলৌকিক শিশুরা এসে পড়ে। যাত্রীরা বিনীত হয়ে সৌভাগ্য প্রার্থনা করে। তারা কখনো জলে মাছ ধরতে সাহস করে না।

লেক পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দুটি পথ আছে। একটি লেকের দক্ষিণ পাশ দিয়ে তুলনামূলক দুর্গম দক্ষিণাপথে। আর অপেক্ষাকৃত সহজতর কিন্তু দীর্ঘতর হল উত্তরের পথ – কারাকোল হয়ে পূর্ব ও উত্তর পাশ ঘুরে যেতে হয়। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত কষ্টকর দক্ষিণের পথ ধরেই এগিয়েছিলেন। একটি সূত্র বলছে – লেক ধরে উত্তর-পশ্চিমদিকে ৫০০ লির উপর পথ এগিয়ে পৌছেছিলেন শু-শে (শুয়েহ) জল-নগরে যার আধুনিক নাম **টোকমাক**। প্রাচীন আরেক নাম সুইয়াব। অবস্থান কিরঘিজস্তানে। ছয়-সাত লি সীমানা নগরের। চু নদীর তীরে অবস্থান। প্রাচীন বাণিজ্যপথের অন্যতম কেন্দ্র বলে

বণিক ও নানা অঞ্চলের তাতার জাতির বসবাস। জোয়ার গম ও আঙুরের ফলন হয়। গাছপালা কম। পশমের ব্যবহার খুব। শু-শের পশ্চিমে ছোট ছোট নগর আছে অনেক। প্রত্যেকটি নগর তুর্কের অধীনস্থ হলেও প্রতিটি নগরের জন্য স্বাধীন রাজ্যপাল আছে।

শুশে জল-নগর থেকে কসন্ন রাজ্য পর্যন্ত অবস্থিত দেশ ও দেশের অধিবাসীকে সু-লি বলা হয়। তাদের ভাষার নামও সুলি। কুড়িটি অক্ষর নিয়ে ভাষা। উপরনিচে খাড়াভাবে পাঠ করতে হয়। লোকজন ভিতরে মোটা পশম আর বাইরে চামড়া ও উলের পোষাক পড়ে। কপালের উপর সিল্কের ব্যাণ্ড বাঁধা থাকে। মানুষজনের মাথা হয় পুরোপুরি ন্যাড়া নয়তো মাথার শীর্ষদেশ মুণ্ডিত থাকে। তারা বিশাল দেহী অথচ ভীতু কপট শঠ ও অর্থলিপ্সু। পিতাপুত্র লাভের আশায় কেবল মতলব ভেঁজে চলে। তাদের ভাবনায় ধনসম্পদেই সুনাম হয়। বড়ো বড়ো ধনীও সামান্য খাদ্য ও সাধারণ পোষাক পড়ে থাকে। রাজ্যের অর্ধেক লোক ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকে। বাকি অর্ধেক কৃষিজীবি।

শুশে নগরে হিউয়েন সাঙের সঙ্গে দেখা হল সেহু খানের। রাজাকে এখানে খাকান বলে। বর্তমান রাজার নাম সেহ-হু খান। সম্ভবত পশ্চিম তুর্কির তো-লু খানের আত্মীয় সে। এই সেহু খানের কাছেই তুরফানের রাজার বিশেষ পত্র ও উপঢৌকন পাঠানো হয়েছিল। তার সঙ্গে চিনের তাঙ রাজারও সুসম্পর্ক আছে।

খাকানের সামরিক সম্ভার জবরদস্ত। দীর্ঘকায় পুরুষ – পরনে সবুজ সাটিনের আলখাল্লা। কপালের উপর দশ ফুট লম্বা সাদা সিল্কের পাগড়ি ব্যাণ্ডের মতো করে জড়ানো – পিছনের দিকে ঝুলে আছে; মাথার চুল খোলা। দুপাশে দুশ' মন্ত্রী দাঁড়িয়ে। তাদেরও এমব্রয়ডারি করা সিল্কের আলখাল্লা পরনে আর মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সেনাদল মোটা উলের পোষাক পড়ে পিছনের দিকে হাতে বর্শা, পতাকা ও ধনুক নিয়ে অপেক্ষারত। দূরে উট ও অশ্বের বিরাট বাহিনী বহুদূর অবধি বিস্তৃত। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খাকান আনন্দ প্রকাশ করলেন। অতিথিকে শিবিরে বিশ্রামের আমন্ত্রণ জানালেন। খাকানের তখন শিকারে যাওয়ার ব্যস্ততা। অতিথির দেখাশোনার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গেলেন হা-মো-চিহ (তা-মো-চিহ) নামের মন্ত্রীকে।

তিনদিন পরে ফিরে এসে অতিথিকে নিজের শিবিরে আহ্বান করলেন। সেদিন তাবু থেকে ত্রিশ পা এগিয়ে সেহু খান চিনা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙও প্রত্যাভিবাদন জানালেন। তারপর শিবিরে প্রবেশ করলেন।

খাকানের বিশাল তাবুতে সোনার সূক্ষ্ম সূচীকর্ম চোখ ধাধানোর মতো। তুর্কীরা অগ্নি উপাসক বলে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে না। মেঝেতে মোটা কার্পেট পেতে বসে। অতিথির জন্য অবশ্য লোহার চৌকির উপর মোটা আসনের বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝলমলে ব্রোকেডের পোষাক পড়ে মন্ত্রীরা দুপাশে দীর্ঘ সারিতে সেই কার্পেটের আসনে বসে। অন্যরা পিছনে দাঁড়িয়ে। সকলের উপবেশনের পরে চিন ও কাওচাঙের প্রতিনিধিরা এসে তাদের পরিচয়

দাখিল করল এবং সঙ্গে নিয়ে আসা রাজার পত্রখানা পেশ করল। সন্তুষ্টমনে খান তাদের বসতে বলে পত্রপাঠ করলেন। তারপর সুরা ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হল। কেবল অতিথির জন্য দ্রাক্ষারস। সকলে সুরাপান করছিল। আহারের জন্য প্রচুর ঝলসানো গরু ও ভেড়ার মাংস পরিবেশিত হল। অতিথির জন্য বরাদ্দ ছিল কেক, ভাত, ননী, দুধ, শর্করা, মধু ও দ্রাক্ষা। ভোজনপর্ব শেষ হলে অতিথিকে ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করা হল। হিউয়েন সাঙ 'দশশীল' আর মুক্তির জন্য পারমিতা সম্পর্কে উপদেশ দান করলেন। খাকান সালাম জানিয়ে সহর্ষে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন।

দিন কয়েক পরে খান রাজাও তাঁকে তার দেশে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। বলেছিলেন – 'ওই ইন-টে-কা দেশে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ওখানে গরম এত বেশি যে তাঁর পক্ষে বেশিদিন বাস করা সম্ভব হবে না। অধিবাসীরা ঘৃণ্য, কালো ও অসভ্য।'

হিউয়েন সাঙ জানালেন তবু তিনি সেখানে যেতে চান। তখন খানরাজা চিনা ভাষা ও অন্য বিদেশী ভাষা জানে এমন একজন দোভাষীর খোঁজ করলেন। যাকে মনোনীত রাজপ্রতিনিধি (মোতোতকুয়ান) নিযুক্ত করেছিলেন সেই যুবককেই এ কাজে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে পাওয়া গেল। কপিশা অবধি সঙ্গে যাবে সে। অতিথিকে উপহার দেওয়া হল লাল রেশম বস্ত্র ও পঞ্চাশ পেটি সিল্কবস্ত্র। আর কপিশার রাজার জন্য একখানি পত্র। ভারতের অগ্রবর্তী সীমান্ত প্রদেশ কপিশা – আধুনিক কালের কাফ্রিস্তান। বিদায়কালে খানরাজা ও তার সভাসদগণ দশ লি রাস্তা এগিয়ে বিদায় জানালেন মহামান্য অতিথিকে।

শুশে থেকে ৪০০ লি পশ্চিমে পরিব্রাজক দল পৌঁছল কপিশা রাজ্যের সহস্র ঝর্ণার দেশে। অবস্থান তাসকন্দ রাজ্যের উত্তরে যেখানে আধুনিক তার্দি নগর রয়েছে। স্থানীয় নাম চিয়েন-চুয়ান বা **পিং-ইয়ু**। তুর্কি ভাষায় বিং-ঘায়ুল বা বিং-ইউল। মঙ্গোল ভাষায় মিং-বুলাক। ২০০ লি বর্গাকার এলাকা। দক্ষিণে বরফঢাকা পাহাড় (সাঙলিং রেঞ্জ)। অন্যদিক সমতল। সহস্র ঝর্ণা আর দীঘি আছে। গ্রীষ্মকালে তুর্কি রাজা খানের অবকাশ যাপনের স্থান। রুশ মানচিত্র অনুসারে আলেকজাণ্ডার পর্বতের উত্তরে অবস্থিত এই স্থানটি রয়েছে পশ্চিম তুর্কিতে। আসলে নাকি কয়েক শত লি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি হ্রদ আছে এখানে। গাছগাছালি বৃক্ষলতায় ঘেরা। ফলে জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ।

সহস্র ঝর্ণা থেকে আরো ১৪০-১৫০ লি দূরে তা-লো-সু (**তারাস** বা তালাস) নগর। অন্য নাম আউলিয়াতা। তালাস বা তারাস নদীর তীরে অবস্থান। আট-নয় লি সীমা নগরের। তার্তার আর বণিকের বসবাস। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য মোটামুটি শু-শে নগরের মতো। তালোসু থেকে দশ লি দূরে প্রায় শ' তিনেক চিনাদের ছোট্ট জনপদ রয়েছে। তারা তুর্কিদের মতো বেশভূষা করলেও মাতৃভাষা আর চৈনিক জীবনযাপন ত্যাগ করেনি।

তালাস থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০০ লি দূরে পড়ল 'সাদা জলের নগর' নামে পরিচিত ইসফিদজাব (পাই-সুই-চেং)। আধুনিক কালের **সাইরাম**। আবার অক-সু (সাদা জল)

নামেও পরিচিত। ছয়-সাত লি নগরের সীমানা। জমি উর্বরা। জলবায়ু সুন্দর। ২০০ লি দূরে **কুইউ** বা কুং-ইউ নগর। কুইউ মানে কূপ বা ঝর্ণা। অন্য নাম চিয়েন-চেং যার অর্থ ঝর্ণা-শহর। নগরের সীমানা পাঁচ-ছয় লি। নিচু ও জলা জায়গায় ঘন জঙ্গল।

কুইউ থেকে দক্ষিণে গেলেন। ৫০ লি দূরে নু-চি-কান (**নেজকেন্দ**) নামের নতুন নগরে। রাজ্যের পরিধি ১০০০ লি। শতখানেক নগর আছে; প্রতি নগরের গভর্নর আলাদা আলাদা। তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। তবু সামগ্রিকভাবে রাজ্যের নাম নু-চি-কান। উর্বর জমি — ঘন গাছপালা, ফুলফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আঙুরও খুব হয়।

তারপর পশ্চিমে ২০০ লি এগিয়ে পৌঁছলেন চে-শিহ (চাজ) রাজ্যে। রাজ্যের সীমানা ১০০০ লি। প্রাচীন রাজধানী চে-চে (সেকেন্ট)। একে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাস বা শিহ মানে পাথর; আর তাসখন্দ মানে পাথুরে নগর। নামেই প্রকাশ তাসখন্দের ভৌগলিক পরিবেশ। **তাসখন্দ** রাজ্যের পশ্চিমে জাক্সারতেস নদী — অন্য নাম শিরদরিয়া। পামির পর্বতমালার উত্তরাংশ থেকে জাত নদীটি উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পতিত হয়েছে আরল সাগরে। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য নুচিকানের মতো। অনেকগুলি নগর আছে — প্রত্যেক নগরের নিজস্ব কর্তা। সমর-নায়ক বলে কিছু নেই। সকলেই তুর্কির অধীনে।

প্রাচীন তাসখন্দ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১০০০ লি দূরে ফেই-হান (**ফরগনা**) রাজ্য। রাজ্যের সীমা ৪০০০ লি। চারদিক পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। বাতাস প্রবল। শীতও খুব। উর্বর জমি। ফুলফল খুব হয়। ভেড়া ও অশ্ব মেলে। লোকজন দৃঢ়চেতা। বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যের রাজা নেই। সেকারণে স্থানীয় প্রধানদের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকে।

ফরগনা থেকে পশ্চিমে ১০০০ লি দূরে সু-তু-লি-সে-ন (**সুতৃষ্ণা**) রাজ্য। ১৪০০ লি পরিধি। পূর্বদিকে শে বা জাক্সারতেস নদী। প্রবাহিত উত্তর-পশ্চিম দিকে। বেগবান স্রোতধারা তবে ঘোলাটে জল। সুতৃষ্ণার রাজা তুর্কিদের অধীন। রাজ্যটি আধুনিক উরটুপ (উরটেপে) নামে শনাক্ত হয়েছে। (হিউয়েন সাঙ ফরগনা এবং উরটেপে সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তা সবটা ঠিক নয়। মনে হয় তিনি ওই দুটি দেশে যান নি। লোকমুখে শুনে বিবরণ লিখেছেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলা হলেও হিউয়েন সাঙ সম্ভবত তাসখন্দ থেকে সোজা সমরকন্দ গিয়েছিলেন।)

ভ্রমণ বিবরণ অনুসারে — সুতৃষ্ণা রাজ্য থেকে তাঁর গতিমুখ হল উত্তর-পশ্চিমে। আবার মরুপ্রান্তর পড়ল সামনে। জল নেই, ঘাস-গাছপালা কিছু নেই। শূন্য প্রান্তর। পাহাড় আর পড়ে-থাকা কঙ্কাল দেখে দেখে পথ চলা। এভাবে ৫০০ লির অধিক পথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন পারস্য সংস্কৃতির ধারক ঐতিহাসিক সা-মেই-কান বা **সমরকন্দ** রাজ্যে। সমরকন্দ বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্যতম নগর। বাজ্যের সীমানা ১৬০০-১৭০০ লি। রাজধানীর পরিধি ২০লি। শক্তিশালী রাজ্য ও অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র।

লোকবসতি অনেক। জমির উর্বরতা ভালো। প্রচুর গাছপালা ফুলপাতা আছে। উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায়। লোকজন চালাক-চতুর, পরিশ্রমী ও কারিগরি কর্মে কুশলী। সকল হু-রাজ্য এই রাজ্যটিকে একটি কেন্দ্রীয় স্থল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির আদর্শ বলে গণ্য করে। রাজা সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তি। শক্তিশালী সেনাদল আছে। সেনারা চেই-কিয়ে বা চাক বা টাক জাতের – ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ লোক – মৃত্যুকে মনে করে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে – এখানকার অধিবাসীরা অগ্নি উপাসক; বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। উদ্বেগের সঙ্গে হিউয়েন সাঙ দেখলেন – সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে অন্তত দুটি বৌদ্ধমন্দির যেখানে কোন বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বসবাস নেই। বহিরাগতরা এলে স্থানীয় লোকজনেরা বরঞ্চ তাদের তাড়িয়ে দেয়।

প্রথমে সমরকন্দের রাজা তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারই করেছিলেন। পরদিন তিনি রাজার কাছে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তার ফলে নাকি রাজার মন নরম হয়ে পড়েছিল। রাজা চৈনিক অতিথিকে সমরকন্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যে সফরসঙ্গী দুই শিক্ষানবিশী শ্রমণ পরিত্যক্ত বৌদ্ধমঠে উপাসনা করতে গেলে স্থানীয় লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং মঠে অগ্নিসংযোগ করে। রাজার কাছে তা নিয়ে নালিশ করা হল। তিনি দুষ্কৃতিদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। রাজা হিউয়েন সাঙকে ধর্মপ্রচারেও নাকি সাহায্য করেছিলেন। নগরে একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হল। বিদায়ের আগে হিউয়েন সাঙ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রচার ও মন্দির সংস্কারের ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে সমরকন্দ থেকে পরিব্রাজক গমন করলেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে **মি-মো-হা** বা মি-কুয়ো রাজ্য। কি-লিয়েন পর্বতের উত্তরে সাও-উ এলাকা থেকে আসা ইউয়ে-চি জাতির এক বংশের নাম হল মি। আশেপাশে সাও-উ বংশের নয় ভায়ের নয়টি রাজ্য ছড়িয়ে আছে। মিমোহা রাজ্যের অবস্থান পর্বতের উপরে। ৪০০-৫০০ লি সীমানায় ঘেরা ছোট রাজ্য। রাজধানী নামি নদীর তীরে। সামোকান রাজ্যের মতো উৎপন্নদ্রব্য ও লোকজনের চালচলন। মিমোহার উত্তরে কিয়ে-পু-তান-না (কাপুতানা)। চিনা ভাষায় পরিচিত সাও-কুয়ো নামে। (হিউয়েন সাঙ মিমোহা-কাপুতানা গিয়েছিলেন কি না প্রশ্ন আছে।)

ভ্রমণবৃত্তান্ত বলছে – কাপুতানার পশ্চিমে ৩০০ লি দূরে আরেক রাজ্য কু-সুয়াং-নি-কা (কুসান্নিকা)। চিনারা বলে হো-কুয়ো রাজ্য; সাও-উ জাতির মধ্যেকার হো-বংশীয়দের রাজ্য। কুসান্নিকা থেকে ২০০ লি দূরে হোহ-হান (কেরমিনাহ্) রাজ্য। চিনা ভাষায় রাজ্যের নাম তুঙ-আন-কুয়ো। তুঙ-আন মানে পূর্ব-আন – সাও-উ বংশীয় ভাইদের আন বলা হয়। হোহ-হান থেকে পশ্চিমে ৪০০ লি দূরে মধ্য-আনের পু-হোহ রাজ্য। একে আধুনিক বোখ বা বোখারা রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মধ্য-আন রাজ্যই

আনদের মধ্যে প্রধান রাজত্ব ছিল। বোখারার পশ্চিমে ৪০০ লি দূরে পশ্চিম-আন (সি-আন-কুয়ো) -এর রাজ্য ফা-তি । অন্য নাম সু-তি, উ-তি বা মু-তি। তার ৫০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে হুয়ো-লি-সি-মি-কা (খোরিসমিকা)। প্রাচীনকালে নাম ছিল খারেজম বা খোরাজম। সাও-উ জাতির এক যুবরাজ ছিল হুয়ো-সিন — তাদের রাজত্ব। অক্সাস বা বক্ষু নদীর তীরে অবস্থান — রাজ্যটি একদিকে ৫০০ লি তো অন্যদিকে ২০-৩০ লি দীর্ঘ।

জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে — সমরকন্দ থেকে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিমে ৩০০ লি দূরে **কোচানিয়া** (কসনিয়া) বর্তমানে উজবেকিস্তানের কোকন্দ। একেই উপরে কুসান্নিকা বলা হয়েছে। ২০০ লি দূরে পূর্ব-আন রাজ্যের **খরগন** (হো-হান বা আধুনিক কেরমিনাহ) এবং ৪০০ লি দূরে মধ্য-আন রাজ্যের **বোখারা** (পুহোহ) রাজ্য। প্রাচীন বোখারার অবস্থান ছিল বর্তমান বোখারার উত্তরে। আরো ১০০ লি এগিয়ে পশ্চিম-আনের **বেটিক** (পূর্বোক্ত ফাতি) রাজ্যে। এটি বক্ষু নদীর পশ্চিমে বর্তমান দরগনত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তারপর ৫০০ লি দূরে উজবেকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে **খোওয়ারিজম** (খারেজম) রাজ্যে। অবস্থান আমুদরিয়া (অক্সাস) নদীর তটভূমিতে। উজবেকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে কারা-কলপক এলাকায়। (সমরকন্দের পর যাত্রাপথে ছোট ছোট এই সকল রাজ্যের নাম, পথের দূরত্ব ও দিকচিহ্ন নিয়ে দুই সূত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে কিছুটা।)

খোওয়ারিজম থেকে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০০ লি চলার পরে উপনীত হয়েছেন কা-সুয়াং-না বা **কসন** রাজ্য। একে কাশা বা কেশিহ বা কেশ রাজ্যও বলে। চিনারা বলে শিহ-কুয়ো — শিহদের রাজ্য। বর্তমানে তাজিক রাজ্যের রাজধানী স্তালিনাবাদে অবস্থিত প্রাচীন কসন্ন। তখন ১৪০০-১৫০০ লি পরিধি ছিল রাজ্যের। প্রাকৃতিক সম্পদে, উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে ও লোকাচারে সমরকন্দের মতোই ছিল কসন্ন রাজ্যবাসীরা।

কসন্ন থেকে ২০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে আফগানিস্তানের বাদাকশান পর্বতমালা। সঙ্কীর্ণ গিরিপথে একজনের চলার মতো রাস্তা। এপথে জল নেই বা সবুজ ঘাস নেই। সেই পার্বত্য গিরিপথ দিয়ে প্রায় ৩০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করতে হল। সম্ভবত গুজর দুর্গ অবধি পৌঁছে গুজর নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে এসে তিনি পৌঁছলেন সুপরিচিত গিরিপথ আয়রন গেট তথা **লৌহদ্বাবে**। দ্বারের দুপাশে খাড়া পর্বতপ্রাচীর। অতি দুর্গম পথ। চারদিকে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ — প্রস্তররাশি লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ।

জীবনীকার বলেছেন —সেখানে লৌহ নির্মিত দরজায় অনেক লোহার ঘন্টা বাঁধা ছিল। সত্যি তেমনই ছিল কিনা কে জানে! লৌহদরজা বলতে কঠিন দুর্গম প্রবেশদ্বার বুঝিয়েছেন হয়তো। এর অন্য নাম বুজগোলা-খানা। তুরস্ক যাওয়ার অন্যতম পথ। সোগদিয়ানা ও তোখারিস্তান (ব্যাকট্রিয়ার তু-হো-লো) অঞ্চলের সীমানায় এই দ্বার। ডেরবেন্টের আট মাইল পশ্চিমে। এটাই হিউয়েন সাঙের ভ্রমণপথের পশ্চিমতম সীমা।

আয়রন গেট পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উত্তর আফগানিস্তানের তোখারিস্তানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে যে রাজ্য পড়ল তার নাম তু-হুয়ো-লো (**তুখারা** বা তোখারা বা তুষার)। এর পূর্বে সাঙ-লিঙ, পশ্চিমে পামির, দক্ষিণে হিন্দুকুশ এবং উত্তরে লৌহদ্বার। রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অক্সাস নদী। সাতাশটি ক্ষুদ্রকায় রাজ্যে বিভক্ত দেশ — সকলেই তুর্কী শাসনাধীন। জনগণ ভীরু প্রকৃতির। কথ্য ভাষাটি অদ্ভুত। পঁচিশটি বর্ণমালা আছে — বাম থেকে ডানদিকে লিখনরীতি।

বক্ষু (অক্সাস) নদীর অববাহিকায় ছোট ছোট অনেক রাজ্য রয়েছে। জীবনীগ্রন্থে সেসবের উল্লেখ নেই। ভ্রমণকাহিনীতে আছে।

বক্ষু নদীর নিচের দিকে উত্তর পাড়ে তামি (তেরমেদ বা তেরমেজ)। ৬০০ লি ও ৪০০ লি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। রাজধানী কুড়ি লি সীমানার। সহস্রাধিক বৌদ্ধ নিয়ে দশটির উপর বিহার আছে। স্তূপ ও বুদ্ধমূর্তিগুলি চমৎকার ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তামির পূর্বে চিহ্-গা-ইয়েন-ন (চঘানিয়ান বা শাহগানিয়ান) রাজ্য ৫০০ লি ও ৪০০ লি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থের। রাজধানী দশ লি সীমানার। অল্পসংখ্যক বৌদ্ধদের বাস। বিহার আছে পাঁচটি। তার উত্তরে হু-লু-মো (গরমা) রাজ্য। দৈর্ঘ্যে ৩০০ লি ও প্রস্থে ১০০ লি। হি-সু বংশীয় তুর্কি রাজার রাজধানী দশ লি সীমানার। শতখানেক বৌদ্ধের বাস। বিহার আছে দু'টি।

ঐ রাজ্যের পশ্চিমে সু-মন রাজ্য। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৪০০ লি ও ১০০ লি। হি-সু বংশীয় তুর্কি রাজার অধীন — রাজধানীর সীমানা ষোলো-সতেরো লি। সামান্য কিছু বৌদ্ধের বাস। বিহার আছে দু'টি।

সুমন রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে কু-হো-ইয়েন-ন (কুবাদিয়ান) রাজ্য। ৩০০ লি ও ২০০ লি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। রাজধানী দশ লি সীমানার। শতখানেক বৌদ্ধের বাস। বিহার আছে তিনটি।

এর পূর্বে হুয়ো-শা (ওয়াক্ষ) রাজ্য। আয়তন ৫০০ লি ও ৩০০ লি। রাজধানীর সীমানা ষোলো-সতেরো লি।

হুয়ো-শার পূর্বদিকে কো-তু-লো (খোতল বা খোতলান) রাজ্য। লম্বা-চওড়ায় ১০০০ লি করে। রাজধানী কুড়ি লি সীমানায় ঘেরা।

পূর্বদিকে সাঙলিং পর্বতমালার উপরে অবস্থিত কু-মি-তে (কুমিধ) রাজ্য। ২০০০ লি দীর্ঘ ও ২০০ লি প্রশস্ত। রাজধানী কুড়ি লি সীমান্তে ঘেরা। দক্ষিণ-পূর্বে বক্ষু নদী আর দক্ষিণে শিহ-কি-নি রাজ্য। বক্ষু নদীর দক্ষিণে যে সব রাজ্য পড়ছে তারা হল তামোসিতিয়েতি, পোতোচুয়াংনা, ইনপোকান, কুলাংনা, হিমোতল, পোলিহো, কিলিসিমো, কোলোহু, অলিনি ও মেঙকান।

হুয়ো বা কুন্দুজ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে কুয়োসিতো ও অনতলোফো রাজ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ফোকালাঙ নামে ক্ষুদ্র রাজ্য যার আয়তন ২০০ লি ও ৫০ লি। ঐ

রাজ্যের দক্ষিণে কিলুসিমিনকান রাজ্য – ১০০০ লি দীর্ঘ সীমানা বিশিষ্ট। তার দক্ষিণ-পশ্চিমে হুলিন (খুলম) রাজ্য – সীমান্ত ৮০০ লি দৈর্ঘ্যের। রাজধানীটি সামান্য পাঁচ-ছয় লি পরিধির। তবে দশটির বেশি বিহার আছে। বৌদ্ধদের সংখ্যা শ'পাঁচেক। হুলিন থেকে পশ্চিমে কুন্দুজ। জীবনীকার বলেছেন – তোখারা থেকে কয়েক শত লি পথ ভেঙে হিউয়েন সাঙ অতিক্রম করলেন বক্ষু তথা অক্সাস নদী। এসে পড়লেন হো তথা হুয়ো রাজ্যের **কুন্দুজ**।

সেহু খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুন্দুজ রাজ্যের শে তথা জেনারেল। নাম তার্দু (টাটু)। তার কাছে আগেই সংবাদ পৌঁছেছিল। ইনি আবার কাওচাঙ-রাজার শ্যালকও বটে। হিউয়েন সাঙ যখন কুন্দুজে এসে পৌঁছলেন, তখন কাওচাঙ-রাজকন্যা পরলোকগত। রেখে গিয়েছে এক নাবালক পুত্র। রাজাও অসুস্থ। অতিথিকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁকে দিনকয়েক বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানালেন। সুস্থ হয়ে উঠলে রাজা স্বয়ং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেবেন। ভারতীয় চিকিৎসক দ্বারা তার ক্রমশ আরোগ্যলাভ হচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে গভীর ষড়যন্ত্র ফাঁদ পাতা হয়েছিল। তার শিকার হলেন খোদ জেনারেল তার্দু। নবপরিণীতা খাতুন ও পূর্ববর্তী রানির এক পুত্র চক্রান্ত করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করল তাকে। কোথায় রাজা তার্দু তাঁকে ভারতযাত্রায় সাহায্য করবেন! তার বদলে রাজা তার্দুর অন্তিমযাত্রায় হিউয়েন সাঙকেই যোগ দিতে হল। এই সব দুর্বিপাকে পড়ে মাসখানেক সময় নষ্ট হয়ে গেল।

কুন্দুজে ধর্মসঙ্ঘ নামে এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী থাকতেন। ইনি ভারতভূমিতে শিক্ষালাভ করেছেন। এতদঞ্চলে মহাপণ্ডিত বলেই মান্য। সমগ্র কাশগড়-খোটানে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। আলাপ করে হিউয়েন সাঙ অনুভব করলেন মহাযান শাস্ত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। হীনযানের বিভাষা শাস্ত্র সম্পর্কেও জ্ঞানভাণ্ডার সীমিত। শাস্ত্র আলোচনায় ক্রমশ তা স্পষ্ট হল। শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত হলেও হিউয়েন সাঙ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে ঐ পণ্ডিতের দ্বিধা ছিল না।

যুবরাজ তার্দু তাঁকে বলখ এলাকার বৌদ্ধ তীর্থগুলি ঘুরে যেতে বলেছিলেন। বিশেষ করে নবসঙ্ঘারাম। কুন্দুজের নতুন শাসকেরও ইচ্ছা তাঁর জনজাতির বাস যে ফো-হো-লো এলাকায় সেখানকার বৌদ্ধ তীর্থস্থান চৈনিক অতিথি দর্শন করুন। বিশেষ করে বক্ষু নদীর দক্ষিণস্থিত উত্তর আফগানিস্তানের বহ্লিক বা বলখ এলাকাটি। এদের প্রায় রাজগৃহের সমকক্ষ মর্যাদার নগর বলা হয়। সেই সময় বহ্লিকবাসীরা রাজধানী এসেছিল জেনারেলের তার্দুর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করতে ও নতুন সামরিক কর্তাকে অভিনন্দন জানাতে। তারা যখন জানতে পারল যে চৈনিক পরিব্রাজকের বলখ ভ্রমণের বাসনা আছে, তখন তারা তাদের সঙ্গেই যাওয়ার অনুরোধ জানাল। ওদিককার পথঘাট ভালো। তবে যদি বলখ ঘুরে তিনি কুন্দুজ ফিরে আসতে চান, তবে অনেকটা ঘুরপথ পাড়ি দিতে হবে।

হিউয়েন সাঙ শুভেচ্ছার্থীদের পরামর্শমতো কুন্দুজ থেকে পশ্চিমে চলে গেলেন স্বদেশে প্রতিগমনকারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফো-হো-লো বা ফো-কো-লো (বলখ বা বহ্লিক) রাজ্য-নগরে। উত্তর-আফগানিস্তানে অবস্থিত এই রাজ্যটির আয়তন একদিকে ৮০০ লি তো অন্যদিকে ৪০০ লি। উত্তরে বক্ষু তথা অক্সাস নদী। রাজধানী-নগরটি কুড়ি লির অধিক সীমানা বিশিষ্ট। শক্তিশালী রাজ্য তবে জনবসতি কম। জমিজমা উর্বরা। জলেস্থলে অজস্র রকমের ফুল ফোটে – তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

একশ' মঠে হাজার তিনেক সন্ন্যাসী বাস করছে। প্রধানত হীনযানী বৌদ্ধ। একজন আচার্যের নাম গুরু প্রজ্ঞাকর। ইনি চেকা রাজ্য থেকে এসেছেন। পূর্বে বিবাস ও পশ্চিমে সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে চেকা – বর্তমানে পাকিস্তানের পশ্চিম-পাঞ্জাবের অন্তর্গত। গুরু প্রজ্ঞাকর হীনযানের ন'টি শাস্ত্র – সূত্র, ছন্দোবদ্ধ গেয়, ব্যাকারণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, বৈপুল্ল (বেদল্ল) ও অদ্ভুতধর্ম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানী। চার আগম শাস্ত্র – দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্তাগম ও একোত্তরিকাগম (একোত্তরাগম) সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। তিনি 'অভিধর্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র', 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'অভিধর্মপদ শাস্ত্র' জানেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। মাসাধিককাল তাঁর কাছ থেকে 'বিভাষা শাস্ত্র' শিক্ষালাভ করলেন। অমূল্য ঐ 'মহাবিভাষ শাস্ত্র' সংগ্রহও করেন। পরে তিনি এই গ্রন্থের চিনা অনুবাদ করেছিলেন। বিহারে দুজন বৌদ্ধ চিকিৎসক ছিল। তারা তাঁর কিছু চিকিৎসাপত্রও করেছিল।

বলখ নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে না-ফো (নব-সঙঘারাম)। অতি সুন্দর গঠন। নবসঙঘারামই বিশ্বে বৌদ্ধসংস্কৃতির পশ্চিমতম সীমানা। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে এটাই একমাত্র স্থান যেখানে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী মহামান্য আচার্যরাই একাদিক্রমে সঙঘ পরিচালনা করেছেন। সঙঘারামের সভাকক্ষ দুষ্প্রাপ্য রত্নপ্রস্তরে সুসজ্জিত। বুদ্ধমূর্তিটিও এক সুন্দর কারুকীর্তি ও মূল্যবান দ্রব্যাদিতে নির্মিত। এজন্যে অন্যদেশের রাজাদের দ্বারা প্রায়ই লুণ্ঠিত হয়েছে।

সঙঘারামের বৈশ্রবণের মূর্তি নানা অলৌকিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। কিছুকাল আগেই এক তুর্কি শেহু-র ওই বিহার আক্রমণের পরিকল্পনা বৈশ্রবণদেব বানচাল করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পরে ইন্দ্রদেব উত্তরদেশে ধর্মরক্ষার দায়ভার এই বৈশ্রবণদেবের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সঙঘারামের দক্ষিণ বুদ্ধসভাকক্ষে বুদ্ধ-ব্যবহৃত স্নানাধার (বাথটব) আছে। তার এমন উজ্জ্বল রঙ ও দ্যুতি যে বলা মুস্কিল তা শিলা না ধাতু নির্মিত। এক ইঞ্চি দীর্ঘ পূতদন্ত আছে – হলুদ-সাদা রঙের যা থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এছাড়া আছে তিন ফুট লম্বা কাশ-ঘাসের সম্মার্জনী। বুদ্ধ এই সম্মার্জনীটি ব্যবহার করেছেন। এই তিনটি অমূল্য সম্পদ সুরক্ষিত সেখানে। ছয় উৎসবের সময় তা জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়।

বিহারের দুই খ্যাতনামা শিক্ষক – ধর্মপ্রিয় ও ধর্মকার। তাঁরা চৈনিক অতিথিকে উদারমনা পণ্ডিত জ্ঞানে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মাণ জ্ঞাপন করেছিলেন। বিহারের উত্তরে দু'শ'. ফুট উঁচু স্তূপটি নানা মূল্যবান বস্তুসম্ভারে সাজানো। স্তূপের গায়ে হীরার মতো প্রভাময় সিমেন্টের পলেস্তারা। তার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে চিং-লু (বৌদ্ধ মন্দির) – উচ্চমার্গীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের প্রাচীন বাসভবন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধত্বলাভের জন্য সাধনার চতুর্থ স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়েছেন। অর্হত্বপ্রাপ্তদের নিমিত্ত শত শত স্তূপ আছে। সহস্র অর্হৎ আছেন যারা কোন অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি – তাদের জন্য কোন স্মরণস্তূপ নির্মিত হয়নি। বিহারে শ'খানেক বৌদ্ধ দিবারাত্র বিবিধ কর্মে নিয়োজিত। কে সাধারণ শ্রমণ আর কেই বা অর্হৎ, তা বোঝা দুষ্কর ছিল।

উত্তর-পশ্চিম দিকে নগর ছাড়িয়ে ৫০ লি দূরত্ব গিয়ে দেখলেন তি-ওয়েই বা ত্রপুস বা তাপাসু নগর। আরো ৪০ লি উত্তরে পো-লি (ভল্লিক বা ভাল্লুক) নগর। দুই জায়গায় ত্রিশ ফুট উঁচু স্তূপ আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পরে দুই বণিক ত্রপসু ও ভল্লিকের হাত থেকে তিনি রুটি ও মধু গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষুধানিবৃত্তির পরে তিনি তাঁদের উপদেশ (পঞ্চ নির্দেশ ও দশশীল) দান করেন। সেকারণে ঐ দুজনই হল প্রথম বৌদ্ধ গৃহী-উপাসক। তাঁরা বুদ্ধের কাছে পূজার জন্য কিছু প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁদের কেশ ও নখাংশ দান করেছিলেন। উপাসনার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি সঙঘাতি-উত্তরাসঙ্গ-শঙ্খচ্ছিকম ভাঁজ করে পরপর সাজিয়ে তার উপর ভিক্ষাপাত্র উপুড় করে দিলেন; তার উপর ভিক্ষাদণ্ড দাঁড় করিয়ে ঐ প্রকার আকৃতিতে স্তূপ নির্মাণ করতে বললেন। দেশে ফিরে তাঁরা সেইমতো স্তূপ নির্মাণ করেন। (ভিক্ষুদের বসনকে চাবর বলে। তার নিম্নবাস সঙঘাতি, উর্ধবাস উত্তরাসঙ্গ ও আড়াআড়ি বগলের নিচ দিয়ে নেওয়া হয় শঙ্খচ্ছিকম।) নগরের পশ্চিমে ৭০ লি দূরে বিশ ফুটের বেশি উঁচু আরেকটি স্তূপ দেখতে পাওয়া গেল। এটি কাশ্যপ বুদ্ধের সময় নির্মিত।

বলখ রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে (বর্তমান শিবিরগ্রামের দক্ষিণে) দুটি রাজ্য আছে। ইউয়ে-মেই-তে (**যুমধ**) ও তার দক্ষিণ-পশ্চিমে হু-শিহ-কান (**গুজগন**)। প্রথমটি ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও দ্বিতীয়টি বৃহৎ রাজ্য। হুশিহকানে উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায়। ঐ দুই রাজ্যের রাজারা চৈনিক অতিথিকে তাদের রাজ্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাবেন না বলা সত্ত্বেও তাঁরা বারবার একই অনুরোধ করে যেতে থাকেন। তারপর হিউয়েন সাঙ ঐ দুই রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তিনি প্রভূত সম্মান ও নানা উপঢৌকন লাভ করেছিলেন। তবে তিনি সেসব গ্রহণ করেন নি। হুশিহকান রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে তালাকান রাজ্য। আর পশ্চিমে পোলাসু তথা পারস্য রাজ্য।

বলখের শতাধিক লি দক্ষিণে কিয়ে-চিহ (**গচি** বা কা-চিহ) রাজ্য। ৫০০ লি দীর্ঘ ও ৩০০ লি প্রশস্ত। এর আরেক পরিচয় গজ উপত্যকা বলে। রাজধানী মাত্র পাঁচ-ছয় লি

সীমানার। পর্বতময় রাজ্য। ভীষণ ঠাণ্ডা। গম ও মটর-শিমের সঙ্গে অল্প ফুলফল জন্মে। লোকজনের আচার আচরণ কঠিন ও অশিষ্ট। দশটির উপর বিহার আছে। তিনশ'র মতো সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ বাস করে।

কাচিহ্-র দক্ষিণ-পশ্চিমে (দক্ষিণ-পূর্বে?) তুষারমৌলি হিন্দুকুশ পর্বতমালা। বিশাল পর্বতের গিরিচূড়াসকল উত্তুঙ্গ। দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ গিরিখাদ গভীর। শৃঙ্গ আর ছোট খাড়াই পাহাড় আরোহণ অত্যন্ত দুরূহ। বাতাস আর তুষারের প্রকোপ নিরবিচ্ছিন্ন লেগেই আছে। ভরা গ্রীষ্মেও প্রবল শীত। রাশি রাশি বরফের স্তূপ সমস্ত উপত্যকা ভরিয়ে রেখেছে। পাহাড়ের পথ খুঁজে খুঁজে চলা ভারী শক্ত। পর্বতের দেবতাগণ আর শয়তানী উপদেবীর দল যেন ক্রোধভরে দানবীয় ভূত-অপচ্ছায়া ইত্যাদি পাঠিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে আছে পেশাদার খুনী ডাকাতের দল। খুনজখমে তাদের হাত কাঁপে না। পথঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘন মেঘ আর ভাসমান মেঘপুঞ্জের আনাগোনার বিরাম নেই মুহূর্তের জন্য। পুরু বরফের আস্তরণ নজর করে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হতে হয়।

হিউয়েন সাঙও খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে ৬০০ লি পথ অতিক্রম করে তুখারা রাজ্য ছাড়িয়ে উপনীত হলেন ফান-ইয়েন-না (**বামিয়ান**) রাজ্যে। গুরু প্রজ্ঞাকর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বামিয়ান হিন্দুকুশ পর্বতমালার ঠিক মধ্যে অবস্থিত বলে পর্বত-গিরিসঙ্কটের সুযোগ নিয়ে অধিবাসীরা রাজ্যের সব নগরগুলি স্থাপন করেছে দুর্গম জায়গায়। রাজ্যটি পূর্ব-পশ্চিমে ২০০০ লি দীর্ঘ আর উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ লি। রাজধানী উঁচু খাড়াই চড়াইর উপর স্থাপিত – সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের ওপারে; পিছনে উত্তরের দিকে খাড়াই পাহাড়; দৈর্ঘ্যে ছয়-সাত লি। প্রবল ঠাণ্ডা। উৎপন্ন হয় গম আর সামান্য কিছু ফল-ফুল। তবে ভেড়া-ঘোড়ার মতো তৃণভোজী পশুদের জন্য উত্তম চারণভূমি আছে। অধিবাসীদের চালচলন রুক্ষ্ম কঠিন প্রকৃতির। তবে সততায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় অনন্যসাধারণ। পোষাক জমাটবাঁধা ও মোটা পশম দিয়ে তৈরী। লেখ্যভাষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি ও মুদ্রাব্যবস্থা তোখারার মতো। শুধু কথ্যভাষা পৃথক। লোকজন বৌদ্ধধর্মের তিন পূজনীয় প্রতিষ্ঠানকে তো শ্রদ্ধা করেই। সেই সঙ্গে অন্য দেবতাদেরও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বণিকেরাও, ভালো করুক কিংবা মন্দ, সকল দেবতাকে তুষ্ট করে চলে ও যথারীতি শ্রদ্ধা জানায়। বর্তমানে প্রাচীন জনপদটির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে ঘুলঘুলা নামক স্থানে।

বামিয়ানের রাজা প্রাসাদ ছেড়ে এসে পরিব্রাজক অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। কয়েক দিন ধরে তাঁর চিত্ত বিনোদনের নানা ব্যবস্থা হল। রাজ্যে বিশ-ত্রিশটি সঙঘারাম আছে। সবই থেরবাদী মঠ। কয়েক সহস্র শ্রমণ বাস করে। তখন রাজধানীতে ছিল মহাসাঙঘিক সম্প্রদায়ের দুই সন্ন্যাসী, আর্যদাস ও আর্যসেন। তাঁরা

ধর্মলক্ষ্মণ সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুদূর চিনে হিউয়েন সাঙের মতো পণ্ডিত সন্ন্যাসী আছেন জেনে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। দুজনে তাঁর সঙ্গে তীর্থস্থান পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজধানী নগরের উত্তর-পূর্বে পাহাড় কেটে খোদাই করে নির্মিত হয়েছে দেড়শ' ফুট উঁচু বিশাল বুদ্ধমূর্তি। উজ্জ্বল স্বর্ণালি রঙ। নানা মূল্যবান রত্নাদিতে সুশোভিত। এই সেই বিখ্যাত বামিয়ান বৌদ্ধমূর্তি অতি সম্প্রতি যা ধ্বংস করে আফগানিস্তান সংবাদের শিরোনামে। বামিয়ান মূর্তির পূর্বদিকে পূর্বতন রাজার দ্বারা নির্মিত বিহার। বিহারের পূর্বদিকে একশ' ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ নির্মিত বিশাল শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে।

আশ্চর্যের কথা হল ঐ বিহারে নির্বাণলাভ করছেন এমন ভঙ্গীতে শায়িত এক বুদ্ধমূর্তি আছে – এক হাজার ফুট দীর্ঘ। (হাজার ফুট দীর্ঘ মূর্তি কোন বিহারের চার দেয়ালের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এমন ভাবনা বাস্তবানুগ নয়। পণ্ডিতগণের অভিমত – আসলে এটি কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড যার সঙ্গে কষ্টকর সাদৃশ্য খুঁজে বার করা হয়েছে।)

এখানে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বিশাল দানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। রাজা রাজকোষের সমস্ত সঞ্চয় অকাতরে দান করে। পরে রাজকর্মচারীরা তা পুনঃক্রয় করে রাজাকে ফিরিয়ে দেয়। ঐ বিহারে অর্হৎ সানকবাসের গাঢ় লাল রঙের 'নয়টি-ডোরা-কাটা সঙঘাতি' নামক অধোবাস আছে। (সানকবাস পূর্বজীবনে রাজগৃহের বণিক আর উত্তর জীবনে আনন্দের শিষ্য ছিলেন। মথুরার বিহারে বাস করতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য উপগুপ্ত। বুদ্ধের নির্বাণের একশ' বছর পরে তাঁর আগমন হয়। জন্মজন্মান্তরে ইনি নাকি একই বেশে বিরাজ করেন। এ কাহিনী দিব্যাদান গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।)

জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে অন্যরকম কথা। বামিয়ান থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী পথে প্রায় ২০০ লি অতিক্রম করে আবার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকায় উপনীত হয়েছিলেন। সেখানকার একটি বিহারে বুদ্ধের পূতদন্ত রক্ষিত আছে। তাছাড়া কল্পকালের পূর্বেকার একজন প্রত্যেক-বুদ্ধের একটি পূতদন্ত আছে যেগুলি পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ আর চার ইঞ্চির কম প্রস্থবিশিষ্ট। আছে সুবর্ণ-চক্র রাজার পূতদন্ত। পূর্বজীবনে রাজগৃহের বণিকপুত্র ছিলেন যিনি সেই সাণকবাসের লৌহ-ভোজনপাত্র ও রক্তিম সঙঘাতি চীবরও ঐ বিহারে সুরক্ষিত। ইনি অতীত পাঁচশত জন্মে ঐ একই বসন পরে ছিলেন। কথিত আছে বসনপরিহিত অবস্থায়ই তাঁর জন্ম হয়েছিল।

ঐ গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে তিনি বামিয়ান থেকে পূর্বদিকে কপিশা রাজ্যে গমন করেছেন। তবে তো তাঁকে পূর্বোক্ত বিহার দর্শন করে আবার ২০০ লি পথ অতিক্রম করে বামিয়ান ফিরতে হয়েছিল। সত্যি হয়েছিল কি না তার নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।

৫। বামিয়ান থেকে কাশ্মীর

কপিশা - লম্পক - নগরহার - হিড্ডা - গান্ধার - পেশোয়ার - উদয়ন - তক্ষশীলা - সিংহপুর - উরস - কাশ্মীর

জীবনীগ্রন্থ অনুসারে – হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করতে হিঁউয়েন সাঙের পনেরো দিন সময় লেগেছিল। পথে তুষারঝড়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। পথ হারিয়ে দুটো দিন নষ্ট হয়। 'ক্ষুদ্র বালুকা শিখর'এর কাছে একদল শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তারাই পথ দেখিয়ে উদ্ধার করে। তারপর এক কৃষ্ণ পর্বত (ব্ল্যাক মাউন্টেন, সম্ভবত পঘমান পর্বত) অতিক্রম করে শিবার গিরিপথ ধরে এসে পৌঁছলেন কা-পি-শিহ্ বা **কপিশা** বা কপিশ (বর্তমান কাফিরিস্তান) রাজ্যের রাজধানীতে। এ ঘটনা সম্ভবত ৬৩০ সালের শেষের দিকে। কপিশা নগরের অবস্থান বর্তমান কাবুল থেকে ষাট কিলোমিটার উত্তরে।

হিঁউয়েন সাঙ বলেছেন, কপিশা রাজ্যটি ৪০০০ লির অধিক দীর্ঘ সীমান্ত বিশিষ্ট। উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা। অন্যদিকে কৃষ্ণ পর্বত। রাজধানীর পরিসীমা দশ লির অধিক। উৎপন্ন হয় নানা শষ্য, ফল, জাফরান ও কাঠ। উৎকৃষ্ট অশ্বও মেলে। অন্যদেশ থেকে বিবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আসে। ঠাণ্ডার সঙ্গে আছে ঝোড়ো বাতাস। অধিবাসীরা রুক্ষ্ম ও প্রচণ্ড মেজাজের। কর্কশ অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলে। বিবাহপদ্ধতি বিচিত্র রকমের। লেখ্য ভাষা তোখারার মতো। অন্তর্বাস হিসেবে উলের বস্ত্র ও বহির্বাসে চামড়া ও পশমের পোষাক ব্যবহার করে।

কপিশার রাজা বুদ্ধিমান শক্তিশালী ও সাহসী ক্ষত্রিয়। তার প্রভাব প্রসারিত পার্শ্ববর্তী দশটি রাজ্যের উপর। রাজা প্রতি বৎসর আঠারো ফুট উঁচু রূপোর বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে থাকেন আর মোক্ষ-পরিষদে দরিদ্র, বিধবা ও বিপত্নীকদের অকাতরে দানধ্যান করেন। চৈনিক অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে রাজা অমাত্যসহ নগরপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে শতাধিক বিহারে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার সন্ন্যাসী। অধিকাংশ মহাযানী বৌদ্ধ। এই সেই প্রাচীন গান্ধার দেশ যেখানে একদা কণিষ্ক রাজত্ব করেছেন। দশটির বেশি দেবমন্দির আছে – নানা সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক ভক্ত আছে যার মধ্যে দিগম্বর, পাশুপত্য আর 'মুকুটে করোটি' সাজিয়ে বেশকিছু সাধুসন্ত ও ভক্ত রয়েছে।

রাজধানীতে হীনযানীদের 'শলাকা' নামে এক বিহার আছে। বিহারবাসীরা বলে যে ঐ মঠ নির্মিত হয়েছে যেবার চিনের যুবরাজ জামিনদশায় কপিশা এসেছিলেন। সম্ভবত বিহারটি কোন চিনা যুবরাজ দ্বারা নির্মিত। চিনা যুবরাজের কাপিশায় বন্দীদশা – এমন ঘটনা সম্ভবত রাজা কণিষ্কের সময় ঘটেছিল। যেহেতু নবাগত অতিথিও চিন থেকে এসেছেন, সুতরাং শলাকা বিহারবাসীদের ইচ্ছা তিনি তাদের মঠেই বাস করবেন। এদিকে

আচার্য প্রজ্ঞাকর হীনযানী বলে মহাযানী মঠে বাস করতে অনাগ্রহী। যাই হোক হিউয়েন সাঙ শলাকা মঠেই আশ্রয় নিলেন। বর্ষাবাস কাপিশার শলাকা বিহারেই অতিবাহিত করলেন।

ঐ বিহার নির্মাণের সময় পূর্বোক্ত চৈনিক যুবরাজ বুদ্ধ-সভাকক্ষের পূর্বদ্বারের দক্ষিণে মূর্তির পাদদেশে প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে বিহারের সংস্কারাদির জন্য ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাওয়া। একবার এক দুষ্ট রাজা ঐ সম্পদ আত্মসাৎ করার মতলবে ভূমি খনন করেছিল। অপকর্মটি করতে গিয়ে মহা দুর্বিপাক ঘটল। প্রবল ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। দেবমূর্তির উপরকার শুকপাখিটি পর্যন্ত পাখা ঝাঁপটে তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল। রাজা ও তার সেনাদল ভয়ে চৈতন্য হারাল। তদবধি ঐ সম্পদ উদ্ধারে আর কেউ সাহস করেনি। বিহারবাসীরা হিউয়েন সাঙকে বিহার সংস্কারের জন্য ঐ গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করে দিতে অনুরোধ জানাল। বিহার সংস্কার অবশ্যই সৎকর্ম। হিউয়েন সাঙ মন্দিরে বিগ্রহের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানালেন। দেবতার কৃপা ভিক্ষা করলেন। তারপর সাত-আট ফুট গভীর গর্ত খনন করে প্রচুর স্বর্ণ ও মুক্তা উদ্ধার করে দিলেন। চারদিকে ধন্য ধন্য রব ওঠল। অন্য বিবরণীতে বলা হয়েছে – ঐ বিহারের উত্তরে এক পর্বতগুহায় গুপ্তসম্পদ ছিল। এক যক্ষ ছিল তার রক্ষক। গুহা থেকে দু'-তিন লি পশ্চিমে কুয়ান-জু-সাই-পুষার (অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব) মূর্তি আছে। কথিত আছে, মূর্তি থেকে স্বয়ং পুষা নির্গত হয়ে প্রকৃত ভক্তকে প্রবোধদান করেন।

রাজধানীর ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে আছে জননেতা রাহুল দ্বারা নির্মিত রাহুল-বিহার। আর চল্লিশ লি দক্ষিণে সি-পি-তো-ফা-লা-জু নামক স্থান। যখন জগতের সর্বত্র ভূকম্প হয় ও প্রবল ধ্বস নেমে আসে, তখনও সেই পবিত্র স্থানটি শান্ত অবিচলিত থাকে।

রাজধানী থেকে ত্রিশ লি দূরে আ-লু-নো পর্বত। প্রতি বৎসর ওই পর্বত নাকি মাথায় একটু একটু করে উঁচু হয়, তারপর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এর কারণ একদা ওই পর্বত শু-না নামক দেবতাকে আশ্রয় দেয়নি। (এই শুনা দেবতা কি শূন্য দেবতা?)

দুশ' লি দূরে হিন্দুকুশ পর্বতের উপরে লেক আছে। তাকে ঘিরে এক নাগরাজার কাহিনী আছে। সম্রাট কণিষ্ক সেখানে বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছেন। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে 'পুরাতন রাজার বিহারে' শাক্য পুষার দুধ-দাঁত রক্ষিত আছে। সংলগ্ন আরেকটি বিহারে আছে জু-লাইর উষ্ণীষ – এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া হলুদ-সাদা রঙের নিদর্শন। তার দক্ষিণ-পশ্চিমে 'পুরাতন রানির বিহারে' আছে একশ' ফুট উঁচু তামার স্তূপে বুদ্ধ-নিদর্শন।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে পি-লো-শো-লো পর্বত। দেখতে হাতির মতো তাই ওই নাম। ভগবান বুদ্ধ বারোশ' অর্হৎ নিয়ে ঐ পর্বতে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে অশোক নির্মিত শত ফুট উঁচু পিলোশোলো স্তূপ আছে। তার উত্তরের নাগ-ঝর্ণায় বুদ্ধ ও

বারো শ' অর্হৎ দন্তমার্জনা ও মুখপ্রক্ষালন করেছিলেন। পরে এখানে পিশুক বিহার নির্মিত হয়।

কপিশার রাজা মহাযানপন্থী। ললিতকলায় আগ্রহ কম, তবে ধর্মপ্রচারে উৎসাহী। একদিন মহাযানী বিহারে তিনি ধর্মসভার আয়োজন করলেন। আহুত হল মহাযান সম্প্রদায়ের মনোজ্ঞঘোষ, সর্বাস্তিবাদী আর্যবর্মন এবং মহিশাসক সম্প্রদায়ের গুণভদ্র। হিউয়েন সাঙ ও প্রজ্ঞাকর তো ছিলেনই। পাঁচদিন ধরে আলোচনা চলল। প্রতর্কে অংশ নিয়ে হিউয়েন সাঙ উপস্থিত শ্রোতাদের বোঝাতে পারলেন মহাযান ও হীনযান উভয় শাখার শাস্ত্রগ্রন্থের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত।

তারপর তুখারার রাজার আমন্ত্রণে আচার্য প্রজ্ঞাকরকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল। বলখ থেকে যাত্রা করে তাঁরা বেশ কয়েকটা দিন একত্রে ছিলেন। তীর্থভ্রমণ করছেন। নানা শাস্ত্র আলোচনা করেছেন: হিউয়েন সাঙ ব্যথিত চিত্তে তাঁকে বিদায় জানালেন। কপিশা-গান্ধারে এসেই হিউয়েন সাঙ প্রথম দেখেছিলেন হিন্দু ও জৈন ধর্মের মানুষ। কপিশা থেকে পরিব্রাজক আবার পথে নামলেন।

পুরাকালে চিনের কাছে ভারতবর্ষ টিয়েন-চু নামে পরিচিত, যদিও প্রাচীন নাম শিন-টু বা হিয়েন-তু বা শিয়েন-তাও। তবে সাধারণভাবে ভারত মানে ইন-তু। 'সি-ইউ-কি'র ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু হয়েছে কপিশার পর থেকে। লম্পক পৌঁছে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছেন। শুরুতে তিনি ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে সাধারণ একটি বিবরণ দিয়েছেন। তারপর গিয়েছেন ভ্রমণকথায়।

পঞ্জশির নদীর উপত্যকা ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে চললেন ৬০০ লি। শিয়াকোহ নামের কৃষ্ণপর্বত অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন লান-পো বা **লম্পক** (বর্তমানের লমঘন। অবস্থান কাবুল নদীর উৎসের কাছে। উত্তরে বরফাবৃত পর্বত, অন্য তিনদিকে কৃষ্ণকায় পর্বতমালা। রাজ্যটি ১০০০ লি সীমানার। রাজধানী দশ লির বেশি পরিধির। কপিশার শাসনাধীন। ধান ও ইক্ষু জন্মে। ফলাদি কম হয়। অধিবাসীরা সঙ্গীতপ্রেমী তবে ভীরু কপট কুদর্শন ও কদাচারী। দশটি বিহার আছে। বৌদ্ধরা সংখ্যায় কম। যারা আছে সকলেই প্রায় মহাযানী। কয়েক কুড়ি দেবমন্দির আছে – ভক্তসংখ্যা সে তুলনায় অনেক।

হিউয়েন সাঙ তিনদিন লম্পকে বাস করেছিলেন। তারপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। কাবুল নদীর উপত্যকা ধরে এগোনো আর অত কষ্টকর নয়। পথে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্তূপ পড়ল। কথিত আছে বুদ্ধদেব একদা দক্ষিণদেশ থেকে এখানে এসে ঐ পাহাড়ে থেমেছিলেন। সেজন্য ঐ স্থানে স্তূপটি নির্মিত। এখান থেকে উত্তরদিকের সমস্ত জায়গাই ম্লেচ্ছভূমি নামে কথিত। পাহাড় থেকে নেমে কুড়ি লির মতো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কুনার নদী পার হলেন।

পৌঁছলেন ন-ক-লো-হো (**নগরহার** বা নাগরহর) রাজ্যে। বর্তমান অবস্থান জালালাবাদ জেলায়। ৬৩০ খৃষ্টাব্দ তখনো শেষ হয়নি। রাজ্যটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬০০ লি ও ২৪০-২৫০ লি। চারদিক ঘিরে উঁচু পর্বত। রাজধানীর সীমান্ত কুড়ি লি থেকে বেশি। রাজা নেই, শাসনকার্য পরিচালনা করে কপিশার রাজা। শষ্য ও ফলাদি প্রচুর জন্মে। আবহাওয়া মাঝারি। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র, সাহসী, ধনসম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করে ও বিদ্যাশিক্ষাকে মর্যাদা দেয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধ ভিক্ষু মুষ্টিমেয়, যদিও রাজ্যে অনেক স্তূপ ও বিহার আছে। দেবমন্দির আছে পাঁচটি।

রাজধানীর পূর্বে (অথবা দক্ষিণ-পূর্বে) দুই লি দূরত্বে অবস্থিত অশোক শিলাস্তূপটি তিনশ' ফুটের অধিক উচ্চতার। চমৎকার স্থাপত্য। কাছেই একটি বিহার ও ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই পুণ্য স্থানে দ্বিতীয় কল্পে শাক্য বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দীপঙ্কর বুদ্ধের সাক্ষাত হয়। শাক্য বোধিসত্ত্ব কর্দমাক্ত ভূমির উপর তাঁর অজিন দেহাবরণ এবং কেশদাম বিছিয়ে দিয়েছিলেন দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণচিহ্ন রক্ষা করেছিলেন। এবং সাক্ষাতে দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিলেন যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। ঐ বিনাশ-কল্প শেষ হলেও এই স্থানের মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়নি। এখানে প্রদত্ত পূজার উপর মাঝে মাঝে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ঐ স্তূপ দর্শন করে প্রদক্ষিণ করলেন ও পূজা করলেন। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে স্তূপ-মাহাত্ম্য জ্ঞাত হলেন – কল্পলোকের পরে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল অথচ এই পুণ্যভূমি বিলুপ্ত হয়নি; যেমন সুমেরু পর্বত বিনষ্ট হলেও পরে আবার জাগ্রত হয়েছিল, তেমনি এই পুণ্যভূমিও পরে পুনরাবির্ভূত হয়েছিল।

রাজধানীতে আরো অনেক স্তূপ রয়েছে। একটি বিশাল স্তূপের ভিত্তিমূল রয়েছে যেখানে একসময় বুদ্ধের দন্তাবশেষ রক্ষিত ছিল। কাছেই আরেকটি স্তূপ রয়েছে যা মহাকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে দশ লি দূরত্বে একটি স্তূপ আছে যেখানে একদা বুদ্ধদেব মধ্যদেশ থেকে আকাশপথে এসে অবতরণ করেছিলেন। কাছেই আরেকটি স্তূপ আছে যেখানে দীপঙ্কর বুদ্ধের পূজার জন্য শাক্য বোধিসত্ত্ব পাঁচটি পদ্মফুল কিনেছিলেন। (জীবনকথায় এক দীপঙ্কর নগরের কথা বলা হয়েছে। ভ্রমণকথায় নয়। ঠিক কাকে দীপঙ্কর নগর বলা হয়েছে তা অস্পষ্ট।)

ভ্রমণ বিবরণীতে বলা হয়েছে – দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি লি দূরের পাহাড়ে একটি প্রস্তর নির্মিত বিহার আছে। তার সভাঘরটি বিশাল আর প্রতি তলায় অনেকগুলি করে কক্ষ আছে। শান্ত জনহীন বিহারের নিচের ভূমিতে অশোক স্তূপ আছে। দু'শ' ফুট উঁচু।

দীপঙ্কর নগর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে দশ (ভ্রমণবৃত্তান্ত মতে ত্রিশ) লি দূরে বালির পর্বত আছে। হিউয়েন সাঙ সেখানে হি-লা নগরে পৌঁছলেন। স্থানটি সম্ভবত আধুনিক কালের **হিড্ডা**। অবস্থান জালালাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে। নগরের পরিধি চার-পাঁচ লি মাত্র। অনেকটা উঁচুতে নগর। চমৎকার উদ্যান ও সরোবর আছে।

এখানে এক বহুতল ভবনের দ্বিতলে সপ্তরত্নে সজ্জিত স্তূপ আছে। আছে মূল্যবান আধারে ভগবান বুদ্ধের পুণ্য করোটি-অস্থি (উষ্ণীষ-অস্থি)। অস্থিটি বারো-চৌদ্দ ইঞ্চি পরিধির। হলদে সাদা রঙের করোটি-গাত্রে কেশগহ্বরের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান ছিল। যদি কেউ শুভাশুভ ফল জানতে চায়, তবে ধুনার গুড়ো সিক্তবস্ত্রে মাখিয়ে ঐ করোটিতে জড়ানো হয়। এর ফলে ঐ বস্ত্রখণ্ডে যে করোটি-চিহ্ন আঁকা হয়ে যায়, তা থেকে অনাগত কর্মের শুভ-অশুভ লক্ষ্মণ জানা যায়। করোটি দর্শন করতে এক স্বর্ণমুদ্রা ও শুভাশুভ ফল জানতে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা লাগে। হিউয়েন সাঙ শুভাশুভ ফল জানতে চাইলেন। তাঁর বেলায় করোটি-অস্থি থেকে বোধিবৃক্ষের ছাপ পাওয়া গেল। মন্দির ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা – চিহ্নটি অতি শুভ, অতিথির ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং অবশ্যই তিনি বোধিলাভ করবেন।

আরেক স্তূপেও কমলাকৃতি করোটি-অস্থি রক্ষিত। তা ছাড়া সেখানে আপেলের মতো বৃহদাকার বুদ্ধনয়ন আছে – অন্ধকারে ঐ নয়ন থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ হয়। আছে বুদ্ধের সঙঘাতী চীবর এবং শ্বেত লোহার বলয়-বাঁধা চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত হাতলসহ ধর্মযষ্ঠি। হিউয়েন সাঙ ঐ পবিত্র বস্তুসকলের পূজা করলেন। স্বর্ণমুদ্রা, রজতমুদ্রা, পতাকা, রেশমবস্ত্র, ধর্মীয় পোষাক এবং পুষ্পরাজি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

জীবনীগ্রন্থ অনুসারে, দীপঙ্কর নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি লি দূরে নাগরাজ গোপালের অত্যাশ্চর্য একটি ছায়াগুহা পড়ে। ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় আরো খানিকটা দূরে। পথে এক সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পড়ে। কোন স্রোতধারার (জলপ্রপাত) দু দিকে আছে খাড়া পাথর। পূবদিকের এক গুহাভ্যন্তরে ভগবান বুদ্ধ গোপাল নামক নাগরাজকে পরাস্ত করেন এবং গুহার ভিতরে নিজের ছায়া রেখে যান। সেই পবিত্র ছায়া দর্শন করতে আগ্রহী হলেন তিনি। কিন্তু জায়গাটি ডাকাতদলের আড্ডা বলে কপিশা থেকে আসা পথ-প্রদর্শক ও অন্যান্যরা সেখানে যেতে অসম্মত হল। তারা দেশে ফিরে যেতে চায়। পরিব্রাজক এতদূর থেকে এসেছেন, এমন পবিত্র স্থান না দেখে চলে যেতে পারেন না। সেখানে যে স্বয়ং বুদ্ধের ছায়া সুরক্ষিত আছে! সঙ্গীদের বললেন – 'আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, আমি ছায়াগুহা দর্শন করে ফিরে যাচ্ছি।'

তারপর গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। পথে এক মঠে খোঁজ নিয়ে জেনে নিলেন ছায়া-গুহার সঠিক অবস্থান। গ্রামবাসীরা কেউ তাঁর পথপ্রদর্শক হতে রাজি নয়। অবশেষে একটি বালক নিকটবর্তী গ্রাম অবধি তাঁকে পৌঁছে দিতে এগিয়ে এল। সেই রাতটা তিনি গ্রামে কাটালেন। পরদিন গ্রামের এক বৃদ্ধ তাঁকে গুহায় নিয়ে যেতে সম্মত হল। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পাঁচ ডাকাতের সঙ্গে। ছুরি হাতে তারা সামনে উপস্থিত। চৈনিক পরিব্রাজক টুপি খুলে তাদের অভিবাদন জানালেন। পরিধানের ধর্মীয় পোষাক দেখালেন। তারপর জানালেন যে তাঁরা বুদ্ধের ছায়া পূজা করতে চলেছে। ডাকাতরা জিজ্ঞাসা করল – 'পথে ডাকাত আছে সেকথা কি শোনেন নি আপনি?'

'– শুনেছি। ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতি নিবেদন করতে যাত্রা করেছি। পথে হিংস্র জন্তু থাকলেও যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হবো না। আর ডাকাতরাও তো মানুষ।'

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হল ডাকাতের দল। তারাও একসঙ্গে ঐ আশ্চর্য ছায়া-গুহা দর্শনে গেল। সেখানে পৌঁছে দেখলেন – এক উপত্যকার পূর্বদিকে অবস্থিত অন্ধকার গুহার দ্বার। প্রবেশমুখ পাহাড়ের পশ্চিমে। বৃদ্ধ ব্যক্তি জানাল – পঞ্চাশ পা সোজা এগোলে পূর্বদিকে পাথুরে দেয়াল পড়বে। তারপর পূর্বদিকে তাকালে ঐ পবিত্র ছায়ার দর্শন লাভ হবে।

কথামতো হিউয়েন সাঙ এগিয়ে গেলেন। না কোন ছায়ার দর্শন পেলেন না। শতবার ভূমিশয়নে প্রণাম জানালেন। কোন ফল হল না। এ তাঁর পাপকর্মের ফল বলে নিজেকে ধিক্কার জানালেন। তারপর নতুন উদ্যমে 'শ্রীমালা-দেবী-সিংহনাদ শাস্ত্র' থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আরো শতাধিক বার শয়ন-প্রণাম জানালেন। এবার পূবদিকের প্রাচীরে সামান্য আলো দেখা গেল। পরক্ষণেই নিভে গেল। হিউয়েন সাঙ দু'শ' বার শয়ন-প্রণাম জানালেন। এবার গুহাভ্যন্তর উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল। ক্রমে পাথুরে দেয়ালে তথাগতের ছায়া ফুটে উঠল। কুয়াশার আবরণ থেকে যেমন করে তুষারশৃঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে তেমন করে দেখা গেল ছায়াঘন অবয়ব। হিউয়েন সাঙের হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভগবানের দেহবর্ণ রক্তিম-পীত। তাঁর চীবরও অনুরূপ বর্ণের। কমলাসনের উপরভাগে তিনি সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছেন। নিচের দিকটা খানিক অস্পষ্ট। পশ্চাদপটে বোধিসত্ত্ব ও অর্হতদের ছায়াও দৃশ্যমান। তাঁরা ভক্তিভরে পূজা করলেন, পুষ্পরাজি ও সুগন্ধি ধূপ নিবেদন করলেন। ভগবানের ছায়া দর্শন করে ডাকাতদলটিও অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা অস্ত্রত্যাগ করে ধর্মদেশনা গ্রহণ করল। তারপর সকলে ফিরে গেল নিজ নিজ দেশে। গুরু হিউয়েন সাঙও দ্রুতপায়ে অগ্রসরমান সাথীদলের সঙ্গে যোগ দিলেন।

৫০০ লির বেশি পথপরিক্রমা করে পার্বত্য পথ ডিঙিয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে এসে পৌঁছলেন কন-তো-লো বা গান্ধার রাজ্যে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা পরের মাসের গোড়ায়। একটি বছর ফুরিয়ে গেল পথে পথে। ইন-টু দেশে সবে তিনি পা রেখেছেন। বোধিবৃক্ষ এখনো কতদূরে? নালন্দা?

বিশাল গান্ধার রাজ্যের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০ লি, উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ লি। পূর্বদিকে প্রবাহিত সিন্ধু নদ। রাজ্যের রাজধানী পু-লু-শ-পু-লো বা পুরুষপুর তথা পেশোয়ার। পরিধি ৪০ লি। কপিশরাজার অধীনস্থ দেশ। অথচ নগর-গ্রাম জনমানবশূন্য – বাসিন্দার সংখ্যা নগণ্য। রাজধানী নগরের এক প্রান্তে এক হাজার পরিবার বাস করছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দ-প্রবর্তক কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর। সুফলা দেশ। শষ্য ফুল ফল ইক্ষু প্রচুর জন্মে। মিছরি (সুগার-ক্যাণ্ডি) উৎপাদিত হয়। আবহাওয়া উষ্ণ – তুষারপাত হয় না বললেই চলে।

এই রাজ্যে জন্ম নিয়েছেন বহু স্বনামধন্য আচার্য যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারায়ণদেব, অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব (উয়ো-চো), বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব (শিহ্-চিন), ধর্মত্রাতা (ধর্মতার), মনোরথ এবং শ্রদ্ধেয় পার্শ্ব। অসঙ্গ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু চতুর্থ শতকের দিকপাল দার্শনিক। নারায়ণদেব অজ্ঞাতনামা দার্শনিক। পার্শ্ব রাজা কণিষ্কের আমলের।

প্রাচীন শহরটি তখনও পূর্ব গৌরবগাথার সামান্য অবশেষই মাত্র বহন করছে। বৌদ্ধধর্ম ক্রমাবনতির মুখে। অনেক বিহার রয়েছে তখনো – সংখ্যায় সহস্রাধিক। অধিকাংশ জীর্ণদশায় ও পরিত্যক্তপ্রায়। অধিকাংশ স্তূপও অন্তিমদশায়। শতাধিক দেবমন্দির আছে। নানা সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে। রাজধানীর উত্তর-পূর্বে এক মহামূল্যবান ভবনচত্বরে একদা বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি ছিল। মহানির্বাণের পরে ভিক্ষাপাত্রটি নানাস্থান ঘুরে পুরুষপুরে আসে। কয়েক শতক পরে আবার তা অন্যত্র চলে যায়। হিউয়েন সাঙের সময় হয়তো ছিল বেনারসে অথবা পো-লো-সু তথা পারস্যদেশে। নগর থেকে আট-নয় লি দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে একশত ফুট উচ্চতার পিপ্পল বৃক্ষ। ঘন পত্ররাজিতে বৃক্ষটি চমৎকার ছায়া মেলে ধরেছে। চার অতীত-বুদ্ধ এই বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন। বসে ধ্যান করেছিলেন। তাঁদের উপবিষ্ট মূর্তি রয়েছে। ভবিষ্যকালের ৯৯৬ জন বুদ্ধও নাকি ঐ বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যানমগ্ন হবেন।

একদিন ঐ বৃক্ষতলে দক্ষিণমুখী আসনে বসে আনন্দকে বুদ্ধ বলেছিলেন – 'চারশ' বৎসর পরে কণিষ্ক নামে এক সম্রাট রাজত্ব করবে; ইনি একটু দক্ষিণে স্তূপ নির্মাণ করবেন এবং সেখানে আমার অস্থিমজ্জার অনেকাংশ সংগ্রহ করে রাখবেন।'

মহানির্বাণের ঠিক চারশ' বৎসর পরে জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা কণিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল। আগে তিনি (বুদ্ধ-নির্দেশিত) কর্মে বিশ্বাস করতেন না; বৌদ্ধধর্মের প্রতি উদ্ধত ভাব পোষণ করতেন। একবার শিকার করতে গিয়ে এক ধবল শশকের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে দেখেন যে শশকটি বনের এক জায়গায় এসে উধাও হয়ে গেল। রাজা দেখলেন, সেখানে এক রাখাল বালক তিন ফুট উঁচু স্তূপ নির্মাণ করেছে। জিজ্ঞাসিত হলে ঐ বালক বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানাল এবং তিনিই যে সেই উদ্দিষ্ট রাজা তাও বলল। এরপর রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং বালকের স্তূপের উপরে নতুন করে স্তূপ নির্মাণ শুরু করলেন। আশ্চর্যের কথা হল, যতই উঁচু করে তিনি স্তূপ তৈরী করেন, ততই বালকের স্তূপটি উঁচুতে উঠে যায়। তারপর যখন স্তূপের ভিতের পরিধি পাঁচ ধাপে দেড় লি এবং উচ্চতা চার শত ফুট হল, তখন বালকের স্তূপটি আবৃত হল। রাজা কণিষ্ক স্তূপ-শীর্ষে পঁচিশটি গিলটি-করা তামার চক্র স্থাপন করলেন। স্তূপে সংরক্ষিত হল তথাগতের দেহভস্ম ও পূতাস্থি। তারপর অর্চনা করতে অগ্রসর হলেন। তখন দেখেন, বৃহৎ স্তূপের থেকে ছোট স্তূপের খানিকটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। এবার রাজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ব্যাপারটা তিনি অমনি রেখে দিলেন।

হিউয়েন সাঙ সেই অলৌকিক জোড়া স্তূপ দেখলেন। তার শীর্ষদেশে বিদ্যমান পঁচিশ ভাগে নির্মিত হীরকচক্র। ভক্তবৃন্দ রোগ নিরাময়ের জন্য এসে স্তূপে পূজা করে। মহাস্তূপের পূবে প্রস্তরসোপানের দক্ষিণে দুটি সুন্দর খোদাই স্তূপ আছে – তিন ও পাঁচ ফুট উঁচু। মহাস্তূপের ক্ষুদ্রকায় প্রতিমূর্তি হিসেবে। বোধিতলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দুটি বুদ্ধমূর্তি আছে – চার ও ছয় ফুট উচ্চতার। সূর্যালোকে সোনালি রঙ ঠিকরোয় সেই মূর্তি থেকে। অন্যসময় রঙ থাকে গাঢ় বেগুনি। মহাস্তূপের দক্ষিণ পাশে ষোলো ফুট দ্বিমস্তক বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত।

একশ' কদম দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে (দক্ষিণ-পূর্বে) আরেকটি স্তূপে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত উত্তরমুখী বুদ্ধমূর্তি দণ্ডায়মান। আঠারো ফুট উঁচু। স্থানীয় লোকেরা বলে, নিশীথ রাতে মূর্তিটি মহাস্তূপের চারপাশে বিচরণ করে। তখন বুদ্ধমূর্তি থেকে আশ্চর্য সুগন্ধ ছড়ায়। নানা অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। আরো কাহিনী আছে মূর্তিটি ঘিরে। চারপাশে ছড়ানো শতাধিক ক্ষুদ্রাকার স্তূপ। বুদ্ধদেব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন – যখন এই স্তূপে সাতবার অগ্নিদাহ ও সাতবার পুনর্নির্মাণ হবে, তখন ধরাধাম থেকে তাঁর ধর্মেরও অন্ত হবে।

শোনা যায় স্তূপটিতে ইতিমধ্যে তিনবার অগ্নিসংযোগ হয়েছে। পরিব্রাজক এসে দেখলেন চতুর্থবারের অগ্নিকাণ্ডের পর পুনর্নির্মাণ চলছে।

বৃহৎ স্তূপের পশ্চিমে কণিষ্ক নির্মিত প্রাচীন মহাবিহার। ভগ্নদশায় তবু স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। একাধিক তলবিশিষ্ট ভবনে সংলগ্ন অনেক ছাদের মধ্যে গমনাগমনের জন্য বহু চলনপথ আছে। সেসব থেকে প্রকাশ পায় বহু খ্যাতিমান এই সঙঘারামের সঙ্গে যুক্ত। কিছু হীনযানী ভক্ত বাস করছিল। বিশাল কক্ষের তৃতীয় তলে (অথবা তৃতীয় মিনারে) একদা শ্রদ্ধেয় পার্শ্ব (পো-লি-সু-ফো তথা পার্শ্বিক) বাস করতেন। ইনি দার্শনিক অশ্বঘোষের আচার্য। ব্রাহ্মণসন্তান। আশি বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বিহারের প্রাত্যহিক কর্মে অশক্ত ছিলেন বলে কপালে উপহাস জোটে। তারপর তিনবছর শয্যায় দেহপার্শ্ব শায়িত না করে তাঁর আধ্যাত্মিক সাফল্য আসে। সেই থেকে নাম হয় পার্শ্ব।

পূর্বদিকের প্রাচীন ভবনে শিহ-চিন-পুসা (বসুবন্ধু) আ-পি-তা-মো-কু-শি-লান (অভিধর্মকোষ শাস্ত্র) রচনা করেন। পিতা কৌশিক ও মাতা বিলিন্দির মধ্যম পুত্র তিনি। অগ্রজ স্বনামধন্য আচার্য অসঙ্গ।

ঐ ভবনের পঞ্চাশ কদম দক্ষিণের ভবনে আচার্য মো-নু-হো-তা-তা (মনোরথ) বিভাষাশাস্ত্র রচনা করেছেন। তাঁর আবির্ভাব হয় মহানির্বাণের এক হাজার বৎসরের মধ্যে। আরেক হিসেবে ১৫০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর আমলে শ্রাবস্তীর রাজা ছিল বিক্রমাদিত্য। একবার রাজা বিক্রমাদিত্য মনোরথকে অপদস্ত করার জন্য একশত পণ্ডিতকে আহ্বান করেন বিতর্কে। নিরানব্বুই জনকে পরাস্ত করার পরে চাতুর্যের সঙ্গে মনোরথকে তর্কে পরাস্ত করে ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ মনোরথ আত্মগ্লানিতে দেহত্যাগ করেন।

তবে শিষ্য বসুবন্ধুকে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে যান। পরে বসুবন্ধু ঐ পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত করে গুরু মনোরথের মান রক্ষা করেন।

কণিষ্ক মহাবিহারের উত্তর-পূর্বে ৫০ লির বেশি (১০০ লি?) অতিক্রম করে ও বিশাল নদ (সিন্ধু) পার হয়ে এলেন পো-সি-কা-লো-ফা-তি (**পুষ্কলাবতী**) নগরে। আধুনিক পেশোয়ারের উত্তরে হস্তনগরে অবস্থান। চৌদ্দ-পনেরো লি সীমানা নগরের। জনবসতি যথেষ্ট। নগরের পশ্চিম দ্বারের বাইরে দেবমন্দির আছে। ভিতরে চমৎকার দেবমূর্তি নিয়ে। নগরের পূর্বদিশায় অশোক নির্মিত স্তূপ যেখানে চার অতীত-বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বসুমিত্র এখানে বসে 'অভিধর্ম-প্রকরণ-পদ শাস্ত্র' রচনা করেন।

নগরের চার-পাঁচ লি উত্তরে আরেকটি প্রাচীন বিহারে বসে ধর্মত্রাতা শাস্ত্র রচনা করেন। বিহারের পাশে অশোক নির্মিত কয়েক শত ফুট উঁচু স্তূপ আছে। স্তূপের কাঠের কাজ ও প্রস্তরখোদাই দেখে বিদেশী শিল্পকর্ম বলে মনে হয়। এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ সহস্রবার পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব রাজা হয়ে জন্মেছিলেন ও চক্ষুদানের মতো দানশক্তি আয়ত্ত করছিলেন। সামান্য পূর্বদিকে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নির্মিত দুটি স্তূপ আছে যার ভিত ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। পঞ্চাশ লি উত্তর-পশ্চিমে যে স্তূপ নির্মিত রয়েছে সেখানে বুদ্ধ দানবমাতা কুয়েই-জু-মু (দেবী হারিতি)-কে পরিবর্তিত করেছিলেন। ঐ স্থানের পঞ্চাশ লি উত্তরে শমক (শম) স্তূপ। পূষা পূর্বেকার কোন এক জন্মে শম ছিলেন। অন্ধ পিতামাতার জন্য ফল আহরণ করতে গিয়ে হরিণশিকার করতে আসা রাজার তীরে বিদ্ধ হন। সদাচরণের ফলে পরে তাঁর পুনর্জীবন লাভ হয়।

শমক স্তূপ থেকে ২০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে পো-লু-শ নগর (সম্ভবত পালোধেরি) যার উত্তরের স্তূপটি যুবরাজ সুদানের রাজ্যত্যাগ করে বনবাস যাত্রার স্মরণে নির্মিত। পাশের বিহারে জনা পঞ্চাশেক হীনযানী বৌদ্ধের বাস। শাস্ত্রবিদ আচার্য ঈশ্বর এখানে বসে অভিধর্ম শাস্ত্র রচনা করেছেন। নগরের পূর্বদ্বারের বাইরের বিহারে পঞ্চাশজন মহাযানী বাস করে। অশোকস্তূপ আছে। এক ব্রাহ্মণ তনতোলোক পর্বতে যুবরাজ সুদানের পুত্রকন্যা ভিক্ষা করে এনে বিক্রয় করে। তার উদ্দেশ্য নির্মিত ঐ অশোকস্তূপ। পাশের স্তূপটি ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা সুদান-সন্তানদের উপর অত্যাচার ও রক্তপাতের স্বাক্ষর বহন করে। পাথরে রক্তিম চিহ্ন তখনও লেগে আছে। আর গাছপালায় লেগে আছে রক্তিম বর্ণ।

কুড়ি লি উত্তর-পূর্বে দন্তলোক পর্বতের উপর একটি স্তূপ আছে। সুদানের আবাসস্থলে নির্মিত সেই স্তূপ। ঐ স্তূপের কাছাকাছি কোন জায়গায় সুদান ঐ ব্রাহ্মণের কাছে আপন পুত্রকন্যা দান করেছিলেন। আছে সুদানের সমাধিগুহা। একশত লি দূরের পাহাড়ে ঋষি একশৃঙ্গ বাস করতেন – সেখানে অশোকস্তূপ আছে। আরো যতো পুণ্যভূমি ছিল সেসব দর্শন করলেন। স্বর্ণ-রজত ও রেশম বস্ত্রাদি দান করলেন। কাওচ্যাঙের রাজা তাঁকে অঢেল উপহার দিয়েছিল বলেই তা সম্ভব হচ্ছিল। পোলুশের ৫০ লি উত্তর-পূর্বে উঁচু

পর্বতের পাদদেশে মহেশ্বরদেবের মন্দির। ভস্মাচ্ছাদিত তীর্থিকেরা সেখানে পূজা ও দানধ্যান করে। পর্বতের আদল শিবপত্নী ভীমাদেবীর মতো। ভক্তদের বিশ্বাস দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা। দেশদেশান্তর থেকে ভক্ত সমাগম হয়। লোকবিশ্বাস – সাতদিন উপবাস থেকে দেবীর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানলে ভীমা দেবী ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

দক্ষিণ-পূর্বে ১৫০ লি দূরে সিন্ধুর উত্তরতটে উ-তো-কা-কান-তু (**উদকখণ্ড**) নগর। আধুনিক আটকের উত্তরে উন্দ অঞ্চলে। কুড়ি লি সীমানা বিশিষ্ট নগর। অধিবাসীরা বিত্তবান। নগরে বিবিধ দুর্মূল্য বস্তুসম্ভার আছে।

আরো কুড়ি লি উত্তর-পশ্চিমে পো-লো-তু-লো (শলাতুরা) নগর – ঋষি পানিনির জন্মভূমি। ইনি শব্দবিদ্যার উপর শাস্ত্র রচনা করেছেন। পুরাকালের প্রারম্ভে জগতে সমুন্নত ভাষা ছিল। কল্পান্তে জগত জনহীন ও শূন্য হল। তখন শ্বাশতগণ অবতার রূপে মানুষকে নির্দেশ দিতে এলেন। তা থেকে লিপিশাস্ত্রের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রথমে আদর্শ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে যখন মানুষের শত বৎসর পরমায়ু হল, তখন পাণিনির আবির্ভাব হল। ইনি শিবের আশীর্বাদধন্য হয়ে বত্রিশটি শব্দে শ্লোক রচনা করলেন এবং সহস্র শ্লোকে সকল শব্দবিদ্যা আয়ত্ত করলেন। তাঁর শাস্ত্র রচনায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছিলেন। নগরে একটি স্তূপ আছে যেখানে কাশ্মীরের এক পণ্ডিত জনৈক পাণিনিশিষ্য ব্রাহ্মণকে ধর্মান্তরিত করেছিল।

উদকখণ্ড নগর থেকে ৬০০ লি পথ পরিক্রমা করে পর্বত-নদী-উপত্যকা পার হয়ে এসে উপনীত হলেন উ-চ্যাঙ-না (**উদয়ন**) রাজ্যে। এই অঞ্চল কোন রাজার উদ্যান ছিল হয়তো, আর উদ্যান থেকে সম্ভবত উদয়ন নাম হয়েছে। সোয়াট উপত্যকায় অবস্থিত রাজ্যটির পরিধি ৫০০০ লি। চারদিকে পাহাড় গিরিসঙ্কট আর ঘন জঙ্গল। আবাদী জমি কম। আঙুর ও ফলফুল প্রচুর জন্মে। ইক্ষু কম। সোনা, লোহা ও জাফরান প্রচুর হয়। অধিবাসীরা ভীরু ও কপট। জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালাভ করে না। ভোজবাজি তন্ত্রমন্ত্র পেশা হিসেবে খুব পছন্দ করে।

উদয়ন রাজ্যে আছে সু-পো-ফা-সু-তু (সুবাস্তু বা সোয়াট) নদী। তার উভয়তটে একদা চৌদ্দশ' বিহার ছিল। সবই জীর্ণদশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একদা ১৮,০০০ বৌদ্ধশ্রমণ বাস করত। কালান্তরে মহাযানী বৌদ্ধ অল্পকিছু সংখ্যায় রয়েছে। তারা নীরবে বসে ধ্যান করে আর মর্মার্থ না বুঝে অতি চাতুর্যের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করে যায়। তারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। বিহার সন্ন্যাসীদের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মতগোষ্ঠীতে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়া হয় – ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাঙিঘক বিনয়। গোটা দশেক দেবমন্দির আছে। রাজ্যে চার-পাঁচটি সুদৃঢ় নগর আছে। তার মধ্যে প্রধান নগর মেঙ-কিয়ে-লি (মঙ্গলৌর)। রাজা বাস করেন সেই নগরে। সে হিসেবে উদয়নের রাজধানী মঙ্গলৌর। দোশিরি পর্বতের গিরিশিরার নিচে অবস্থান। ধনসম্পদে সচ্ছল ও জনবহুল রাজধানী।

চার-পাঁচ লি পূবদিকে স্তুপ আছে যেখানে পূর্বজন্মে পুষা এক সর্বংসহা ঋষি (ক্ষান্তিবাদী) হয়ে জন্মেছিলেন। জাতকে ঐ ঋষির কাহিনী কথিত আছে।

মঙ্গলৌর থেকে ২৫০ লি উত্তর-পূর্বের পার্বত্য প্রদেশে সুবাস্তু নদীর উৎস – সেখানে অপলাল নাগের ঝর্ণা আছে। ঝর্ণা থেকে নির্গত নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। শাক্যমুনি বুদ্ধ অপলাল নাগকে ধর্মান্তরিত করতে এখানে এসেছিলেন। তখন বজ্রপাণি গদা নিয়ে পর্বতশীর্ষ ভগ্ন করেছিলেন।

অপলালনাগ ঝর্ণার ত্রিশ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তরতটে এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে বুদ্ধদেবের চরণচিহ্ন অঙ্কিত আছে। আশ্চর্যের কথা হল – যে ব্যক্তি যেমন, সে ঐ চরণচিহ্নের মাপ তেমন করে দেখে। অপলাল নাগ বিনাশকালে বুদ্ধ এই পদচিহ্ন রেখে যান। নদীর ত্রিশ লি নিচে আছে এক প্রস্তরখণ্ড যার উপর বুদ্ধদেব তাঁর চীবর প্রক্ষালন করতেন। পোষাকের দাগ তখনো এমন সুস্পষ্ট – যেন খোদাই করা হয়েছে!

মঙ্গলৌর থেকে ৪০০ লি দক্ষিণে মাউন্ট হি-লো। ঐ পার্বত্য উপত্যকায় একটি স্রোতধারা পশ্চিমে বহমান। পাহাড়ে পূর্বমুখী যতই উপরে ওঠা হবে, ততই নানা ফুল ও ফলের গাছে স্রোতস্বিনী ঢাকা পড়ে যাবে। শিখর ও ছোট ছোট খাড়া পাহাড় চড়া ক্রমশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। গিরিসঙ্কট এঁকেবেঁকে আরো সর্পিলাকার হয়েছে। শব্দ এমন জোরালো হয় যে মনে হয় কেউ উচ্চগ্রামে কথা বলছে। পূর্বজন্মে তথাগত যক্ষের থেকে অর্ধেক গাথা শিক্ষালাভ করেছিলেন আর প্রতিদানে এখানে দেহ দান করেছিলেন।

মঙ্গলৌর থেকে ২০০ লি দক্ষিণে মো-হ-ফ-ন (মহাবন) বিহার। কাহিনী আছে বিহার কেন্দ্র করে। বহুকাল আগে জু-লাই (বুদ্ধ) যখন পূষা ছিলেন, তখন সফোতাচিহ (সর্বদা বা সর্বদদ বা সর্বদত্ত) রাজা নামে জন্ম নিয়েছিলেন এবং শত্রুর হাতে রাজ্যপাট ত্যাগ করে এখানে গোপন আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন জনৈক ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য কিছু না থাকায় তিনি নিজেকে শত্রুরাজার কাছে সমর্পণ করেন আর তার জন্য ঘোষিত পুরস্কারমূল্য ব্রাহ্মণকে দান করেন। ৩০-৪০ লি উতরাই পথে মো-ইয়ো (মসুর) বিহার। কাছেই শত ফুট উঁচু স্তূপ ও প্রস্তরে অঙ্কিত বুদ্ধের চরণচিহ্ন বিদ্যমান।

মহাবন থেকে ৬০-৭০ লি পশ্চিমে আরেকটি অশোক স্তুপ আছে যেখানে রাজা শিবি এক কবুতরের প্রাণরক্ষা করতে স্বীয় দেহমাংস ঈগলকে দান করেছিলেন। বুদ্ধই পূর্বজন্মে রাজা শিবি ছিলেন। শিবি স্তূপ থেকে ২০০ লি উত্তর-পশ্চিমে সা-পাও-শা-তি (সর্পৌষধি) বিহার ও আশি ফুট উঁচু স্তূপ। সন্নিকটে সু-মো মহাস্তূপ। মঙ্গলৌর থেকে ৬০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে নদীতীরে ষাট ফুট উঁচু উত্তরসেনা স্তূপ।

মঙ্গলৌর নগর থেকে ৫০ লি পশ্চিমে নদী অতিক্রম করে লোহিতক (রোহিতক) স্তুপ। পঞ্চাশ (একশ'?) ফুট উঁচু ঐ স্তূপের নির্মাতাও সম্রাট অশোক। তথাগত এখানে পাঁচ যক্ষের ভোজনের জন্য স্বয়ং দেহকর্তন করে দান করেছিলেন। আবার উত্তর-পূর্বে

৩০ লি দূরে আছে ও-পু-তো (অদ্ভুত) স্তূপ – ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উচ্চতার। একদা বুদ্ধ এখানে সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। নির্বাণলাভ করার পরে স্তূপটি আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। নদী পেরিয়ে পশ্চিমদিকে কয়েক লি দূরে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মন্দির।

১৪০-১৫০ লি দূরে লান-পো-লু পর্বত। তার উপরে ত্রিশ লি পরিধির নাগ-হ্রদ আছে। একদা কপিলাবাস্তু থেকে নির্বাসিত শাক্যযুবা এখানে এসে নাগ-কন্যাকে বিবাহ করে উদয়নের সিংহাসন দখল করেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল উত্তরসেন।

মঙ্গলৌর থেকে ১০০০ লি দূরে দুর্গম পথে তা-লি-লো (দর্দ বা দারেল) উপত্যকা – উদয়ন রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী সেখানে। সেখানকার বিহারে কাঠের একশ' ফুট উঁচু জু-শিহ পূষা (মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব) মূর্তি আছে। কথিত আছে, আনন্দ-শিষ্য অর্হৎ মধ্যান্তিক তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে জনৈক মূর্তিশিল্পীকে তুষিত স্বর্গে প্রেরণ করেছিলেন বোধিসত্ত্বের প্রকৃত অবয়বের সঙ্গে পরিচিত হতে। ঐ শিল্পী তিন বার স্বর্গে গমন করেন। তারপর অপরূপ মৈত্রেয়মূর্তি নির্মাণ করেন। মূর্তিটি মৈত্রেয় বুদ্ধের যথার্থ রূপায়ণ – এমনটাই শিল্পীর দাবী। ফা-হিয়েন বলেছেন – মূর্তিটি উচ্চতায় আশি ফুট; নিচের দিক চওড়ায় আট ফুট; উপবাসের দিনে মূর্তি থেকে মাঝেমাঝে তীক্ষ্ণ জ্যোতি বিকীর্ণ হয়।

তা-লি-লো থেকে পূর্বদিকে সিন্ধুর উজানে ৫০০ লি দূরে পো-লু-লো (বোলোর) রাজ্য। বন্ধুর পার্বত্যপথ, গভীর খাদ, ঝুলন্ত সেতু ও গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে রাজ্য। ৪০০০ লি সীমানা। অবস্থান একেবারে হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপর। সম্ভবত পোলুলো রাজ্যটি এখনকার বালতিস্তান। দারুণ শীতের জায়গা। গম, দানাশষ্য, সোনা ও রূপো পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা ধনী, রুক্ষপ্রকৃতির ও কুৎসিতদর্শন। কয়েক শ' বিহারে কয়েক হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছে।

উদকখণ্ড থেকে হিউয়েন সাঙ উপরোক্ত স্থানে গিয়েছিলেন কিনা বা কতটা গিয়েছিলেন তা নিয়ে সংশয় খুব। যদি গিয়ে থাকেন, তবে ফিরে এসেছিলেন। তারপর উদকখণ্ড নগরের দক্ষিণে এগিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত খরস্রোতা সিন্ধু। তিন থেকে চার লি চওড়া। কেউ বলছেন, উত্তরে এগিয়ে বুনের উপত্যকার সাবাজঘর্নি হয়ে হুন্ডের কাছে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেছিলেন। আসল কথা, এরপর তিনি এসে উপনীত হলেন তা-চা-শি-লো বা **তক্ষশীলা**।

একদা ষোড়শ জনপদের অন্যতম গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। পূর্বের বঙ্গ দেশ থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তক্ষশীলা হয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। নালন্দার আগে তক্ষশীলাই ছিল বৌদ্ধসংস্কৃতির অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ও বুদ্ধভক্ত জীবক ও কূটনীতিবিদ চাণক্য এখানে শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলার রাজা অম্ভি গ্রীক সেনানায়ককে সাহায্য করেছিল। রামায়ণ খ্যাত ভরত নাকি এহ নগরের প্রতিষ্ঠাতা – পুত্র তক্ষের রাজ্যাভিষেক হয় এখানে। রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের

স্থানও নাকি এখানে। বর্তমানের হারো নদী, তাম্রনালা, লুণ্ডিনালা ও হাতিয়াল পাহাড়ের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল সেদিনের তক্ষশীলা নগর। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে বীরমণ্ড, শিরকাপ ও শিরসুখ এলাকার তিনটি নগরে। একদা পারস্যরাজার অধীন ছিল। পরে আসে গ্রীক ও মৌর্য আধিপত্যে। তারও পরে ইন্দোগ্রীক ও শক-পহ্লব-কুষাণদের শাসনে।

তক্ষশীলার অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানের রাউলপিণ্ডির কাছে। সিন্ধু ও ঝিলম নদীর অন্তবর্তী ভূখণ্ডে। উর্বরভূমির শস্য উৎপাদনক্ষমতা ভালো। স্রোতস্বতী নদী ও ঝর্ণার দেশ। সবুজ বৃক্ষলতায় সমৃদ্ধ জনপদ। অবশ্য কাশ্মীর রাজার অধীনস্থ দেশ। রাজ্যের পরিধি ২০০০ লি। রাজধানীর সীমানা দশ লির বেশি। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা তেজস্বী ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনেক বিহার আছে তবে বেশ কিছু বিহারই জনমানবহীন। বৌদ্ধধর্মীর সংখ্যা কম। যারা আছে তারা সকলেই মহাযানী।

নগরের উত্তরে বারো-তেরো লি দূরে উঁচু ঢিবির উপর আছে অশোক নির্মিত মস্তকদানের স্তূপ। উপবাসের দিনে ঐ স্তূপ থেকে উজ্জ্বল আলোকপ্রভা নির্গত হয়। সেই সঙ্গে থাকে দৈব পুষ্পবৃষ্টি ও স্বর্গীয় সঙ্গীত। হিউয়েন সাঙ এক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলেন। সম্প্রতি জনৈকা চর্মরোগগ্রস্ত রমণী স্তূপে পূজা করতে এসে স্থানটি অপরিচ্ছন্ন দেখে পরিষ্কার করতে লেগে যায়। তারপর ফুল ও ধূপ দান করে। আর অমনি আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, সে রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার দেহ থেকে নীলপদ্মের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে। অতীতজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন রাজা চন্দ্রপ্রভ নামে জন্মেছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব অর্জনের জন্য তিনি মস্তক দান করেছিলেন সহস্র জন্ম ধরে। স্তূপের নিকটস্থ বিনষ্টপ্রায় বিহারে জনাকয়েক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বসবাস করছিল। এই বিহারে বসে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের চিকিৎসক কৌ-মো-লো-লো-তো (কুমারলব্ধ) অনেক শাস্ রচনা করেন।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে দক্ষিণ পাহাড়ের উত্তর ঢালে একশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। অশোকপুত্র কুণালের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত এই কু-লাঙ-না (কুণাল) স্তূপ। দুষ্টবুদ্ধি দ্বিতীয়া মহিষীর ষড়যন্ত্রে যুবরাজ কুণালকে তক্ষশীলা শাসন করতে পাঠানো হয়েছিল। আর বিমাতারই চক্রান্তে তার চক্ষু উৎপাটিত হয়েছিল। তারপর এখানে প্রার্থনা জানিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। হিউয়েন সাঙ অবশ্য অন্য কাহিনী বলেন। অন্ধ কুণাল তক্ষশীলা থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যায় এবং অর্হৎ ঘোষার কল্যাণে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

রাজধানীর ৭০ লি উত্তর-পশ্চিমে আছে এলাপত্র নামে মিঠে জলের নাগ-সরোবর। আয়তন একশ' কদমের মতো। নানা রঙের পদ্ম ফোটে। কাশ্যপবুদ্ধের কালে এক বৌদ্ধভিক্ষু এলাপত্র নামে অভিশপ্ত নাগ হয়ে এখানে থাকত। ঐ নাগ-সরোবর থেকে ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। মৈত্রেয়'

যখন বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হবেন, শাক্য বুদ্ধ বলেছেন, তখন চারটি অমূল্য সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি বর্তমান থাকবে। উক্ত চার অমূল্য সম্পদ হল গান্ধারের এলাপত্র, মিথিলার পাণ্ডুক, কলিঙ্গর পিঙ্গল এবং কাশীর শঙ্খ।

তক্ষশীলায় বুদ্ধ-পূতাস্থির উপর যে অশোক নির্মিত ধর্মরাজিক স্তূপ আছে, সে ব্যাপারে হিউয়েন সাঙ এবং ফা-হিয়ান উভয়ে নীরব। অধুনা চিরটোপ নামে পরিচিত – প্রাচীন বীরমণ্ড নগরের প্রান্তে হাতিয়াল পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই অর্ধগোলাকার স্তূপটি।

তক্ষশীলা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৭০০ লি দূরে সেং-হ-পু-লো (**সিংহপুর**) রাজ্য। বর্তমানে কলবাগ বা সল্ট রেঞ্জে অবস্থিত। পশ্চিমে সিন্ধু নদ। রাজ্যের সীমানা ৩৫০০ লি। রাজধানী চৌদ্দ-পনেরো লি পরিধির। পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত বলে প্রাকৃতিক সুরক্ষায় সুরক্ষিত। রাজ্য কাশ্মীরের শাসনাধীন। শীতের দেশ। জমি উর্বর। অধিবাসীরা রুক্ষ, সাহসী ও কপট। রাজধানীর দক্ষিণে অশোক স্তূপ। পাশে পরিত্যক্ত বৌদ্ধবিহার।

দক্ষিণ-পূর্বে ৪০-৫০ লি দূরে অশোক নির্মিত প্রস্তর-স্তূপটি দুশ' ফুট উঁচু। দশটিরও বেশি ছোটবড়ো সরোবর আছে। কলকল্লোলিনী জলপ্রবাহ, নানা প্রকার মীন-নাগ ও জলজ প্রাণী, চার বর্ণের পদ্মফুল, নানা রকমের ফলবৃক্ষে সমৃদ্ধ স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর। স্তূপের পাশে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নামে প্রথম ধর্মপ্রচারের স্মৃতিতে মন্দির আছে। পাশে আছে দেবমন্দির। ঐ সম্প্রদায়ের প্রচারিত রীতিনীতি অনেকটাই বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত। তারা অগ্রজদের ভিক্ষু ও অধস্তনদের শ্রমণ বা শ্রমণের বলে। আচরণ ও সংস্কারাদি বৌদ্ধদের মতো। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ভিক্ষু-শ্রমণের মাথায় ছোট করে কাটা চুল থাকে – হয় তারা নগ্ন থাকে নয়তো শ্বেতবস্ত্র পড়ে ভ্রমণ করে। তাঁদের দেবশিক্ষকের মূর্তি অনেকটাই বুদ্ধমূর্তির মতো।

সিংহপুর থেকে তক্ষশীলার উত্তর সীমান্তে ফিরে হিউয়েন সাঙ সিন্ধু নদ অতিক্রম করলেন। দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন ২০০ লি পথ। উপনীত হলেন **মহান গিরি-দ্বারে** (গ্রেট স্টোন গেট)। এখানে বহুকাল আগে যুবরাজ মহাসত্ত্ব ক্ষুধার্ত এক বাঘিনীকে রক্ত ও দেহ দান করেছিলেন। সেই স্থানে নির্মিত হয়েছে মহাসত্ত্ব স্তূপ। তখনো দর্শনাভিলাষীদের জন্য রক্তিম স্বাক্ষর বর্তমান ছিল পাথরে এবং বৃক্ষলতায়। উত্তরে দুশ' ফুট উঁচু সুন্দর অলঙ্করণে সজ্জিত অশোক স্তূপ – তা থেকে অলৌকিক দ্যুতি নির্গত হয়। ক্ষুদ্রাকার অনেক স্তূপ ও শতাধিক মন্দির আছে চারদিক ঘিরে। পূবদিকে একশ' মহাযানীর বসবাস নিয়ে একটি বিহার আছে। মহাসত্ত্ব স্তূপ থেকে ৫০ লি পূর্বে বিচ্ছিন্ন এক পাহাড়ে দুশ' মহাযানী বৌদ্ধের বসবাসের উপযোগী আরেকটি বিহার আছে। বিহারের পাশে দণ্ডায়মান তিনশ' ফুট উঁচু একটি স্তূপ – একদা বুদ্ধ এখানে দুষ্ট যক্ষকে পরিবর্তিত করেছিলেন।

আরো ৫০০ লি পথে পাহাড়-পর্বত ঠেলে এসে উঠলেন উ-ল-শিহ (উলচ বা উরস) রাজ্যে। বর্তমানের হজার নামক স্থানে সেদিনের রাজ্যটির অবস্থান ছিল হয়তো। ২০০০ লি পরিধির দেশটি কাশ্মীরের অধীন। রাজধানী সাত-আট লি সীমানার হবে। হয়তো বর্তমানের হরিপুর সেদিনের রাজধানী ছিল। চাষের জমি কম। লোকজন রুক্ষ্ম ও কপট। বৌদ্ধ নয়। রাজধানী থেকে চার লি দূরে দুশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। পাশের বিহারে সামান্য কয়েকজন মহাযানী বৌদ্ধ বসবাস করে।

তারপর পণ্ডিত পরিব্রাজককে অনেক পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে হল। পার হতে হল লৌহসেতু। সেটাই তো বারমুলার গিরিপথ। বরাহমুলা থেকে বারমুলা?

উরস থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১০০০ লি দূরে ক-সে-মি-লো বা কো-সি-মি বা কাপিন। আমরা জানি তাকে কাশ্মীর নামে। ঝিলম নদের পশ্চিমে সে রাজ্যের রাজধানী। কশ্যপমীর থেকে কাশ্মীর — এমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। কাশ্যপমুনি স্ত্রী কদ্রু ও নাগ সন্তানদের নিয়ে এখানে বসবাস করত। পাণ্ডববীর অর্জুন কাশ্মীর জয় করেছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গান্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের অধিকার লাভ করেন। সম্রাট অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্মের চর্চা বাড়ে। সম্রাট নাকি কন্যা চারুমতীকে নিয়ে এসেছিলেন ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন। কুষাণ রাজ কণিষ্ক কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন।

আমাদের কাছে একটা চিত্রকল্প ফুটে ওঠে যেন — নির্জন প্রান্তরে প্রমত্ত পবন প্রবাহিত হচ্ছে, জোরে আরো জোরে। সঙ্গে ঝরছে অজস্র তুষাররাশি। হিমালয়ের বুকে তুষারঝড় ক্ষিপ্ত অজগরের মতো আছড়ে পড়ছে। ফুঁসছে আক্রোশে। ধীর পদক্ষেপে পথ পরিক্রমা করে চলেছেন এক বৌদ্ধভিক্ষু। কতদিন গেল, কতরাত্রি ফুরাল। তবু পথের শেষ নেই। লুয়োইয়াঙের বৌদ্ধমঠ আজ অনেক দূরে। মঠ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে। জীবনের স্বপ্নসাধ একটিই। তা পূর্ণ করতে এই কঠিন যাত্রা। কত নতুন দেশ পেরিয়ে চলা — তুরফান, লেক ইশিককুল, তাসখন্দ, সমরকন্দ। কত নতুন নতুন মানুষ। অবশেষে সেই পর্যটক ভিক্ষু কাশ্মীরে উপনীত হলেন। ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত প্রান্তিক রাজ্যে। তাঁর ঈপ্সিত নালন্দা মহাবিদ্যালয় আর দূরে নয়। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিধন্য পুণ্য তীর্থসকল অচিরেই দর্শন করা সম্ভব হবে।

বুদ্ধকে শরণ করেই এই চলা। ধর্মকে শরণ করেই এই যাত্রা।

৬। কাশ্মীর থেকে কনৌজ

কাশ্মীর- পুনাক- রাজপুর- চেহকা- জয়াপুর- শাকল- নরসিংহ- চিনাভুক্তি- জালন্ধর- কুলুতা- পরিয়াত্র- মথুরা- স্থানেশ্বর-স্রুগনা- মাটিপুর- ব্রহ্মপুর- অহিচ্ছত্র- ভিলসান- কপিত্থ- কনৌজ

তুষারাবৃত পীরপঞ্জাল আর পাংগি রেঞ্জের মাঝখানে ও পামির মালভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে **কাশ্মীর** উপত্যকা।

রাজ্যের চারদিক ঘিরে উচ্চ পর্বতমালা। তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। রাজ্যকে ঘিরে এক দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক সুরক্ষা বর্তমান আছে। ৭০০০ লি সীমান্ত রাজ্যের। রাজধানীর দৈর্ঘ্য বারো তেরো লি। প্রস্থ চার-পাঁচ লি। আবহাওয়া হিমশীতল – শীতকালে ভারী তুষারপাত হয়। কৃষিতে উন্নত দেশ। প্রচুর ফলফুল উৎপাদিত হয়। পাওয়া যায় অশ্ব (ড্রাগন-হর্স !), জাফরান, হুয়ো-চু (দহনোপল নামক স্ফটিক) ও নানাপ্রকার বনৌষধি। লোকজন পশম ও তূলাজাত বস্ত্র পরিধান করে। তারা হাসিখুশি, ভীরু, সুশ্রী ও বিদ্যাপ্রেমী। তবে কপট। ধর্মে একদিকে যেমন গোঁড়া, অন্যদিকে আবার উদারও। (তদর্থ তারা বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম উভয়ই গ্রহণ করেছে।) রাজ্যে তখনও শতাধিক বিহার। পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমণ বসবাস করছে। সম্রাট অশোক চারটি স্তূপ নির্মাণ করে গিয়েছেন কাশ্মীরে। তথাগতের দেহভস্মের উপর।

তখন কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন দুর্লভবর্মন। তিনি স্বীয় মাতুলকে বাহন ও অশ্ব সমভিব্যহারে পাঠালেন মান্যবর অতিথিকে অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে। হিউয়েন সাঙ পথে যেতে যেতে অনেক বিহার দেখতে পেলেন। সেখানে পূজা নিবেদন করলেন। এসে পৌঁছলেন হুবিস্ক বা হুস্কর বিহারে। রাত্রিযাপন হল সেখানে।

সেরাত্রে হুবিস্ক বিহারের শ্রমণেরা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। কোন দেবতা যেন তাদের বলছেন – 'মহাচীন থেকে বরেণ্য অতিথি এসেছেন, ভারতবর্ষ থেকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করবেন, এদেশের তীর্থ দর্শন করবেন এবং অজ্ঞাত বিষয় অবগত হবেন। যেহেতু তিনি সদ্ধর্ম সন্ধানে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে অনেক দেবতা। সকলে সযত্নে মন্ত্রপাঠ করো ও তাঁর প্রশংসা অর্জন করতে চেষ্টা করো। আলস্যে এখনো কেন শয্যায় তোমরা?'

স্বপ্ন দেখে সন্ন্যাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হল। কেউ পদচারণা করতে লাগল। কেউ ধ্যানস্থ হল। কেউ মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। পরদিন সকাল থেকে তারা অতিথির সুনজরে পড়া যায় এমন সব কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দিন কয়েক লাগল রাজধানী পৌঁছতে। রাজধানী থেকে এক যোজন দূরের অতিথিশালায় রাত্রিবাস। পশ্চিমে নদী (ঝিলম)। কাশ্মীরাধিপতি পাত্রমিত্র ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী

সহ রাজধানী প্রবরপুর (অধিষ্ঠান?)-এর বহির্ভাগে অপেক্ষারত ছিল – দূরাগত অতিথিকে সম্মান জানাতে। সহস্রাধিক জন সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের হাতে পতাকা ও গন্ধধুপ। কেউ পুষ্পরাজি বিছিয়ে দিচ্ছে। অতিথিশালায় পৌঁছে রাজা চৈনিক পরিব্রাজককে অভ্যর্থনা জানালেন। নানা প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হল। তাঁকে পুষ্পরাজি দান করা হল। তারপর রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানানো হল। এক বৃহৎ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। নগরের বহির্দ্বার থেকে পুষ্পাচ্ছাদিত পথে বৌদ্ধভিক্ষুকে বিশ্রামভবনে নিয়ে যাওয়া হল। বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হল রাজ-মাতুল নির্মিত জয়েন্দ্রবিহার।

পরদিন তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উপহারদান অনুষ্ঠানে। আহুত হয়েছে আরো অনেক সন্ন্যাসী। খ্যাতিমান সঙঘকীর্তি তো আছেনই। অতিথিকে নানাবিধ উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হল। ভোজনের পরে রাজা তাঁকে ধর্মীয় উপদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং সাধারণভাবে ধর্মালোচনার সূত্রপাত করতে বললেন।

সেই ধর্মালোচনায় দুজন মহাযানী বৌদ্ধ সুধাসিংহ ও জিনবন্ধু, দুজন সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সুগতমিত্র ও বসুমিত্র এবং দুজন মহাসাঙঘিক বৌদ্ধ সূর্যদেব ও জিনমিত্র – এই ছয় পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির প্রশংসাধন্য হওয়ার কারণে অন্য পণ্ডিতেরা নানা কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে যাচাই করে নিচ্ছিল বিদেশী অতিথির জ্ঞানের বহর। সব প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে অতিথি সমর্থ হয়েছিলেন।

চৈনিক সন্ন্যাসী এদেশে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য এসেছেন। তাঁর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কাশ্মীর রাজ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি কার্যে কুড়িজন অনুলিপি লেখককে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সুখসুবিধার জন্য পাঁচজন কর্মকুশলী নিযুক্ত হল। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাজভাণ্ডার থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

কাশ্মীরের পণ্ডিত ধর্মকীর্তি তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। বয়সভারে কাতর ও দুর্বল। সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তি। হিউয়েন সাঙ তাঁকে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন। তারপর তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতে শুরু করলেন দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। সকালে তিনি 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' ব্যাখ্যা করেন। বৈকালে করেন 'অভিধর্ম-ন্যায়ানুসারা শাস্ত্র' ব্যাখ্যা। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে শিক্ষা নিলেন 'হেতুবিদ্যা শাস্ত্র'এবং 'শব্দবিদ্যা শাস্ত্র'। এমন একনিষ্ঠ মনোযোগী শিষ্যলাভ যে কোন গুরুর পক্ষে ভাগ্যের ব্যাপার। ধর্মকীর্তি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে পণ্ডিত অতিথি বসুবন্ধু-অসঙ্গের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি অতি দূরদেশে জন্মেছিলেন বলে এদেশের ঐতিহ্য ও প্রাচীন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাননি। ওই শাস্ত্রশিক্ষা ও চর্চায় যোগ দিয়েছিল আরো অনেক জ্ঞানীগুণী।

প্রাচীনকালে কাশ্মীরের হ্রদে নাগের রাজত্ব ছিল খুব। একদা বুদ্ধ উদ্যান-নাগকে পরাস্ত করে আনন্দকে বলেছিলেন – 'আমার প্রয়াণের পরে অর্হৎ মধ্যান্তিক এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জনবসতি স্থাপন করবেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার করবেন।'

তথাগতের অন্যতম শিষ্য আনন্দ। মহাপ্রয়াণের পঞ্চাশ বৎসর পরে আনন্দ-শিষ্য অর্হৎ মধ্যান্তিকের আগমন হয়। তিনি নাগরাজাকে বিমোহিত করে হ্রদ ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন। তারপর সেখানে পাঁচশ' বিহার নির্মাণ করেন। ভারত থেকে পাঁচশ' অর্হৎ কাশ্মীরে এসে বসবাস শুরু করে। মহাপ্রয়াণের একশ' বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। মগধে সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল তখন। পাঁচশ' অর্হতের সঙ্গে পাঁচশ' সাধারণ বৌদ্ধসন্ন্যাসীও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে একজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মণপুত্র মহাদেব।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের চারশ' বৎসর পরে (আঃ ১০০ খৃষ্টাব্দে) গান্ধারের রাজা কণিষ্ক শ্রদ্ধেয় পার্শ্বের অনুরোধে এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সেই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাশ্মীরে। আচার্য বসুমিত্র সহ ৪৯৯ জন ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ ও পঞ্চবিদ্যায় জ্ঞানী পণ্ডিতসন্ন্যাসীর সমাগম ঘটেছিল। তাঁরা প্রথমে এক লক্ষ শ্লোকে সূত্রপিটক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে 'উপদেশ শাস্ত্র' রচনা করেন। বিনয়পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ শ্লোকে 'বিনয়বিভাষা শাস্ত্র' এবং অভিধর্মপিটক ব্যাখ্যার জন্য 'অভিধর্মবিভাষা শাস্ত্র' রচনা করেন। এই রচনাদি তাম্রপত্রে খোদাই করে প্রস্তরাধারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেকারণে ঐ সকল রচনাদি কাশ্মীরে সুরক্ষিত রয়েছে।

কণিষ্কের পরে কাশ্মীর রাজ্য বৌদ্ধবিরোধীদের (কৃতীয়) দখলে যায়। দুশ' বছর পরে তোখারা রাজ্যের বৌদ্ধরাজা কাশ্মীর থেকে বিরোধীদের উৎখাত করে। তার অল্পকালের মধ্যেই আবার বৌদ্ধবিরোধীদের পুনর্বাসন হয়। হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণের সময় কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সামান্যই ছিল বলা যায়।

প্রাচীন রাজধানীর উত্তরে অবস্থিত পর্বতের দক্ষিণ ঢালে বুদ্ধের পূতদন্ত রক্ষিত আছে একটি স্তূপে। নতুন রাজধানী থেকে দশ লি দক্ষিণ-পূর্বে সেই স্তূপ। সন্নিকটে বিহার আছে। চৌদ্দ লি দক্ষিণে অবস্থিত ছোট বিহারে অধিষ্ঠিত পুষা কুয়ান-জি-সাইয়ের দণ্ডায়মান মূর্তি। ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্রাচীন বিহারে ত্রিশ মহাযানী বাস করছিল। এই বিহারে আচার্য সঙ্ঘভদ্র শাস্ত্র রচনা করেছেন। আশেপাশে মহান অর্হৎদের স্তূপ ও দেহাবশেষ আছে। বানর ও বন্য জন্তুরা সেখানে নিয়মিত পূজার ফুল দান করে। আরো অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন আছে।

বুদ্ধদন্ত বিহার থেকে দশ লি পূর্বে উত্তর-পর্বতের খাড়াই ঢালে যে বিহার আছে তা সো-কান-টি-লো (স্কন্দিল) আচার্যর শাস্ত্ররচনার স্থল। বিহারের কাছে এক অর্হতের দেহাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপ আছে। ইনি পূর্বজন্মে ছিলেন (মোতু) হস্তিনী। জন্মান্তরে অর্হৎ হয়েও তাঁর হস্তীসুলভ প্রবল ক্ষুধার প্রকোপ ছিল। সকলে তাঁকে উপহাস করত জন্মান্তরের কথায়। তারপর একদিন সেই অর্হৎ আকাশমার্গী হয়ে বিস্ফোরিত হলেন।

রাজধানী থেকে ২০০ লি উত্তর-পশ্চিমে আছে শাঙ-লিন বিহার। এখানে বসে আচার্য পু-ল-ন (পূর্ণ) শাস্ত্রগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। পশ্চিম দিকে রাজধানী থেকে ১৪০-

১৫০ লি দূরে মহাসাঙ্ঘিক বিহারে শত সন্ন্যাসী বাস করছিল। ঐ বিহারে অবস্থানকালে আচার্য ফো-টি-লো (বোধিল?) মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ লিখেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর রাজার আনুকূল্যে ও আতিথেয়তায় ভূস্বর্গ কাশ্মীরে দুটি বৎসর অতিবাহিত করলেন নানা শাস্ত্রচর্চায়। সম্ভবত মে, ৬৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষায় আরো পারদর্শিতা লাভ সম্ভব হয়েছে। মহাযান ও অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো জ্ঞানলাভ হয়েছে। তা ছাড়া তিনি কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতী সম্পর্কেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর এতদিন কাশ্মীর বিদায় জানিয়ে পথে নামলেন।

পার্বত্যপথে ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিম দিশায় অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন পন-নু-সো (পুনাচ বা **পুনাক**)। রাজ্যের আয়তন ২০০০ লি। দেশ জুড়ে পাহাড় ও উপত্যকার সারি। কৃষিজমির পরিমাণ কম। উষ্ণ দেশ। শষ্য, ইক্ষু, ফুল, আম-কলা-উদুম্বুর ইত্যাদি ফল উৎপন্ন হয়। আঙুর তেমন নয়। লোকজন সাহসী ও স্পষ্টবাদী। প্রধানত সূতীবস্ত্র পরিধান করে। কাশ্মীরের অধীন দেশ। পাঁচটি বিহার আছে। খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়। রাজধানীর উত্তর দিকের বিহারে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করে। অলৌকিক প্রস্তরস্তূপ আছে একটি।

পুনাক থেকে ৪০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে হো-লো-শে-পু-লো বা **রাজপুর** (আধুনিক কালের রাজপুরী বা রাজৌরি)। কাশ্মীর রাজার অধীনস্থ এই রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ লি। রাজধানীর সীমানা দশ লি। জমি উর্বরা নয়। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি পুনাকের মতোই। দশটি বিহার ও একটি দেবমন্দির আছে। বৌদ্ধ অল্প। অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অধিক।

মহাচিনের অতিথির মনে হয়েছে – লম্পক থেকে চেকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ মানুষ হিসেবে খানিকটা স্থূল ও সরল প্রকৃতির, রুক্ষ্ম ও প্রচণ্ড মেজাজের; তাদের ভাষা অমার্জিত, শিষ্টতাবোধ কম ও সততা যৎসামান্য। যথার্থ ভারতভূমির অধিবাসী থেকে সীমান্ত প্রদেশের এই অবর জনতারা ভিন্ন রকমের।

রাজপুর থেকে চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করে ৭০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে পৌঁছলেন **চেহ-কা**। নামান্তর শেহকিয়া বা টক্ক। অবস্থান সিন্ধু নদের পূর্ব দিকে পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজ্যের পূর্বদিকে পি-পো-সে (বিবাস বা বিপাশা) নদী। রাজ্যের আয়তন ১০,০০০ লি। রাজধানী (সম্ভবত তার নামও চেহ-কা) কুড়ি লি পরিধির। ধান ও গম উৎপন্ন হয়। সোনা, রূপা, কাঁসা, তামা ও লোহা পাওয়া যায়। আবহাওয়া উষ্ণ। মাঝেমাঝে ঝোড়ো বাতাস বয়। অধিবাসীদের আচরণ রুক্ষ্ম। সাদা মসৃণ সিল্ক বা মসলিনের বস্ত্র পরিধান করে। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা কম। গোটা দশেক বিহার আর কয়েক শত দেবমন্দির আছে।

পরিব্রাজক চেহকা থেকে দেখতে শুরু করেছিলেন দুর্গতদের জন্য নির্মিত অজস্র পুণ্যশাল বা ধর্মশালা যেখানে ঔষধ ও আহার দুইই মেলে। ফলে ভ্রমণকারীকে পথে সমস্যায় পড়তে হয় না।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে চেহকার রাজধানী থেকে ১৪/১৫ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন শহর শাকল (শে-কিয়ো-লো)। পরিব্রাজক শাকল থেকে ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌছান চিনাপতি। কিন্তু জীবনীগ্রন্থে লিখিত হয়েছে – পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ রাজপুর থেকে চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করে দুদিন পরে পৌছলেন জয়াপুর। নগরের পশ্চিমদ্বারের বহির্ভাগে অবস্থিত বিধর্মীদের মঠে এক রাত কাটিয়ে নির্গত হয়েছিলেন শাকলের দিকে। জয়াপুরের মঠে জনা বিশেক লোক বাস করছিল।

দুদিন সময় লাগল **শাকল** পৌছতে। শাকল অর্থাৎ বর্তমান কালের শিয়ালকোট। সেখানকার মঠে শতাধিক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। অতীতে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব ঐ মঠে বসে 'পরমার্থ-সত্য শাস্ত্র' রচনা করেন। দুশ' ফুট উঁচু স্তূপ আছে। চার অতীত-বুদ্ধ ওই স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁদের পদচারণার চিহ্ন বিদ্যমান।

কয়েক শ'বৎসর আগে এখানে মো-হি-লো-কু-লো (মহিরকুল) রাজত্ব করে গিয়েছে। শাকল ছিল তার রাজধানী। বোধ করি ইনিই সেই হুন-রাজা মিহিরগুল যার রাজত্বকালের শুরু ৫১৫ খৃষ্টাব্দে। অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। শোনা যায়, অবসরকালে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য স্থানীয় বৌদ্ধ আচার্যগণের কাছে একজন শিক্ষক চেয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে এক বৃদ্ধ ভিক্ষু রাজপ্রাসাদে ভৃত্য রূপে কর্মরত ছিল। তাকেই রাজার শিক্ষক মনোনীত করে পাঠানো হল। পাণ্ডিত্য তার যতই থাক, এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অপমানিত রাজা তার পর থেকে প্রবল বৌদ্ধবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত বিহার ধূলোয় মিশিয়ে দিতে আদেশ দেন। গোটা রাজ্য প্রায় ভিক্ষুশূন্য হয়ে গেল। তারপর মিহিরগুল মগধ জয় করতে এলেন। সেখানে তাকে সুকৌশলে বন্দী করা হল। মগধের রাজা বালাদিত্যে রাজমাতার আদেশে তাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মিহিরগুল কাশ্মীরে গিয়ে রাজাকে কোতল করেন। তারপর আবার বৌদ্ধধর্ম বিনাশে মন দিল। ইনি ষোলোশ' বিহার-স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংস করেন। প্রায় নয় কোটি বৌদ্ধও হত্যা করেছিলেন।

শাকল থেকে হিউয়েন সাঙ **নরসিংহ** নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গতিমুখ পূর্বদিশায়। পথে পড়ল পলাশবন। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সহসা শতাধিক ডাকাতের দল তাঁদের ঘিরে ফেলল। তাঁর ও সঙ্গীদের সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে গেল। তারপর আবার তরবারী নাচিয়ে নাচিয়ে তাঁদের শুকনো পুকুরের কাদায় ফেলে রাখল। মতলব ছিল লুঠের বখরা শেষ হলে তাদের হত্যা করা হবে। এদিকে বখরা নিয়ে সমস্যা মিটছিল না। বিবাদ চলছে। পুকুরের মধ্যে কাঁটার জঙ্গল ছিল। তাঁর

এক যুবক সন্ন্যাসী-সহচর লক্ষ্য করল যে পুকুরের দক্ষিণদিকে যে জলনিকাশী নালা আছে সেটা একজনের পথচলার মতো উপযোগী। যুবা চৈনিক পরিব্রাজকের জামা টেনে ইশারা করে এবং কলহরত দস্যুদের অলক্ষ্যে ঐ পথে পালিয়ে যায়। তারপর গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের জানায়। গ্রামবাসীরা জঙ্গলে ছুটে আসে। তখনো দস্যুদল বখরা নিয়ে বিবাদে মত্ত। আর সঙ্গীরাও অক্ষত। পরোপকারী গ্রামবাসীদের সহায়তায় সেদিন যে শুধু তাঁর ও সঙ্গীদের প্রাণরক্ষা হয়েছিল, তাই নয়, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও ফিরে পেয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, প্রাণঘাতী এমন দুর্ঘটনায় পড়েও হিউয়েন সাঙ অন্য সকলের মতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েননি। তাঁর স্থৈর্য দেখে সকলে জানতে চাইল – 'কেন তিনি এমন দুরবস্থায় পড়েও হাসতে পারছেন?'

চিনা পণ্ডিত বললেন – 'দ্যাখো, জীবনটাই সর্বাধিক মূল্যবান সামগ্রী এবং সেটাই আমরা ফিরে পেয়েছি। আমাদের চিনে বলে, স্বর্গমর্ত্যের মধ্যে মহামূল্যবান সম্পদ হল জীবন। আর তাই যখন ফিরে পেয়েছি তবে সামান্য কিছু বিষয়ের ক্ষয়ক্ষতিতে বিচলিত হওয়া কেন!'

ডাকাতদলের হাত থেকে নিস্তার লাভ করে সদলবলে চেহ্-কা রাজ্যের পূর্ব সীমানায় এক বৃহৎ নগরে উপস্থিত হলেন। সেই নগরের পশ্চিম আম্রকাননে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর বয়স সাতশ' বৎসর বটে কিন্তু তাঁকে মনে হত ত্রিশ বৎসরের যুবক। ইনি ছিলেন নাগার্জুনের শিষ্য। 'মাধ্যমিক শাস্ত্র' এবং 'শত শাস্ত্র' সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। বেদগ্রন্থও তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর দুই সহচরের বয়সও হয়েছিল নাকি শতাধিক বৎসর। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে যখন প্রবীণ ব্রাহ্মণের সাক্ষাত হল, তখন তিনি সহচরদের এই সংবাদ দিয়ে গ্রামে পাঠালেন – 'এক মান্য অতিথি দস্যুলুণ্ঠিত হয়েছেন; নগরের বৌদ্ধ অনুগামীরা তাঁর জন্য যেন আহার্য প্রস্তুত করে পাঠান।'

নগরে অল্প কয়েকজন বৌদ্ধ বাস করত। কাশ্মীর অবস্থানকালে হিউয়েন সাঙের যশরাশি বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল এবং তার ঢেউ ঐ নগরেও এসে পৌঁছেছিল। চিনা অতিথি তাদের গ্রামে এসেছেন সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোকজন সমবেত হল ব্রাহ্মণের আম্রকাননে। হিউয়েন সাঙ তাদের সদ্ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তারাও প্রচুর দানসামগ্রী উপহার দিল। কেউ কেউ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হল। সংগৃহীত উপহারাদি হিউয়েন সাঙ সহচরদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। উদ্বৃত্ত উপহার ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হল। হিউয়েন সাঙ মাসখানেক ঐ নগরে বাস করে 'শত শাস্ত্র' এবং 'শত-শাস্ত্র-বৈপুল্য' অধ্যয়ন করলেন। এক মাস পরে পূর্বদিশায় ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌঁছলেন চিনাপতি। সময় সম্ভবত ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ।

(নরসিংহ নগরের কথা ও ডাকাতের হাতে নিগহের কথা জীবনীগ্রন্থে লিখিত। আশ্চর্যের কথা হল যে তিনি ঐ নগরের নামটা পর্যন্ত লিখে যাননি।)

রাজ্যের নাম চি-না-পুহ-তি (**চিনাভুক্তি**)। স্থানটি বর্তমানের ফিরোজপুর না শিয়ালকোট সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যটি ২০০০ লি সীমান্তে ব্যপ্ত। রাজধানী চৌদ্দ-পনেরো লি পরিধির। কেউ কেউ বলেন, চিনাভুক্তির রাজধানী ছিল পত্তি নামক স্থানে —অবস্থান বর্তমান কসুরের সাতাশ মাইল উত্তর-পূর্বে ও বিপাশা নদীর দশ মাইল পশ্চিমে। রাজ্যে শষ্য উৎপাদন ভালো। গাছপালা প্রচুর না হলেও কম নয়। অধিবাসীগণ নির্দিষ্ট পেশায় ব্যাপৃত। তারা দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মও সমানভাবে গৃহীত হয়েছে। দশটি বিহার ও নয়টি দেবমন্দির আছে। জাতীয় আয় যথেষ্ট। উষ্ণ জলবায়ু।

চিনাভুক্তিতে ছিল তোষাসন বিহার। ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ আচার্য বিনীতপ্রভের বাস ঐ বিহারে। 'পঞ্চস্কন্ধ শাস্ত্র' এবং 'বিদ্যামাত্রসিদ্ধি-ত্রিদশ-কারিকা শাস্ত্র' সম্পর্কে দুটি রচনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। হিউয়েন সাঙ চৌদ্দ মাস সন্ন্যাসী-যুবরাজ বিনীতপ্রভের নিকট অধ্যয়ন করলেন 'অভিধর্ম-সমুচ্চয়-ব্যাখ্যা', 'অভিধর্ম-প্রকরণ-শাসন শাস্ত্র' এবং আরো অনেক শাস্ত্র। প্রবল প্রতাপ সম্রাট কণিষ্কের রাজ্যে সুদূর চিনদেশের এক সামন্তরাজা তার পুত্রকে কুষাণ রাজদরবারে জামিন স্বরূপ পাঠিয়েছিল। সেই চিনা যুবরাজের গ্রীষ্মাবাস ছিল যে অঞ্চলে সেটাই ক্রমে চিনাভুক্তি নামে পরিচিত হয়। ওই চিনা যুবরাজ এদেশে পীচ ও নাসপতি গাছের প্রবর্তন করেন। এবম্বিধ মত চৈনিক ভ্রমণকারীর।

চিনাভুক্তি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৫০ লি দূরে তমসাবন বিহার। সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের তিনশ' ভিক্ষুর বাস। ভদ্রকল্পে সহস্র বুদ্ধ এখানে ধর্মপ্রচার করেন। শাক্যমুনি বুদ্ধর তিনশত মহানির্বাণপূর্তির সময় আচার্য কা-তো-ইয়েন-না (কাত্যায়ন বা কাত্যায়নীপুত্র) এই বিহারে বাস করতেন। রচনা করেছিলেন 'অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র'। দুশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন ও পদচারণার চিহ্ন আছে। আরো অনেক স্তূপ ও গুহা আছে অর্হৎগণের স্মৃতিতে। আছে বুদ্ধের ভস্মাবশেষ নিয়ে অনেক স্তূপ।

তারপর উত্তর-পূর্ব দিশায় প্রায় দেড়শ' লি পথ পেরিয়ে পৌছলেন শে-লন-ত-লো (চে-লন-তো-লো বা **জালন্ধর**) রাজ্যে। কাল ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ। রাজ্যের আয়তন একদিকে ১০০০ লি তো অন্যদিকে ৮০০ লি। রাজধানী বারো-তেরো লি পরিধির। পঞ্চাশটির মতো বিহার আছে। দু হাজারের উপর শ্রমণ। তিনটি দেবমন্দির আছে। আছে পাশুপত সম্প্রদায়ের পাঁচশ' ভক্ত। ধান ও অন্যান্য শষ্য উৎপন্ন হয়। ফুল ও ফল প্রচুর। গাছপালাও প্রচুর। উষ্ণ জলবায়ু। অধিবাসীরা কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির, কেমন নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য চেহারার মনে হয়। তবে ধনী। স্থানীয় নাগরধ্যান মঠে বাস করতেন জ্ঞানী চন্দ্রবর্মন নামের আচার্য। চার মাস বাস করে তাঁর নিকটে পাঠ করলেন 'অভিধর্ম-প্রকরণপদ-বিভাষা শাস্ত্র'।

জালন্ধর থেকে ৭০০ লি উত্তর-পূর্বে পার্বত্যপথ পার করে পৌছলেন কু-লু-তো (কিউ-লো-তো বা **কুলুতা**) রাজ্যে। স্থানটি আধুনিক কালের সুলতানপুরে না কুলু রাজ্যে

ঠিক বলা যায় না। রাজ্যসীমানা ৩০০০ লি। রাজধানীর সীমানা চৌদ্দ-পনেরো লি। উর্বর দেশ। ফসল উৎপাদন ভালো। সবুজের সমারোহ আছে — ফুলফল অনেক হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালার নিকটবর্তী রাজ্য বলে অমূল্য ঔষধি প্রচুর জন্মে। পাওয়া যায় সোনা, রূপো, লাল তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে। বরফ ও হিমপাত কমই হয়। অধিবাসীরা কঠোর উগ্র প্রকৃতির কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ও শৌর্যশালী। কুড়িটি বিহার আছে। এক হাজারের মতো বৌদ্ধশ্রমণ বাস করে। পনেরোটি দেবমন্দির আছে। খাড়া গিরিপথের দুপাশে অর্হৎ-ঋষিদের বাসযোগ্য গুহা আছে। বুদ্ধের পদার্পণ-ধন্য স্থানে অশোকস্তূপ আছে।

কুলুতা রাজ্য থেকে ১৮০০ লি উত্তরে কো-হু-লো (লাহুল) রাজ্য। আরো উত্তরে ২০০০ লি দূরে মো-লো-সো বা মো-লো-পো (মার্পা তথা লাদাখ) রাজ্য। যাত্রাপথ ভয়ানক খারাপ। শীতও খুব। চিনা পরিব্রাজক লাহুল ও লাদাখ রাজ্যে যাননি।

কুলুতা থেকে ৭০০ লি দক্ষিণে শতদ্রু নদী অতিক্রম করে তিনি গেলেন **শে-ত্তো-তু-লু** (শতদ্রু) রাজ্যে। এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি। রাজ্যের আয়তন ২০০০ লি সীমানার। উর্বর জমি। প্রচুর ফল ও ফসল জন্মে। অধিবাসীরা নীতিবোধ সম্পন্ন ও সচ্ছল। দশটি বিহার আছে। মূলত শ্রমণহীন। তিন লি দূরে অশোক স্তূপ আছে। দুশ' ফুট উঁচু স্তূপ। কাছে অতীত-বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন।

দক্ষিণ-পশ্চিমে আরো ৮০০ লি পথ অতিক্রম করে পরিব্রাজক উপনীত হলেন পো-লি-ইয়ে-তা-লো (**পারয়াত্র**) রাজ্যে। এর অবস্থানও অনির্ণীত। তবে পূর্বদিকে মাত্র ৫০০ লি দূরে নাকি মথুরা। রাজ্যের আয়তন ৩০০০ লি। রাজধানী চৌদ্দ লি সীমানা বিশিষ্ট। গম ও অন্যান্য শষ্য প্রচুর জন্মে। ফুলফল সামান্য। গরু ও ভেড়া অসংখ্য। উষ্ণ আবহাওয়া। লোকজনের ভাবগতিক রুক্ষ। বিদ্যাচর্চা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। রাজা বৈশ্য সম্প্রদায়ের কিন্তু সাহসী ও রণনিপুণ। আটটি বৌদ্ধবিহার আছে। সবই বিনষ্টপ্রায়। বৌদ্ধ আছে অল্পসংখ্যক এবং তারা সকলে হীনযানী। দেবমন্দির আছে দশটির বেশি এবং অবৌদ্ধ ভক্ত সংখ্যা সহস্রাধিক।

পারয়াত্র থেকে ৫০০ লি পূর্বদিশায় হিউয়েন সাঙ যমুনা তীরবর্তী মোতুলো বা **মথুরা** গমন করলেন। পুরাণমতে লবণাসুরকে বধ করে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার মধুরার প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণবংশীয় যাদবদের রাজধানী ছিল মধুরাপুরী যা হয়েছে ক্রমে মথুরাপুরী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম শৈশব-কৈশোরকালের কাহিনী মথুরা কেন্দ্র করে। কুষাণ আমলেও রাজধানী ছিল কিছুকাল।

বৈষ্ণবতীর্থ মথুরা হিন্দু অধ্যুষিত হলেও হিউয়েন সাঙের সময় দু'হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করত। সকল প্রধান বৌদ্ধ শাখাসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। রাজ্যের আয়তন ৫০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। রাজধানী নগরের সীমানা ২০ লি। জমি অত্যন্ত উর্বর। কৃষিকাজ প্রধান পেশা। নগরের নানা বাগিচায় অনেক আম্রকানন আছে। দু'রকমের আম

দেখা যায় – একটি ছোট কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় হলুদরঙা, অন্যটি বড়ো কিন্তু সবুজ বর্ণের। (আম না আমলক তা নিয়ে মতভেদ আছে। চিনা ভাষায় একে বলা হয়েছে আন-সো-লো।) রাজ্যে উৎকৃষ্ট ডোরাকাটা সূতীবস্ত্র ও সোনা উৎপাদিত হয়। জলবায়ু উষ্ণ। রাজ্যবাসীর রীতিনীতি ও আচার আচরণ ভালো। কর্মসাধনে বিশ্বাসী। নৈতিক ও বৌদ্ধিক খ্যাতির সম্মান করে। রাজ্যে বিংশাধিক বিহার ও দ্বিসহস্রাধিক শ্রমণ আছে। পাঁচটি দেবমন্দির আছে যাকে কেন্দ্র করে নানা অবৌদ্ধ সম্প্রদায় বসবাস করে।

অশোক নির্মিত তিনটি স্তূপ আছে। আর চার অতীত-বুদ্ধের নানা চিহ্ন। শাক্য জু-লাইর যে সকল পুণ্যবান শিষ্যের নামে স্তূপ আছে তাঁরা হল – সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্র, উপালী, আনন্দ ও রাহুল। স্তূপ আছে মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য পূষার নামে। প্রতি বৎসর তিন মাস (প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাস) ও ছয় উপবাসকালে (প্রতি মাসের অষ্টম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ত্রয়োবিংশ, উনবিংশ ও ত্রিংশ দিবস) সন্ন্যাসীগণ ঐ স্তূপে শ্রদ্ধা নিবেদনে সমবেত হন। যে ভক্ত যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেরকম স্তূপেই অনুগমন করেন। যেমন অভিধর্মবাদীরা সারিপুত্রের স্তূপে, সমাধিস্থরা মৌদগল্যায়নের স্তূপে, সূত্রবাদীরা মৈত্রায়নপুত্রের স্তূপে, বিনয়বাদীরা উপালীর স্তূপে, ভিক্ষুনীরা আনন্দের স্তূপে, শ্রমণেরা রাহুলের স্তূপে এবং মহাযানীরা নানা বোধিসত্ত্ব স্তূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সেসময় বিভিন্ন স্তূপের মধ্যে পূজার ধুম লেগে যায়। কত নিশান আর ছত্র শোভা পায়। ধূপের ধোয়ায় মেঘের সঞ্চার হয়। পুষ্পরাশির বর্ষণ হয় খুব। চন্দ্রসূর্য ঢাকা পড়ে যায়। রাজা ও রাজন্যবর্গ সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকে।

রাজধানীর পূবদিকে পাঁচ-ছয় লি দূরে (উরুমণ্ড বা উরমণ্ড ?) পর্বত বিহার (উপগুপ্ত বিহার)। খাড়া পাহাড়ের পাথর খোদাই করে তার কক্ষ নির্মিত। সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে প্রবেশপথ। নির্মাতা শ্রদ্ধেয় আচার্য উপগুপ্ত। সেখানে সংরক্ষিত আছে ভগবান বুদ্ধের নখাবশেষ। (আসলে নাকি গোড়ায় নট ও বট নামে দুই ভাই উপরোক্ত নটবট বিহারখানি নির্মাণ করেছিল। পরে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত সেখানে বসবাস করেন। একমতে বর্তমান মথুরার কাটরা বা ঈদগায় ঐ বিহার অবস্থিত ছিল। অন্যমতে কঙ্কালিটিলায়।) বিহারের উত্তর প্রস্তরপ্রাচীরে কুড়ি ফুট উঁচু ও ত্রিশ ফুট প্রশস্ত গুহায় চার ইঞ্চি পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড জড়ো করে রাখা। আচার্য উপগুপ্তের কালে প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতি অর্হত্ত্ব লাভ করলে একটি করে কাষ্ঠখণ্ড বা আঁক-বাড়ি দান করে যেত।

গুহার দক্ষিণ-পূর্বে চব্বিশ-পঁচিশ লি দূরে এক শুষ্ক পুষ্করিণীর পাশে স্তূপ আছে যেখানে পদচারণারত বুদ্ধকে এক শাখামৃগ মধু দান করেছিল। ভগবান তা গ্রহণ করে শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সেই আনন্দে অধীর শাখামৃগ উল্লসিত হয়ে নৃত্য করতে করতে খাদে পড়ে প্রাণত্যাগ করে। পরে ঐ মধুদানের সুবাদে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পুকুরের উত্তরে বিশাল বন। সেখানে চার অতীত-বুদ্ধের পদচিহ্ন আছে। নিকটে

সারিপুত্র এবং অন্যান্যরা ধ্যানাভ্যাস করেছিল। বুদ্ধ এখানে প্রায়শই ধর্ম প্রচারের জন্য আসতেন। তার কিছু স্মরণচিহ্ন আছে। মথুরা দর্শন করে হিউয়েন সাঙ বেরিয়ে পড়লেন উত্তর-পূর্ব দিকে।

৫০০ লির অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে স-ত-নি-সু-ফ-লো (**স্থানেশ্বর**) রাজ্যে উপনীত হলেন। বিশাল রাজ্য – সীমানা ৭০০০ লি। রাজধানীর নামও স্থানেশ্বর – সীমানা কুড়ি লি। জলবায়ু উষ্ণ। জমি উর্বরা। শষ্য উৎপাদন পচুর। অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুদার ও আন্তরিকতাহীন। ধনীরা বিলাসব্যসনে অধিকতর ব্যয় করতে পরস্পরের প্রতিযোগী। কৃষির তুলনায় বাণিজ্যে বেশি লোক কর্মরত। তিন বৌদ্ধ বিহারে সাতশ' সন্ন্যাসী আছে। দেবমন্দিরের সংখ্যা শতাধিক। অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক। রাজধানীর চারদিকে ২০০ লি অবধি বিস্তৃত স্থানটিকে 'পুণ্য ধর্মস্থান' হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পিছনে পূর্বতন রাজার মিথ্যা চাতুরি আছে। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চার-পাঁচ লি দূরে অশোক স্তূপ। উজ্জ্বল কমলা রঙের ইঁটে তৈরী। অলৌকিক দেহাবশেষ রক্ষিত স্তূপে। রাজধানীর একশ' লি দক্ষিণে কু-হ্নন-তু (গোবিন্দ বা গোকণ্ঠ) বিহার।

স্থানেশ্বর থেকে ৪০০ লি পূর্বে নদীর উজানে সু-লু-কিন-ন (**স্রুগনা**) রাজ্য। বর্তমান অবস্থান রোহতকের উত্তরে। রাজ্যের পূবদিকে গঙ্গা নদী প্রবাহমান, উত্তরে উচ্চ পর্বত। মাঝে প্রবাহিত হয়েছে ইয়েন-মো-না তথা যমুনা নদী। রাজ্যের আয়তন ৬০০০ লি। রাজধানীর কুড়ি। যমুনার উত্তরতটে রাজধানী – বিনষ্টপ্রায়। মানুষজন সৎ ও জ্ঞানচর্চায় শ্রদ্ধাশীল। পাঁচটি বৌদ্ধবিহারে সহস্রাধিক শ্রমণ বাস করে। হীনযানীরাই সংখ্যায় বেশি। শতাধিক দেবমন্দির আছে – অবৌদ্ধ সংখ্যায় অনেক বেশি।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে যমুনার পশ্চিম তীরে বড়ো বিহারের পূর্বদ্বারের বাইরে অশোক স্তূপ আছে যেখানে জু-লাই ধর্মপ্রচার করেছিলেন ও অনেক শিষ্যকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পাশের আরেকটি স্তূপে রক্ষিত জু-লাইর কেশ ও নখ। চারপাশে আরো স্তূপ রয়েছে সারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন ও অন্যান্য অর্হতের। বুদ্ধের প্রয়াণের পরে বৌদ্ধধর্ম এই দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন অন্য রাজ্য থেকে শাস্ত্রবিশারদগণ এসে তীর্থিক ও ব্রাহ্মণদের আলোচনায় পরাস্ত করে সঙঘারাম নির্মাণ করেন। পূর্বোক্ত পাঁচ বিহার সেই আলোচনা সভাস্থলে নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের বিজয় ঘোষণা করতে।

জীবনীকার বলেছেন – তারপর চিনাভিক্ষু যমুনা থেকে পূর্বদিকে ৮০০ লি পথদূরত্বে গঙ্গায় পৌঁছলেন। অর্থাৎ গঙ্গার উৎসে। সম্ভবত হরিদ্বার। গঙ্গা তিন-চার লি প্রশস্ত। প্রবাহ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। জলের বুকে প্রবল তরঙ্গদোল আর নানা রঙের খেলা। সুন্দর জলপ্রাণীরা জলে ভেসে বেড়ায়। আঁশালো দৈত্যরাও আছে। কিন্তু তারা মানুষের অনিষ্ট করে না। নদীর জল মিষ্ট। স্রোতের সঙ্গে সূক্ষ্ম বালুকণা এসে সঞ্চিত হচ্ছে। লোকসাহিত্যে এ নদীর জলকে ফো-শুই বা ফু-শুই বলে যার অর্থ ধর্মীয় গুণসম্পন্ন জল তথা শান্তিবারি।

জনপ্রবাদ, নদীতে অবগাহন করলে সর্বপাপ দূর হয়; মুখপ্রক্ষালনে সর্ব বিঘ্ন নাশ হয়; এমনকি সলিলসমাধি লাভ করলে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি মেলে। অজ্ঞানীরা গঙ্গাস্নানের জন্য দলে দলে এসে জড়ো হয়। এসবই বিধর্মীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। পরে চিহ্-শিহ্-জু-কুয়ো (সিংহল) দেশের দেব-বোধিসত্ত্ব এসে তাদের সত্যপথের হদিশ দেন।

একদিন ঐ দেবপূষা মাথ নিচু করে নদীর জলধারা পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করছিলেন। তখন এক তীর্থিক বলল – 'মহাশয়, আপনি এমন অদ্ভুত আচরণ করছেন কেন?'

দেবপূষা বললেন – 'অনেক দূরে তাঁর দেশ সেই সিংহলে; সেখানে তাঁর পিতামাতা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। আশা করছি এই জল তাঁদের তৃষ্ণা মেটাবে।'

তীর্থিক বলল – 'মহাশয়, আপনি ভুল করছেন; আপনার বাড়ি দূরদেশে, মাঝে কত পর্বতমালা-নদী; এখানে জল নাড়িয়ে দূরদেশে আপনার পিতামাতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করার ভাবনা আসলে অগ্রসর হয়ে গিয়ে পশ্চাদমুখী হওয়া; এটা অসম্ভব ব্যাপার।'

দেবপূষা বললেন – 'যদি এই জল অন্য লোকে থাকা তৃষ্ণার্ত মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে পারে তবে দূরদেশে পিতামাতার তৃষ্ণাও দূর করতে পারবে।'

এমন যুক্তি শুনে তারা বিমোহিত। তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়ে প্রাচীন প্রথা বর্জন করল এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল।

স্রুগনা রাজ্যে তখন ত্রিপিটকে পণ্ডিত এক ধার্মিক সন্ন্যাসী বাস করতেন। নাম জয়গুপ্ত। তাঁর নিকট হিউয়েন সাঙ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের 'বিভাষা শাস্ত্র' অধ্যয়ন করেন। সেখানেই গোটা শীত এবং অর্ধেক বসন্তকাল অতিবাহিত হয়। তারপর গঙ্গা অতিক্রম করে পূর্বতটে অবস্থিত মো-তি-পু-লো (**মতিপুর** বা মান্দোর) রাজ্যে পৌছলেন। সম্ভবত ৬৩৫ সালে।

ভ্রমণবৃত্তান্তে অনুসারে তিনি স্রুগনা থেকে মতিপুরে যান। মোতিপুলোর বর্তমান অবস্থান পশ্চিম রোহিলখণ্ডের বিজনোরের কাছে মান্দোর বা মদভর।

রাজ্যটি ছিল ৬০০০ লি পরিধির। রাজধানী কুড়ি লির। রাজা শুতোলো তথা শূদ্রবর্ণের – বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। তবে অধিবাসীরা সৎ ও ন্যায়বান। কার্যকরী শিক্ষাকে সমাদর করে। যাদুকরী কলাকৌশলে সিদ্ধহস্ত। রাজ্যে দশটি বিহার আছে। আট শত শ্রমণ বসবাস করে। সকলেই হীনযানের সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের।

মহানগর থেকে চার-পাঁচ লি দক্ষিণে ক্ষুদ্র এক বিহার আছে। জনাপঞ্চাশ সন্ন্যাসী বাস করে। একদা শাস্ত্রবিদ গুণপ্রভ এই বিহারে বসে 'তত্ত্বসন্দেশ শাস্ত্র' লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আরো শতাধিক রচনা আছে। ইনি পর্বত দেশের লোক। প্রথমে মহাযানী ছিলেন। পরে হীনযানী হন। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে দশটি প্রশ্ন নিয়ে সমস্যায় পড়েন। আচার্য গুণপ্রভ তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে স্বর্গে গিয়ে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সাক্ষাতলাভে আগ্রহী হলেন। সেসময় অর্হত দেবসেন অলৌকিক শক্তিবলে প্রায়ই তুষিত স্বর্গে যেতেন। আচার্য গুণপ্রভ অর্হৎ দেবসেনকে

অনুরোধ করেন — তাঁকে তুষিত স্বর্গে নিয়ে যেতে। স্বর্গে গিয়ে অহঙ্কারী গুণপ্রভ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের যথাবিহিত পূজা করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তিনবার স্বর্গে গমন করেও গুণপ্রভ তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করতে পারেননি। এবং অর্হৎ হতে পারেননি।

গুণপ্রভ বিহারের তিন-চার লি দক্ষিণে আরো একটি বিহার আছে। হীনযান মতাবলম্বী দুশ' শ্রমণ সেখানে বাস করে। ওই বিহারে শাস্ত্রগুরু সঙ্ঘভদ্র দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী এবং মহাপণ্ডিত। বিশেষ করে 'সর্বাস্তিবাদীন বিভাষা'য় বিদগ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বিভাষা মতবাদের প্রতিপক্ষে 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' নামে যে মূল্যবান শাস্ত্র রচনা করেন, আচার্য সঙঘমিত্র তার সমুচিত উত্তর দিতে বারো বৎসর পরিশ্রম করে পঁচিশ হাজার শ্লোকে রচনা করেন 'অভিধর্ম-ন্যায়ানুসার' গ্রন্থ। সেই পুঁথি নিয়ে তিনি বসুবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখী আলোচনায় উৎসাহী। বসুবন্ধু তখন চেকার রাজধানী শাকলে। সঙঘমিত্রর আগমনের পূর্বেই বসুবন্ধু শাকল ত্যাগ করেন। এদিকে সঙঘমিত্র মাটিপুর বিহারে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি পত্র লিখে শিষ্যের হাতে দিয়ে যান। পরে আচার্য বসুবন্ধু ঐ পত্র ও গ্রন্থ পাঠ করে শাস্ত্রকার সঙঘভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে যান। মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি সম্মান জানাতে তিনি তাঁর মতের বিরোধিতা থেকে সরে আসেন। আচার্য সঙঘভদ্রের স্মরণে বিহারের উত্তর-পূর্বে আম্রকাননে স্তূপ নির্মিত হয়। হিউয়েন সাঙ সেই স্তূপ বিদ্যমান দেখেন।

সঙ্ঘভদ্র স্তূপের পাশে আচার্য বিমলমিত্রের স্তূপ। ইনিও কাশ্মীরের অধিবাসী সর্বাস্তিবাদী সন্ন্যাসী। ত্রিপিটকে পণ্ডিত। গুণপ্রভ নানা দেশ ভ্রমণ করে সঙ্ঘভদ্র স্তূপে এসে আচার্য লিখিত গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলন। গুরুর অকালমৃত্যুর ফলে সেই চমৎকার গ্রন্থটি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেনি দেখে আরো গ্রন্থ রচনা করে আচার্য বসুবন্ধুর যশহানি করবেন এমনটাই সুপ্ত বাসনা ছিল। কিন্তু এবম্বিধ অনিষ্টকর ভাবনার ফলে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মুখ থেকে পাঁচটি জিহ্বা নির্গত হল আর সর্বদেহ থেকে রক্তপাত হতে লাগল। কুচিন্তার ফলে এমনটা ঘটেছে বুঝে তিনি এক অনুশোচনাপত্র লিখলেন। বন্ধুদের বললেন — 'কখনো মহাযান ধর্মের কুৎসা প্রচার করবে না।' এরপরেই তাঁর মৃত্যু হয়। যেখানে মৃত্যু হয়েছিল, সেখানে তৎক্ষণাৎ মহাগহ্বরের সৃষ্টি হয়।

সেই রাজ্যে গুণপ্রভ-শিষ্য মিত্রসেন নামে নব্বুই বৎসরের এক সন্ন্যাসী বাস করছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর কাছে অর্ধেক বসন্তকাল ও গোটা গ্রীষ্মকাল অধ্যয়ন করেন 'তত্ত্বসন্দেশ শাস্ত্র', 'অভিধর্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র' ও অন্য কয়েকটি সর্বাস্তিবাদী শাস্ত্র।

মতিপুরের উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার পূর্বতটে মো-ইও-লো বা ময়ূর নগর। কুড়ি লি সীমানা নগরের। ঘন লোকবসতি আছে। গঙ্গার কাছে বিশাল দেবমন্দির। তার মধ্যে পুষ্করিণী আছে। খাল খনন করে গঙ্গা থেকে জলপ্রবাহ এনে তাতে ফেলা হয়েছে। এর অন্য নাম গঙ্গাদ্বার। ধর্মার্থসাধন ও পাপমোচনের জন্য এই স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশবিদেশ থেকে জনতার ঢল নামে স্নানের জন্য। পুণ্যার্থী রাজারা পুণ্যশালা নির্মাণ করে বিনামূল্যে অন্ন-ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করে। (এই গঙ্গাদ্বার স্থানটি হরিদ্বার হতে পারে। ময়ূর নগর হতে পারে বর্তমানের মায়াপুর। তবে সঠিকভাবে ঐ স্থাননির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।)

মতিপুর ত্যাগ করে হিউয়েন সাঙ প্রস্থান করলেন ৩০০ লি উত্তরে পো-লো-হিহ্-মো-পু-লো (**ব্রহ্মপুর**) রাজ্যের দিকে। চারদিকে পর্বত-ঘেরা ঐ রাজ্যের সীমানা ৪০০০ লি। রাজধানীর সীমানা কুড়ি লি। জনবসতি যথেষ্ট। উর্বরা জমিতে ফসল জন্মে নিয়মিত। ব্রোঞ্জ ও স্ফটিক পাওয়া যায়। জলবায়ু শীতল। অধিবাসীরা রুক্ষ প্রকৃতির। জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী নয়। উৎসাহ কেবল লাভের কড়িতে। পাঁচটি বিহার থাকলেও বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা নগণ্য। দশটি দেবমন্দির আছে।

ব্রহ্মপুর রাজ্যের উত্তরে তুষারাবৃত পর্বতের মধ্যে সুবর্ণগোত্র রাজ্য। উন্নত মানের সুবর্ণ উৎপন্ন হয় বলে রাজ্যের নামও তাই। শাসনকার্য রানি পরিচালনা করেন। রাজা আছে। পুরুষরা কেবল প্রতিরক্ষা ও কৃষিকাজে যুক্ত।

ব্রহ্মপুরকে পুবদেশের প্রমীলা রাজ্য বলা যায়। সুবর্ণগোত্র রাজ্যের পূর্বদিকে তুফান বা তিব্বত, উত্তরে ইয়োতিয়েন বা খোটান আর পশ্চিমে সন-পো-হো বা সম্পহ্ বা মলস। রাজ্যটির সঠিক অবস্থান নির্ধারিত হয়নি। সম্ভবত গাড়োয়াল-কুমায়ুনের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল হবে তার ঠিকানা। জীবনীকারের মতে তিনি ব্রহ্মপুর থেকে আরো ৪০০ লি পথ দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে রোহিলখণ্ডের পূর্বভাগে অহিচ্ছত্র রাজ্যে যান। তারপর ২০০ লি দূরে দক্ষিণের দিকে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে ভিলসাঁ বা ভিলশাণ রাজ্য। ভিলশাণ হয়ে হিউয়েন সাঙ কপিত্থ যান।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে, মতিপুর থেকে ৪০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে উপনীত হলেন কু-পি-সং-ন (**গোবিসন**) রাজ্যে। গোবিসনের বর্তমান পরিচয় হতে পারে কাশিপুর-রামপুর-পিলভিট অঞ্চল। ২০০০ লি সীমানা রাজ্যের। রাজধানী প্রাকৃতিক সুরক্ষায় সুরক্ষিত। যথেষ্ট লোকবসতি আছে। মানুষজন সৎ, সদাচারপূর্ণ ও শিক্ষাচর্চায় আগ্রহী। অবৌদ্ধ হলেও জীবনের আনন্দসন্ধানে ব্যাপৃত। দুটি বিহার আছে – ভিক্ষুর সংখ্যা শতাধিক। একটি অশোক স্তূপ আছে। আর জু-লাইর কেশ-নখাবশেষ নিয়ে দুটি স্তূপ। ত্রিশটির বেশি দেবমন্দির আছে।

তারপর তিনি ৪০০ লি দূরের ও-হি-ছি-ত-লো বা **অহিচ্ছত্র** রাজ্যে গমন করেন। ৩০০০ লি সীমানা সম্বলিত সেই রাজ্য। সতোরো-আঠারো লি সীমানার রাজধানী পাকৃতিক নিয়মে সুরক্ষিত। মনোরম আবহাওয়া। ঝর্ণা ও সবুজ বৃক্ষলতায় ভরা শষ্যশ্যামল দেশ। অধিবাসীরা সৎ ও বিদ্যানুরাগী। দশটি বিহার আছে – সন্ন্যাসী সহস্রাধিক। তারা হীনযানের

সাম্মিতীয় শাখার। দেবমন্দির আছে ন'টি। ঈশ্বর (শিব) পূজারী তিন শত ভক্ত আছে — পাশুপত শাখার। নাগ সরোবরের কাছে অশোক স্তূপ আছে যেখানে বসে বুদ্ধ সপ্তাহকাল নাগদের ধর্মোপদেশ দিয়েছেন।

অহিচ্ছত্র থেকে ২৬০ লি দক্ষিণে গিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে পি-লো-শন-ন (**ভিলশাণ**) রাজ্যে গমন করেন। রাজ্য ২০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। রাজধানীর সীমানা মাত্র দশ লি। অবস্থান কালি নদীর পশ্চিমে কর্সনা থেকে চার মাইল দূরে ধ্বংসস্তূপ অত্রঞ্জিখেরা নামক স্থানে। আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্য অনেকটা অহিচ্ছত্রের মতোই। দুটি বিহারে তিনশতাধিক হীনযানী সন্ন্যাসী থাকে। দেবমন্দিরের সংখ্যা পাঁচ। রাজধানীর প্রাচীন বিহারে অশোক স্তূপ আছে। রাজধানীতে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারে যে স্তূপ আছে সেখানে বুদ্ধ 'স্কন্ধধাতুস্থান সূত্র' নামের সূত্রটি সপ্তাহকাল ধরে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এমন কোন সূত্র আছে বলে জানা যায় না!

পি-লো-শান-ন থেকে পূর্বদিকে (অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) আরো ২০০ লি দূরত্বে সাংকশ্য বা **কপিত্থ** রাজ্য। চিনা ভাষায় তিনি বলেছেন কাহ্-পি-ত। বর্তমানে এই স্থান উত্তরপ্রদেশের এটোয়া জেলার সংকিশ-বসন্তপুর এলাকা।

প্রাচীন রাজ্যটি ছিল ২০০০ লি সীমানায় বেষ্টিত। রাজধানীর সীমানা কুড়ি লি। আবহাওয়া এবং উৎপন্ন দ্রব্য পিলোশন্নর মতো। চারটি বৌদ্ধবিহারে সহস্রাধিক শ্রমণের বাস। সাম্মিতীয় শাখার সন্ন্যাসী তারা। দশটি দেবমন্দির আছে। ভক্তগণ সকলেই শৈব।

রাজধানী থেকে কুড়ি লি দূরে যে বিশাল বিহার আছে, সেখানে কয়েক শত সাম্মিতীয় শাখার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করে। সঙ্গে কয়েক লক্ষ সাধারণ বৌদ্ধ। বিহার-প্রাঙ্গণে তিনটি সিঁড়ি আছে। কথিত হয়, ভগবান বুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে বসে মাতা মহামায়াকে তিন মাস ধরে ধর্মোপদেশ দান করে জম্বুদ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তিনটি সোপানের মধ্যবর্তীটি স্বর্ণনির্মিত — বুদ্ধ ঐ সোপানপথে অবতরণ করেছিলেন। অন্য দুটি রজত এবং স্ফটিক নির্মিত — তা দিয়ে অবতরণ করেন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র।

কয়েক শতক আগেও নাকি ঐ সোপানাদির অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে রাজন্যবর্গ ইট-পাথরে ও বহুমূল্য রত্নে খোদাই করে ঐ সোপানের স্মৃতি রক্ষা করেছেন। সত্তর ফুট উঁচু সিঁড়ির উপরিভাগে মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে আছে প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। দু'পাশে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি।

মন্দিরের পাশে সম্রাট অশোক নির্মিত সত্তর ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে। উজ্জ্বল বেগুনী রঙের স্তম্ভের উপরে উপবিষ্ট সিংহটি সোপানমুখী। পাশের স্তূপ বুদ্ধের অবগাহনের স্মৃতিবহন করে। সংলগ্ন মন্দিরে ছিল বুদ্ধের সমাধিগৃহ। প্রস্তর নির্মিত সাত ফুট উঁচু যে চত্বর দেখা যায়, বুদ্ধদেব সেখানে পদচারণা করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের চিহ্ন বিদ্যমান।

দু'পাশে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার স্তূপ। এখানেই ভিক্ষুনী উৎপলবর্ণা স্বর্গাবতরণরত বুদ্ধকে প্রথম দর্শনের প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। তার আগেই অবশ্য সুভূতি বুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়। পদচারণা-চত্বর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটি মহাস্তূপ রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বে সরোবর। সরোবরের নাগকুল সেই পবিত্র স্থান রক্ষা করে।

উৎপলবর্ণা অতি সাধারণ ঘরণী থেকে কর্মবলে অর্হৎ হয়েছিল। প্রথম স্বামীর সঙ্গে যখন তার মাতার অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ পায়, উৎপলবর্ণা গৃহত্যাগ করে। পুনর্বিবাহের পরে একদিন তার দ্বিতীয় স্বামী তারই প্রথম পক্ষের ঔরসজাত কন্যাকে উপপত্নী করে ঘরে নিয়ে আসে। জীবনের এরকম বিপর্যয়কারী ঘটনায় ক্ষোভে দুঃখে ভগ্নহৃদয় উৎপলবর্ণা সংসারত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নেয়। ভিক্ষুণী হয়। তারপর প্রবল উৎসাহে ধর্মাচরণ করে ক্রমে অর্হৎ স্তরে উন্নীত হয়।

কপিত্থ দর্শন করে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন কা-নো-কু-শে (কিয়েপোকিওশে বা **কান্যকুব্জ**) রাজ্যে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বে। রাজধানীর নাম ক-নাও-ওয়াই। আমরা জানি কনৌজ নামে। পৌঁছলেন সম্ভবত ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে।

রাজ্যটি ৪০০০ লি পরিসীমা বিশিষ্ট। রাজধানী কুড়ি লি দীর্ঘ এবং চার-পাঁচ লি প্রস্থবিশিষ্ট। পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গানদী। রাজধানীর সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট। সর্বত্র বিস্তৃত বিশালাকার নির্মাণ। নগরে সুন্দর উদ্যানাদি আছে। স্বচ্ছ জলের সরোবরও অনেক। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত সেখানে।

নগরবাসীরা ধনবান। কিছু পরিবার অগাধ বিত্তের অধিকারী। ফুল-ফল প্রচুর জন্মে। যথাযথ ঋতুভেদে বীজবপন ও ফসলসংগ্রহ করা হয়। লোকজনের চেহারা মার্জিত। তারা চাকচিক্যপূর্ণ কৌষেয় (সিল্ক) বস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে। বিদ্যা ও শিল্পকলায় রুচিবোধ সম্পন্ন। কথাবার্তায় স্পষ্টবক্তা ও আলোচনায় অংশগ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়। প্রচলিত-অপ্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা সমান। রাজ্যে শতাধিক বিহার আছে। দশ সহস্রের অধিক সন্ন্যাসীর বসবাস। হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রচর্চা প্রচলিত। দু'শ'র অধিক দেবমন্দির আছে। অবৌদ্ধ সংখ্যাও কয়েক সহস্র।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে দুশ' ফুট উঁচু অশোক নির্মিত স্তূপ যেখানে ভগবান বুদ্ধ সপ্তাহকাল ধর্মপ্রচার করেছিলেন। নিকটস্থ স্তূপ চার অতীত-বুদ্ধের স্মৃতিতে নির্মিত। আরেকটি ক্ষুদ্র স্তূপে বুদ্ধের কেশ-নখাদি সংরক্ষিত আছে। প্রথমোক্ত স্তূপের দক্ষিণে গঙ্গাতটের নিকটে তিনটি বিহার আছে। তিনটিই একই প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষেত্রে অবস্থিত। সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে মন্দিরে। আবাসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গম্ভীর ও শ্রদ্ধার্হ। সহস্রাধিক শ্রমণ নিয়ত নিয়োজিত তাঁদের সেবাকার্যে। বিহারের এক আধারে দেড় ইঞ্চি লম্বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধদন্ত সংরক্ষিত। এক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা দর্শনাগ্রহীর কাছে পদর্শিত হয়।

ছয়-সাত লি দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গার দক্ষিণ তটে আরো একটি স্তূপ দৃশ্যমান। সেটি রয়েছে গঙ্গার দক্ষিণতটে। সম্রাট অশোক নির্মিত দ্বিতীয় স্তূপটিও দুশ' ফুট উঁচু। ভগবান বুদ্ধ সেখানে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন। নগরে আরো অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন আছে। সূর্যদেব ও মহেশ্বরের দারুণ সুন্দর মন্দির আছে। ঝকমকে নীল পাথরের মন্দিরে উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য।

রাজ্যের নাম কন্যাকুব্জ তথা কাণ্যকুব্জ হওয়ার পিছনে আছে এক ইতিকথা।

পুরাকালে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন তখন রাজ্যের নাম ছিল কুসুমপুর। শক্তিশালী সেই রাজার একশ' পুত্র ও একশ' কন্যা ছিল। সেসময় গঙ্গাতীরে এক ঋষি দীর্ঘকাল সমাধিস্থ ছিলেন। বাহ্য চৈতন্যহীন ঋষির দেহের উপর বটবৃক্ষ জন্মাল, বৃদ্ধিলাভ করল, তবু ঋষিবরের চেতনা ফিরল না। তারপর একদিন সমাধিভঙ্গ হলে দেখলেন – নদীতটসংলগ্ন কাননে রাজপুত্রীরা কোলাহলরতা। ঋষি এক রাজপুত্রীর পাণিপ্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোন রাজপুত্রী বিবাহে সম্মত হচ্ছিল না। তখন পিতার ক্লেশ লাঘবের জন্য কনিষ্ঠা কন্যা সম্মতি জানাল। ঋষিবর যখন জ্ঞাত হলেন যে রাজার অন্য কন্যারা তাঁকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তিনি তাদের শাপ দিলেন। সেই শাপে নিরানব্বুই কন্যাই কুব্জা হয়ে গেল। রাজ্যের পরিচয় তদবধি কান্যকুব্জ হল।

হিউয়েন সাঙ যখ ন ভারতভ্রমণে আসেন তখন কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। ইনি বর্ণে বৈশ্য, প্রজানুরঞ্জনে সহৃদয়। তাঁর পিতা প্রভাকরবর্ধন ও অগ্রজভ্রাতা রাজ্যবর্ধন। পূর্বভারতে কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে প্রতিকূল শক্তি মনে করে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। তখন কনৌজের মহামন্ত্রী বাণী (ভণ্ডী) এবং অন্যান্য সহযোগী রাজকর্মচারীরা কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীলাদিত্যকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন। তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অনুমত্যানুসারে রাজপুত্র শীলাদিত্য নামে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন।

শীলাদিত্য পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। পূর্বদিশায় অগ্রসর হয়ে রাজ্যগুলিকে বশীভূত করেন। ছয় বৎসর তুমুল সংগ্রাম করে পঞ্চ ভারতভূমির অধীনতা সুনিশ্চিত করেন। তাঁর সেনাবাহিনী ৬০,০০০ গজারোহী ও এক লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে গঠিত হয়েছিল শত্রুশিবিরকে সংযত রাখতে ও আপন রাজ্য সুরক্ষিত করতে। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি নানা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

হর্ষবর্ধন ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্য সচেতন রাজা ছিলেন। সৎকর্মে নিরত থাকার সময় আহারনিদ্রা পর্যন্ত বিস্মৃত হতেন। রাজ্যে প্রাণীমাংস গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক স্তূপ ও রাজ্য জুড়ে অজস্র ধর্মশালা ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছেন। পাঁচ বৎসর অন্তর মহাসম্মেলনে সমরাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু ধর্মভিক্ষায় দান করতেন।

প্রতি বৎসরে একবার করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাবেশ করতেন এবং একুশ দিন ধরে ধর্মীয় প্রয়োজনে সমস্তপ্রকার দানধ্যান করতেন। রাজপ্রাসাদে প্রতিদিন এক সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু ও পাঁচশ' ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন করতেন। ইনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। তবে সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। শেষজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

হিউয়েন সাঙ ভদ্রবিহারে তিন মাস কাল বাস করেন। তখন আচার্য বীর্যসেনের নিকটে অধ্যয়ন করেন বুদ্ধদাসের 'বিভাষাশাস্ত্র' ও সূর্যবর্মণের 'বিভাষাশাস্ত্র'।

সেবার রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সাক্ষাত হয়নি। সাক্ষাত হয়েছে নালন্দা থেকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সময়। নালন্দা থেকে তিনি তখন কামরূপ হয়ে কনৌজ গিয়েছিলেন। কনৌজ থেকে স্বদেশে। সে বিবরণে পরে ফিরব।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে কান্যকুব্জ থেকে হিউয়েন সাঙ ১০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে না-ফো-তি-পো-কু-লো বা **নবদেবকুল** নগরে গমন করেন।

গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত উক্ত নগরের সীমানা কুড়ি লির উপর। নগরে অপূর্বসুন্দর দেবমন্দির আছে। পাঁচ লি পূর্বে তিনটি বিহার আছে যেখানে শ'পাঁচেক সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধশ্রমণ বাস করে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত দুটি অশোক স্তূপ আছে।

নবদেবকুল থেকে তিনি অযোধ্যার পথে অগ্রসর হলেন।

জীবনীকারের মত অন্যরকম। হিউয়েন সাঙ কনৌজ থেকে ৬০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা পেরিয়ে অযোধ্যা (প্রাচীন নাম সাকেত) রাজ্যে উপনীত হলেন।

৭। অযোধ্যা থেকে মগধ ?

অযোধ্যা - অয়োমুখ - প্রয়াগ - কৌশাম্বী- বিশোক - শ্রাবস্তী - কপিলাবাস্তু - রামগ্রাম - কুশীনগর - বারাণসী - সারনাথ - যুদ্ধপতি - বৈশালী - বৃজি - মগধ - গয়া

চিনা ভাষায় **অযোধ্যা** রাজ্যটির নাম অ-ইউ-তে। সীমান্ত ৫০০০ লি। রাজধানী কুড়ি লির বেশি। প্রচুর শষ্য ও ফুলফল জন্মে। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীদের আচার আচরণ যথোচিত — তারা পরিশ্রমী ও কার্যকরী শিক্ষায় নিয়োজিত। রাজ্যে শতাধিক বিহারে সহস্রাধিক শ্রমণ বসবাস করছে।

রাজধানীর প্রাচীন বিহারে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব নানা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পাশে যে সভাকক্ষের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেখানে তিনি রাজ্যের যুবরাজ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সমক্ষে ধর্মব্যাখ্যা করেছিলেন।

চার-পাঁচ লি উত্তর-পশ্চিমে (উত্তরে ?) বিশাল বিহার আছে। সেখানে সম্রাট অশোক দুশ' ফুট উঁচু স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। ঐ স্থানে ভগবান বুদ্ধ দেব ও মানুষের কাছে তিন মাস ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। চার অতীত-বুদ্ধ এখানে পদচারণা করেছিলেন।

চার-পাঁচ লি পশ্চিমে বুদ্ধাবশেষসহ স্তূপ বিদ্যমান। তার উত্তরে এক প্রাচীন বিহারের চিহ্ন আছে যেখানে সৌত্রান্ত্রিক শাখার আচার্য শিহ্-লি-লো-তো (শ্রীলব্ধ) শাখা-সম্প্রদায়ের জন্য বিভাষা শাস্ত্র রচনা করেন।

ছয়-সাত লি দক্ষিণ-পশ্চিমে এক আম্রকাননে পুরাতন বিহার আছে যেখানে বসে অসঙ্গ পুষা (বোধিসত্ত্ব) শিক্ষালাভ ও বিদ্যাচর্চা করেন। কথিত আছে, ইনি নিশীথ রজনীতে তুষিত স্বর্গে আরোহণ করে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে 'যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র', 'মহাযান-সূত্রালঙ্কার' এবং 'মধ্যান্তবিভাগ শাস্ত্র' শিক্ষা করে দিবাভাগে ধরাতলে নেমে আসতেন। লোকশিক্ষা দানের জন্য। অসঙ্গ ছিলেন গান্ধারের অধিবাসী। বুদ্ধের মহানির্বাণের এক হাজার বৎসর পরে তাঁর আবির্ভাব হয়। প্রথমে ছিলেন মহীশাসক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে মহাযানপন্থী হন।

ঐ আম্রকাননের একশ' কদম দূরে বুদ্ধাবশেষ স্তূপ আছে। পাশের প্রাচীন বিহার বসুবন্ধু পুষার তুষিত স্বর্গ থেকে অবতরণ স্থল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু প্রথমে সর্বাস্তিবাদী, পরে মহাযানপন্থী হয়েছিলেন। উভয়ে সুপণ্ডিত ও সুলেখক। রচনা করেছেন — 'মহাযান-সংগ্রহ শাস্ত্র', 'প্রকরণার্যভাচা শাস্ত্র', 'অভিধর্ম-সমুচ্চয়-ব্যাখ্যা', 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রসিদ্ধি শাস্ত্র' এবং 'অভিধর্ম-কোষ শাস্ত্র'। অযোধ্যা বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের আদিভূমি। এখানকার আরেক পণ্ডিত আচার্যর নাম বুদ্ধসিংহ।

একদা বুদ্ধসিংহ, বসুবন্ধু ও অসঙ্গ এই তিন জ্ঞানীর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে মৃত্যুর পরে যিনি প্রথমে স্বর্গে যাবেন, তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে অন্যদের কাছে নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। বুদ্ধসিংহ ও বসুবন্ধু দুজনেই স্বর্গে গিয়ে প্রথমে চুক্তি ভুলে গিয়েছিলেন। ধরাতলে ফিরে আসেন নি। পরে বসুবন্ধুর পার্থিব চুক্তির কথা মনে পড়ে এবং দেবঋষি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখা করলেন ভ্রাতা অসঙ্গের সঙ্গে।

অসঙ্গবিহার থেকে চল্লিশ লি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন বিহারের মধ্যে স্তূপ আছে। বসুবন্ধুর মহাযান মতের পরিবর্তন হয়েছিল সেখানে। এক অসঙ্গ-শিষ্যের নিকট মহাযান শাস্ত্রের (দশভূমিকাসূত্র) অংশবিশেষ শুনে। এতকাল তিনি যে বিপথচালিত ছিলেন সেই ক্ষোভে নিজেই নিজের রসনা কর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তখন জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে জানান –জিহ্বা না কেটে বরঞ্চ তা নতুন মতবাদের প্রচারে কাজে লাগানো উচিত।

অযোধ্যা থেকে গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাত্রা করলেন অ-ইয়ে-মু-ক (অয়োমুখ) রাজ্যে। স্থানটির প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি।

যাত্রাপথে ভয়ানক ঘটনা ঘটল। জীবনীগ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

চৈনিক পরিব্রাজক যে নৌকায় যাত্রা করেছিলেন তাতে আশিজনের মতো যাত্রী ছিল। একশ' লি চলার পরে নদীতীরে অশোক বৃক্ষের ঘন জঙ্গল দেখা দিল। সহসা দশটি নৌকায় চড়ে দস্যুর দল এসে তাদের ঘিরে ফেলল। তারপর তটভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। যাত্রীগণের সর্বস্ব লুণ্ঠণ তো হলই; তারপর শুরু হল প্রাণ নিয়ে টানাটানি। দস্যুদল ছিল দেবী দুর্গার উপাসক। ফি বৎসর দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া তাদের পূজার অঙ্গ। সেজন্য হৃষ্টপুষ্ট বলি দরকার। তারা বলির জন্য নির্বাচন করল সুদর্শন ও শক্তসমর্থ হিউয়েন সাঙকে। যজ্ঞবেদী নির্মিত হল নদীতটে। বলির অন্য আয়োজনও চলতে লাগল। এমন ভীষণ দুর্বিপাকেও হিউয়েন সাঙ ক্রুদ্ধ হলেন না বা ভয় পেলেন না। নির্বিকার মন নিয়ে ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একবার বললেন – 'এই সামান্য দেহ বলির জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা নেই; তবে আমি দূরদেশ থেকে আগত সন্ন্যাসী, বোধিবৃক্ষ এবং গৃধকূট দর্শনের বাসনা নিয়ে এসেছি; অপূর্ণবাসনার জন্য বলি হিসেবে আমি শুভ কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।'

দস্যুদল এসব কথায় কান দিল না। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বরঞ্চ বিদেশী অতিথির বদলে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। নাছোড়বান্দা দস্যুরা। হিউয়েন সাঙ দস্যুদের বললেন – 'উৎসর্গের জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে কিছু সময় দাও।'

তারপর যজ্ঞবেদীতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে বোধিসত্ত্বদের নাম জপ করতে লাগলেন। প্রথমে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা জানালেন – মৃত্যুর পরে তুষিত স্বর্গে যেন তাঁর দেখা পান; তাঁর নিকট যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র শিক্ষালাভ করে পরজন্মে মর্ত্যলোকে লোকশিক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করবেন। তারপর দশদিকের দেবতাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আবার

একাগ্র চিত্তে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। মনে মনে সুমেরু শৃঙ্গে আরোহণ করলেন; প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গ অতিক্রম করে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের দর্শন লাভ করলেন। তিনি তখন রত্নখচিত আসনে উপবিষ্ট; চতুর্দিকে অন্যান্য দেবকুল তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

এদিকে সফর সঙ্গীরা কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু হিউয়েন সাঙ অবিচলিতচিত্তে উপবিষ্ট। তিনি তখন বাস্তব জগতে নয়, মানসলোকে বিচরণ করছিলেন। সহসা প্রবল ঝড় উঠল। বিশাল বৃক্ষাদি উৎপাটিত হল। বৃক্ষশাখা ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানি দেখা দিল আকাশে। তারপরই বজ্রগর্জন। নদীতে ভাসমান নৌকাখানি উলটে গেল। চারদিকের নানা বিপর্যয় দেখে একজন সাহস সঞ্চয় করে দস্যুদের বলল – 'দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো, ইনি চিনের তাঙ বংশের প্রসিদ্ধ ধার্মিক হিউয়েন সাঙ; এঁকে হত্যা করলে অবশ্যই তোমরা ভগবান বুদ্ধের রোষানলে পড়বে; কেউ নিস্তার পাবে না।'

ঝড়ের আচমকা আঘাতে ডাকাতের দলও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটির কথায় তারা যেন সম্বিত ফিরে পেল। হিউয়েন সাঙকে মুক্ত করে তাঁর চরণতলে পড়ে মিনতি জানল – ক্ষমা করে দিতে। ধ্যানস্থ হিউয়েন সাঙ এসব কাণ্ডকারখানা টের পাননি। দস্যু সর্দার যখন তাঁর চরণ স্পর্শ করে অনুরোধ জানাচ্ছিল, তখন চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন – 'তোমাদের বলির সময় হয়েছে?'

দস্যুরা জানাল – 'না না ভদন্ত, আমরা ভুল করেছি; আপনাকে আহত করার দুরভিসন্ধির জন্য আমরা অনুতপ্ত।'

বৌদ্ধপণ্ডিত তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তারা নদীজলে অস্ত্রত্যাগ করল। সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য যাত্রীদের ফিরিয়ে দিল। এবং পাঁচটি বৌদ্ধ নীতিশিক্ষা গ্রহণ করল। শত দুর্যোগেও এমনভাবে অবিচলিত ও শান্ত থাকতে পারতেন পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ।

অতঃপর নৌকাযোগে গন্তব্যস্থানে যেতে বাঁধা রইল না। পূর্বদিশায় প্রায় ৩০০ লি গিয়ে উত্তরদিকে গঙ্গা অতিক্রম করে **অয়োমুখ** (হয়মুখ?) রাজ্যে উপনীত হলেন। রাজ্যটি ক্ষুদ্র। মাত্র ২৪০০-২৫০০ লি সীমানার। ফসল ও জলবায়ু অযোধ্যার মতো। অধিবাসীরা সরল ও সৎ। পাঁচটি বিহার ও দশটি দেবমন্দির আছে। বিহারে থাকে সহস্রাধিক সাম্মিতীয় শাখার সন্ন্যাসী। দুশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপও ছিল সেখানে। এক প্রস্তর স্তূপে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখকণা সংরক্ষিত। নিকটস্থ বিহারে দুশ' ভিক্ষুর বাস। আচার্য বুদ্ধদাস সেই বিহারে বসে সর্বাস্তিবাদ শাখার শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

অয়োমুখ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৭০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণতীরে অবস্থিত পো-লো-ইয়-ক (**প্রয়াগ**) পৌছলেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্তসলিলা সরস্বতীর মিলনস্থল প্রয়াগ। তিন ধারার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীসঙ্গম। রাজ্যের সীমান্ত ৫০০০ লি দীর্ঘ। রাজধানীর সীমানা বিশ লির অধিক। হিউয়েন সাঙ প্রয়াগরাজ্য, রাজধানী ও অধিবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রাজ্যে দুটি বৌদ্ধবিহার আছে। অল্পসংখ্যক হীনযানীর বাস। শতাধিক দেবমন্দির আছে। অধিকাংশ লোক অবৌদ্ধ। কারুকার্যময় এক প্রখ্যাত মন্দির আছে যেখানে এক কড়ি দান করলেও তা অন্য মন্দিরে পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রাদানের সমান। চত্বরে অবস্থিত অক্ষয় বটবৃক্ষ থেকে জীবন্মুক্তির জন্য ভক্তের আত্মাহুতির প্রচলন আছে – লোকবিশ্বাস সেখানে মৃত্যুর পরে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। নরমাংসের লোভে এক রাক্ষস এখানে বাস করে।

প্রয়াগ নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে চম্পক কাননে সম্রাট অশোক স্তূপ নির্মাণ করেছেন যেখানে বসে তথাগত বুদ্ধ বিধর্মীদের পরাস্ত করেছিলেন। আছে বুদ্ধ-কেশ-নখ সংরক্ষিত স্তূপ। সংলগ্ন প্রাচীন বিহারে দেব বোধিসত্ত্ব 'শত-শাস্ত্র-বৈপুল্য' (কোয়াঙ-পিহ্) রচনা করেছেন। ইনি দক্ষিণ ভারত থেকে আগত। হীনযানের মূলতত্ত্ব ও বিধর্মী মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

নগরের পূর্বে এবং সঙ্গমের পশ্চিমে বালুতটে চৌদ্দ-পনেরো লি পরিসীমা বিশিষ্ট (অন্যমতে, দশ লি প্রশস্ত) যে বৃহৎ প্রান্তর আছে, প্রাচীনকাল থেকে রাজন্যবর্গ ও ধনীব্যক্তিগণ সেখানে দানধ্যান করে থাকেন। তার নাম মহাদানক্ষেত্র। বর্তমান রাজা শীলাদিত্য এই প্রথা অনুসরণ করে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর পঁচাত্তর দিন ধরে মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদের মধ্যে সঞ্চিত ধনসম্পদ বিতরণ করেন।

সঙ্গমে ও মোক্ষক্ষেত্রের পূর্বদিকে স্বর্গাভিলাসী মানুষ স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করত। নদীর মধ্যে একটি উঁচু স্তম্ভ আছে। বিধর্মী সন্ন্যাসীরা সূর্যাস্তের আগে ঐ স্তম্ভে চড়ে এক হাত এক পায়ে আঁকড়ে ধরে। দেহখানি শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার হলে নেমে আসে। তাদের বিশ্বাস – এতে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

হিউয়েন সাঙ ভারতভ্রমণের শেষপর্বে শীলাদিত্যর আতিথ্যে ধর্মমেলায় যোগদান করেছিলেন। তারপর প্রয়াগ থেকে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভরা এক মহারণ্য পড়ল পথে।

প্রায় ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌছলেন বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত নগর ও রাজ্য কিয়াও-শাং-মি (**কৌশাম্বী**)। বর্তমান অবস্থান হয়তো কোশম – প্রয়াগের কাছে। প্রাচীনকালে একে বৎস রাজ্য বলা হত।

রাজ্যটি বৃহৎ – ৬০০০ লি সীমান্ত বিশিষ্ট। রাজধানীও অন্তত ত্রিশ লি সীমানাবেষ্টিত। উর্বর ভূমি। উষ্ণ দেশ। ধান-ইক্ষু জন্মে প্রচুর। অধিবাসীরা উদ্যমী, কলাপ্রেমী ও ধর্মসেবায় আগ্রহী। আচার-ব্যবহারে কঠোর ও রুক্ষ। বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীর রাজা ছিল উদয়ন। সেসময় কৌশাম্বীতে দশটি বিহার ছিল। প্রায় বিনষ্ট ঐ সকল বিহারে তিন শতাধিক হীনযানী ভিক্ষুশ্রমণ বাস করছিল। রাজ্যে ছিল পঞ্চাশের উপর দেবমন্দির। অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অধিক। নগরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভিতরে যে মন্দির আছে, সেখানে ষাট ফুট

উঁচু চন্দনকাঠের অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে। মূর্তির মাথার উপরে প্রস্তর নির্মিত ছত্র। মূর্তিটির নির্মাতা রাজা উদয়ন। কথিত আছে, তথাগত একবার সমগ্র গ্রীষ্মকাল ধরে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে মাতৃদেবীর নিকট ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। তখন দর্শন-ব্যাকুল রাজা উদয়ন মৌদ্‌গল্যায়নপুত্রকে অনুরোধ করেন যেন তিনি এক উত্তম শিল্পীকে স্বর্গে পাঠিয়ে তথাগতের সঠিক আকার-আকৃতি জেনে আসতে যাতে উত্তম বুদ্ধমূর্তি তৈরী করা যায়। সেই মতো তথাগতের উপরোক্ত মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বর্গ থেকে ফিরে এলে কাষ্ঠমূর্তিটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিল।

নগরের দক্ষিণে (দক্ষিণ-পূর্ব?) একটি গৃহের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যেটি কৌশাম্বীর তিন অমাত্যের মধ্যে অগ্রজ অমাত্য ঘোশিলার বাসভবন। এখানে বুদ্ধমন্দির, বুদ্ধের কেশ-নখসম্বলিত স্তূপ ও বুদ্ধ-স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ আছে। অদূরে বর্হিনগরের উদ্যানে অবস্থিত আছে প্রাচীন ঘোশিলারাম। ঐ সঙঘারামে সম্রাট অশোকের স্তূপটি দুশ' ফুট উঁচু। আছে অতীত-বুদ্ধের পদচারণস্থল এবং আরেকটি বুদ্ধ-কেশ-নখের স্তূপ। ঘোশিলারামের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত দ্বিতল ভবনে বসে বসুবন্ধু 'বিজ্ঞাপ্তিমাত্র-সিদ্ধি শাস্ত্র' লিপিবদ্ধ করেন। পূর্বদিকে অবস্থিত আম্রকাননে এক বিনষ্ট ভবনের ভিত্তিমূল দেখা যায় — সেখানে অসঙ্গ পূষা 'প্রকরণার্য্যভাচা শাস্ত্র' রচনা করেছিলেন।

রাজধানী থেকে আট-নয় লি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নাগ-গুহায় বুদ্ধ স্বীয় প্রতিবিম্ব রেখে গিয়েছেন বিষাক্ত নাগকে পরাস্ত করার পর। সেখানে দুশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ, বুদ্ধের শরীরচর্চার স্থান ও বুদ্ধের কেশ-নখের স্মৃতি স্তূপ আছে। এই রাজ্যই নাকি শাক্যমুনি প্রবর্তিত ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। অন্যদেশে শাক্যধর্ম লোপ পেলেও তা এখানে টিকে থাকবে।

পবিত্র নাগ-গুহা দর্শন করে উত্তর-পূর্ব দিকে গতিমুখ হল চৈনিক পরিব্রাজকের। এক মহাবনের মধ্য দিয়ে ৭০০ লি পথপরিক্রমা করে ও গঙ্গা অতিক্রম করে উপনীত হলেন কা-শে-পু-লো (**কাশপুব** বা কাজপুর নগর)। জীবনীকার এই নগরের কথা উল্লেখ করেন নি। আয়তন দশ লি। অধিবাসীরা ধনী। এখানে এক বিহারের ভগ্নাবশেষ আছে যেখানে (আচার্য) ধর্মপাল বিতর্কসভায় অবৌদ্ধ পণ্ডিতকুলকে পরাস্ত করেছিলেন। অশোক স্তূপ আছে ভগ্নদশায় তবু দুশ' ফুট উঁচু।

অনন্তর কোশম অথবা কাশপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন উত্তরে **বিশোক** রাজ্যের দিকে। চিনা ভাষায় রাজ্য ও নগরের নাম পি-শো-ক। পূর্বদিকে কোশম থেকে ৫০০ লি দূরে অবস্থান। অথবা কাশপুর থেকে ১৭০-১৮০ লি উত্তরে। সঠিক অবস্থান জানা যায়নি। তবে আধুনিক লক্ষ্ণৌশহরের উত্তরে গোমতী নদীতটে বিশোক রাজ্য ছিল বলে অনেকের অনুমান। রাজ্যটি ৪০০০ লি সীমান্তে ঘেরা। রাজধানীর সীমানা ষোলো লি। কুড়িটির বেশি বিহারে তিন হাজার ভিক্ষুর বাস। হীনযানী সাম্মিতীয় শাখার চর্চা হয়। দেবমন্দির

আছে পঞ্চাশটি। বিশোকবাসীদের আচার বিচার সুন্দর। তারা পরিশ্রমী ও সৎকর্মে ব্যাপৃত। রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সড়কপথের পূর্বদিকে একদা বিশাল বিহার ছিল। সেখানে অর্হৎ দেবশর্মণ 'বিজ্ঞানকায়পাদ শাস্ত্র' লিখেছিলেন। ইনি সম্ভবত ৪০০ খৃষ্টাব্দের লোক। তাঁর মতে ব্যক্তিরূপ আমি'র অস্তিত্ব নেই। ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে আবার অর্হৎ গোপ লেখনী ধারণ করেছিলেন। এই স্থানে ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব সাত দিনে এক শত হীনযানী পণ্ডিতকে আলোচনায় পরাস্ত করেছিলেন। কথিত আছে, তথাগত এই জেলায় ছয় বৎসরকাল ধর্মপ্রচার করেন।

সন্নিকটে দুশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। পাশে সত্তর ফুট উঁচু যে বৃক্ষটি দেখা যায় সেটি বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত দাঁতন থেকে জন্মেছে। ভ্রমণবৃত্তান্তকার বৃক্ষটিকে সাত ফুট উঁচু বলেছেন।

উত্তর-পূর্ব দিকে ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ এসে পৌঁছলেন নেপালের তরাই এলাকার মধ্য দিয়ে শি-লো-ফা-সি-তি রাজ্যে। শিলোফাসিতি মানে **শ্রাবস্তী**। পালিভাষায় বলা হয় সাবত্থি। বৌদ্ধদের আট তীর্থস্থানের অন্যতম এই নগর। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল কোশল রাজ্য – তার রাজধানী শ্রাবস্তী ছিল অচিরাবতী নদীতীরে। বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরের কাছে সাহেত-মাহেতে। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে চব্বিশ-পঁচিশটি বর্ষাঋতু অতিবাহিত করেছিলেন।

রাজ্যের সীমানা ৬০০০ লি দীর্ঘ। কিন্তু রাজধানীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সেসব ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে হিউয়েন সাঙ ব্যথিত হয়েছেন। একদা এখানে কয়েক শত বিহার ছিল। অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু বসবাস করছে। তারা সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ের। রাজ্যে একশ' দেবমন্দির আছে। অবৌদ্ধদের সংখ্যাই বেশি। শ্রাবস্তীবাসীরা সদাচরণে নিষ্ঠাবান, শিক্ষায় আগ্রহী ও সৎকর্মে উৎসাহী। খাদ্যশষ্যের ফলন খুব ভালো। আবহাওয়া মনোরম।

বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তাঁর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এমনই দুর্দশাগ্রস্ত যে চেনা দুষ্কর। মনে হয় প্রাসাদনগরী কুড়ি লির বেশি দীর্ঘ সীমানাবেষ্টিত ছিল। প্রাসাদের কিছুটা পূর্বদিকে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের জন্য বিশাল সভাগৃহ (সদ্ধর্ম মহাশালা)। সেখানে রয়েছে স্মারক স্তূপ। আরো অনেক স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি স্তূপ বুদ্ধের মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতীর ভিক্ষুনীসঙেঘ যোগদান করা উপলক্ষ্যে। আরেকটি স্তূপ শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্তর বাসভবনের ধ্বংসাবশেষের উপর। তৃতীয়টি অঙ্গুলীমাল যেখানে পূর্বাচরিত ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন সেই জায়গায়। বৌদ্ধকাহিনীতে অঙ্গুলীমালের কথা আছে নানারকমের। হত্যা করে মানুষের আঙ্গুল কেটে মালা তৈরী করতে করতে প্রায় শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছতে

যখন একটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন অঙ্গুলীমাল দেখল, হয় নিজের মা অথবা বুদ্ধের আঙ্গুল কেটে তা পূরণ করতে হয়। কিন্তু তা করা হল না। বুদ্ধের প্রভাবে অঙ্গুলীমাল নৃশংস পূর্বজীবন ত্যাগ করল। অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করে বৌদ্ধসঙেঘ যোগ দিল।

নগর থেকে পাঁচ-ছয় লি দক্ষিণে বিখ্যাত জেতবন — চিনা ভাষ্যে শে-তো। রাজকুমার জেতের প্রমোদ উদ্যান ছিল। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে ক্রয় করেন সেই উদ্যান। বুদ্ধের জন্য বিহার নির্মাণ করতে। সেই অনাথপিণ্ডদারাম ছিল এখানে। হিঁউয়েন সাঙ বলেছেন, প্রসেনজিতের প্রধান অমাত্য সুদত্ত ভগবান বুদ্ধের জন্য মন্দির নির্মাণ করেছিল। অনাথপিণ্ডদের মূল নাম বোধ হয় সুদত্ত । অন্য সূত্র থেকে জানা যায় — জেতবনের বিহারটি একদা বিশালাকার ছিল; ষাটটি বড়ো সভাকক্ষ ও ষাটটি ছোট সভাকক্ষ ছিল; ভিক্ষুদের শয়নঘর, গুহা, প্রার্থনাকক্ষ, অগ্নিশালা, রসদকক্ষ, ধ্যানকক্ষ, চঙক্রমণ স্থান, কূপ, স্নানঘর, পুষ্করিনী কতো কী ছিল। মহাগন্ধকুটি, করোরিমণ্ডলমালা, কৌশাম্বিকুটি, চন্দনমালা ছিল। ভারতভ্রমণরত হিঁউয়েন সাঙ অবশ্য দেখে গেলেন যে সেদিনের মন্দিরবিহার সপ্তম শতকের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জেতবন বিহারের পূর্ব প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দুটি প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে। সত্তর ফুট উঁচু। নির্মাতা সম্রাট অশোক। বাঁদিকের স্তম্ভের উপরে খোদিত ছিল চক্র আর ডানদিকের উপরে ষণ্ডমূর্তি। অধিকাংশ প্রত্নরাজি ভাঙাচোরা। কেবল ইটের তৈরী একটি মন্দিরভবন আছে যেখানে পাঁচ ফুট উঁচু বুদ্ধের এক সোনালি মূর্তি রয়েছে। কোশাম্বির রাজা উদয়ন নির্মিত বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে নির্মিত এই মূর্তিটি।

এক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে সেবা করে করস্পর্শে নীরোগ করেছিলেন বুদ্ধ। অনাথপিণ্ডদ বিহারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত স্তূপটি সেই স্থানে। উত্তর-পশ্চিমে আরেকটি স্তূপ আছে যেখানে মৌদগল্যায়ণ একদিন সারিপুত্রের কটিবন্ধ তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং অনুধাবন করেছিলেন ঋদ্ধির প্রতিতুলনায় প্রজ্ঞা কত উৎকৃষ্ট। কাছেই বুদ্ধ ব্যবহৃত কূপ। আরো অনেক স্তূপ ও বুদ্ধজীবনের নানা স্মারকচিহ্ন ছড়িয়ে আছে ইতস্তত।

জেতবন বিহারের পিছনদিকে কোন এক জায়গায় বিধর্মী ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধের নাম কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে এক গণিকাকে হত্যা করেছিল। আকাশ থেকে দেবতারা সেই চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়। বিহারের পূবদিকে রয়েছে দেবদত্ত-গহ্বর যেখানে বুদ্ধের প্রতি বিষপ্রয়োগের অপচেষ্টা করেছিল বলে দ্রোণোদন-পুত্র দেবদত্তের জীবন্ত নরকগমন হয়। দক্ষিণে অন্য এক গহ্বরে ভিক্ষুনী কোকালিকা (কুলাকী) বুদ্ধনিন্দা করে নরকে পতিত হয়েছিল। এর দক্ষিণে আরেকটি গহ্বরে ব্রাহ্মণকন্যা ছন্দমনা (চণ্ডমনা বা চনশ্চা) পেটে কাঠ বেঁধে মিথ্যা গর্ভবতী সেজে বুদ্ধনিন্দা করে নরকগামিনী হয়। তিনটি গহ্বরই অতলস্পর্শী। বন্যায় এলাকার সমস্ত হ্রদ ও পুষ্করিণী জলে ভরে উঠলেও এই খাতগুলিতে কখনো জল জমে না।

জেতবন বিহারের পূর্বদিকে ষাট-সত্তর পা দূরের বৌদ্ধমন্দিরে রয়েছে পূর্বাভিমুখী উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। বিহারটি ষাট ফুট উঁচু। অতীতে এখানে বসে জু-লাই তীর্থিকদের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তার পূর্বদিকে সমানায়তনে নির্মিত আরেকটি দেবমন্দির রয়েছে। আশ্চর্যের কথা হল – প্রভাতসূর্যের আলোয় ঐ দেবমন্দিরের ছায়া কখনো বৌদ্ধমন্দিরকে ঢেকে রাখতে পারে না, কিন্তু অপরাহ্নের সূর্যালোকে বৌদ্ধমন্দিরের ছায়া দেবমন্দিরটি ঢেকে রাখে।

ছায়াদানকারী ঐ মন্দিরের তিন-চার লি দূরে সারিপুত্র যেখানে বসে ছয় তীর্থিকদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন সেখানে রয়েছে একটি স্তূপ। তার পাশেই আরেকটি মন্দির ও স্তূপ আছে। এখানে বুদ্ধ প্রবল বিতর্কে শ্রাবস্তীর তীর্থিকদের পরাস্ত করে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিশাখামাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের জীবনকাহিনীতে যে আটটি মহাস্তূপের কথা বলা হয়, এটি তারই মধ্যে একটি।

ঐ স্তূপের দক্ষিণে পথের উপর এক নিষ্পত্র মৃত বৃক্ষতলে বসেছিলেন বুদ্ধদেব – প্রতিহিংসার বশে কোশলরাজ বিড়ুড়ক (বিরূঢ়ক বা বিড়ুড়ভ)-কে শাক্যরাজ্য আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত করার উদ্দেশে। একদা দাসীপুত্র বলে শাক্যরা তাকে বিদ্রূপ করেছিল – তার প্রতিশোধ নিতে শাক্যরাজ্য আক্রমণ করতে গিয়েছিল কোশলরাজ। তারই স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সেখানে। কাছেই আরেক জায়গায় স্তূপ নির্মিত হয়েছে পাঁচশত শাক্য নারীর বলিদানের স্মৃতিতে। কোশলরাজ বিড়ুড়ক ঐ শাক্য রমণীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল কেননা তারা কোশলরাজের অন্তপুরবাসিনী হতে অস্বীকার করেছিল।

অনতিদূরে আছে এক শুষ্ক সরোবর। সেখানে রাজা বিড়ুড়কের মৃত্যু হয়। শাক্যরমণীদের হত্যা করার পরে বুদ্ধ বলেছিলেন – সাতদিনের মধ্যে ঘাতক রাজার অগ্নিদাহে মৃত্যু হবে। একদিন ঐ সরোবরে প্রমোদবিহারে এসেছিলেন রাজা বিড়ুড়ক। সেখানে প্রমোদতরণীতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়।

জেতবন বিহারের তিন-চার লি উত্তর-পশ্চিমে আপ্তনেত্রবন বা অন্ধবন। রাজা প্রসেনজিৎ পাঁচশ' দস্যুর লুঠতরাজে বিরক্ত হয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলে রেখেছিল। তাদের করুণ কান্নায় বিগলিত হয়ে বুদ্ধ তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। সেখানে বুদ্ধের শরীরচর্চার স্থান, অর্হৎদের সমাধি ইত্যাদি বিবিধ নিদর্শন রয়েছে।

রাজধানী থেকে ষাট লি উত্তর-পশ্চিমে যে নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে সেটি ভদ্রকল্পকালের কাশ্যপ বুদ্ধের পিতার নগর ছিল। মনুষ্যজীবন তখন বিশ হাজার বৎসর দীর্ঘ ছিল। তার দক্ষিণে বুদ্ধত্ব লাভের পরে পিতা শুদ্ধোদনের সঙ্গে বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাতের স্থান। ঐ ঘটনার স্মরণে স্তূপ আছে।

কাছেই কাশ্যপ বুদ্ধের সমাধির উপর রয়েছে আরেকটি স্তূপ। উভয়ের নির্মাতা সম্রাট অশোক।

(এত বিহার স্তূপ স্মারক ইত্যাদি দর্শন করেছেন হিউয়েন সাঙ কিন্তু উল্লেখ করে যাননি অচিরাবতী নদীর কথা, সুন্দরিকা নদীর কথা, মিগারমাতা বিশাখার পূর্বারামের কথা কিংবা চৈত্যগিরি-সালারগিরির কথা। সেসবের কি কোন অস্তিত্ব ছিল না তখন?)

তীর্থ দর্শনার্থী চিনা অতিথির পরবর্তী গন্তব্যস্থল বুদ্ধের জন্মভূমি কিয়ে-পিলো-ফ-স্‌সে-তি বা **কপিলাবাস্তু**। জীবনীকারের মতে কপিলাবাস্তুর দূরত্ব ৮০০ লি আর ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে ৫০০ লি। অভিমুখ দক্ষিণ-পূর্বে।

কপিলাবাস্তু রাজ্যের সীমানা ৪০০০ লি। দশটির বেশি নগর আছে রাজ্যে – সবই অতি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়। দীর্ঘকাল ধরে পরিত্যক্ত – জনবসতি নেই বললেই চলে। রাজধানী নগরের সীমানা ছিল দশ থেকে পনেরো লি। একদা এখানে সহস্রাধিক বিহার ছিল। বর্তমানে সবই ভগ্নদশায়। হিউয়েন সাঙ দেখলেন, রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ বিহারে জনা ত্রিশেক ভিক্ষু বাস করছে। তারা সাম্মিতীয় শাখার ভিক্ষু। দেবমন্দির রয়েছে দুটি।

প্রাচীন রাজধানীর সবই বিধ্বস্ত পড়ে আছে। কেবল রাজা শুদ্ধোদনের প্রাসাদের ভিতটুকু মাত্র রয়েছে – তার উপর মন্দির আছে এবং সেখানে রাজার মূর্তি রয়েছে। উত্তরদিকে রানি মহামায়ার শয়নমহল। সেখানেও প্রাচীন ভিতের উপর মন্দির আছে – মন্দিরে রানির মূর্তি। পাশের আরেকটি মন্দির সূচিত করছে শাক্য বোধিসত্ত্বের মাতৃজঠরে প্রবেশপর্ব। স্থবিরবাদীদের মতে বোধিসত্ত্বের গর্ভাধান ঘটেছে উত্তরাষাঢ় মাসের ত্রিশ তারিখ রাতে। অন্যমতে ঐ মাসের তেইশ তারিখে। উত্তর-পূর্বে একটি অশোকস্তূপ নির্দেশ করছে যুবরাজ সম্পর্কে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। এমনি ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত আরো কত প্রাচীন স্বাক্ষর। স্তূপ ও মন্দিরে কত স্মৃতিমন্থনের স্থান।

দক্ষিণদ্বারের কাছে রচিত স্তূপটি শাক্য যুবকদের সঙ্গে সিদ্ধার্থর ক্রীড়াস্থান হিসেবে চিহ্নিত। এক জায়গায় হাতিখাত (হস্তিগর্ত) রয়েছে – পাশের মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি। স্তূপের পাশে প্রাসাদের এক প্রান্ত – সেখানে যশোধরার শয়নমহল ছিল। সংলগ্ন মন্দিরে যশোধরা ও পুত্র রাহুলের মূর্তি দেখা যাচ্ছে। কাছেই বুদ্ধের বিদ্যালয়কক্ষ। নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় একটি মন্দির আছে। সেখান থেকে যুবরাজ সিদ্ধার্থ অশ্বারোহণে নগর-প্রাকার লম্ফ দিয়ে পার করেছিলেন। সংলগ্ন মন্দিরে তাঁর শ্বেত অশ্বে আরূঢ় মূর্তি। চার ফটকের বাইরে একটি করে বিহার আছে।

নগর থেকে পঞ্চাশ লি দক্ষিণে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেখানে একটি স্তূপ আছে। অতীত-বুদ্ধ কা-লো-কা-সুন-তে (ক্রকছুন্দ বা ক্রকুছন্দ বা কাকুসন্দ) – তাঁর জন্মস্থান। প্রাচীন নগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্তূপে বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত। সামনে অশোক নির্মিত ত্রিশ ফুট উঁচু প্রস্তরস্তম্ভ – শীর্ষে খোদিত সিংহ। প্রাচীন নগর থেকে ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে আরেকটি নগরের স্বাক্ষর আছে – সেখানে স্তূপ রয়েছে অতীত-বুদ্ধ ক-নো-ক-মউ-নি (কনকমুনি)-র জন্মস্থানে।

কপিলাবাস্তু থেকে চল্লিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে যে স্তূপ রয়েছে সেটি হলকর্ষণ উৎসবে কর্মরত কৃষকদের দেখে সিদ্ধার্থর প্রথম ধ্যানমগ্ন হওয়ার স্থান। পিতা শুদ্ধোদন পুত্রের সেই সমাধিস্থ রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। উত্তর-পূর্বে এক জায়গায় অনেকগুলি স্তূপ আছে – রাজা বিডুড়ক অনেক শাক্য যুবককে সেখানে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। ঐ স্তূপের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরো চারটি স্তূপ বিদ্যমান – সেখানে চারজন শাক্যযুবা রাজা বিডুড়কের সেনাশিবির আক্রমণ করে কোশলরাজাকে প্রতিহত করেছিল। পরে ঐ চার শাক্যযুবককে আবার শাক্যসমাজ নির্বাসিত করে কেননা তারা অন্যায় যুদ্ধে রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তারপর ঐ নির্বাসিত শাক্যরা উদয়ন, বামিয়ান, হিমতলা ও সাঙমি দেশে নতুন রাজবংশ স্থাপন করে।

একদা রাজা প্রসেনজিৎ কোন শাক্য কন্যার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। বংশমর্যাদায় উচ্চ বলে শাক্যরা রাজার সঙ্গে শাক্যকুলকন্যার বিবাহ দিতে রাজি ছিল না। তখন শাক্যপ্রধান মহানাম দাসীর ঔরসে জাত কন্যা (বাসবক্‌খত্তি য়া)-র সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের বিবাহ দেন। প্রসেনজিতের ঐ দাসীর পুত্র বিডুড়ক। একবার মাতুলালয়ে বেড়াতে এসেছিল। শাক্য যুবকেরা তখন হীনকুলে জন্ম বলে বিডুড়ককে অপদস্থ করে। কোশলের রাজা হয়ে রুষ্ট বিডুড়ক সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে শাক্যরাজ্য আক্রমণ করে ও নানাবিধ নৃশংস ঘটনা ঘটায়।

কপিলাবাস্তুর তিন-চার লি দক্ষিণে নি-কু-লু বন। নিকুলু মানে ন্যগ্রোধ (বট)। সেই বটবৃক্ষের বনে অশোক নির্মিত স্তূপ রয়েছে যেখানে বুদ্ধ বোধিলাভের পরে আকাশপথে জন্মভূমিতে আগমন করেন। অপেক্ষারত পিতার সঙ্গে বুদ্ধের সেখানে প্রথম সাক্ষাত হয়। তারপর শোভাযাত্রা করে নিকুলু বিহারে গমন করেন। অনতিদূরে আরেকটি স্তূপ আছে – সেখানে বুদ্ধ তাঁর মাতৃস্বসার (মহাপ্রজাপতি) হাত থেকে স্বর্ণখচিত সন্ন্যাসবেশ (সঙঘাতি) গ্রহণ করেছিলেন। পাশের স্তূপটি আট শাক্য যুবরাজ ও পাঁচশ' শাক্য বংশীয় যুবকের সঙেঘ যোগদানের স্মৃতিতে নির্মিত।

নগরের পূর্বদ্বারের ভিতরের দিকে যুবরাজ সর্বার্থসিদ্ধর (সিদ্ধার্থ) বিবিধ কর্মসাধন স্থলে নির্মিত হয়েছে স্তূপ। দ্বারের বাইরে ঈশ্বরদেবের মন্দির। ইনি সম্ভবত শাক্যদের রক্ষাকর্তা এক যক্ষ – শাক্যবর্ধন। মতান্তরে মহেশ্বর। মন্দিরে প্রস্তরমূর্তি আছে ঐ দেবতার। নিচ থেকে উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে। জন্মের পরে রাজাদেশে কুমার সিদ্ধার্থকে এই মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। রাজকুমারকে দেখে ঐ প্রস্তরমূর্তি উঠে প্রণাম জানিয়েছিল।

দক্ষিণদ্বারের বাইরে একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছে যেখানে শাক্য সিদ্ধার্থ ক্রীড়াস্থলে শরনিক্ষেপ করেছিলেন – সেই শর লৌহপিপা ভেদ করে বত্রিশ লি দূরে গিয়ে ভূমি বিদ্ধ করেছিল। অমনি সেখানে এক ঝর্ণা নির্গত হল। আর তার নাম হয়ে গেল শরকূপ।

শরকূপ থেকে আশি-নব্বুই লি দূরে উত্তর-পূর্বদিকে ল-ফ-নি (**লুম্বিনী**) উদ্যান। শাক্যদের সুন্দর সরোবর আছে সেই উদ্যানে। চব্বিশ কদম দূরে রয়েছে প্রাচীন অশোক বৃক্ষ — ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুতলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে — জন্মেই সাত পদক্ষেপে চলেছিলেন নবজাতক এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে ফুট উঠেছিল একটি করে পদ্ম। নিকটে পূবদিকে অশোক নির্মিত স্তূপটি তারই স্মারক।

আশেপাশে আরো অনেক স্তূপ নানা স্মৃতিস্বাক্ষর বহন করছে। বুদ্ধের জন্মের পরে দুটি নাগ আবির্ভূত হয়ে দুটি ঝর্ণার সৃষ্টি করেছিল। সেখানে নাগস্তূপ আছে। ইন্দ্র নবজাতককে গ্রহণ করেছিলেন। তার স্মরণে রয়েছে ইন্দ্রস্তূপ। পাশে চারটি স্তূপ রয়েছে চার দেবরাজের স্মরণে — তাঁরা শিশু শাক্যসিংহের ভার নিয়েছিল। কাছেই অশোক নির্মিত শীলাস্তম্ভ — তার শীর্ষদেশে স্থাপিত অশ্বমূর্তি। শীলাস্তম্ভটি দুষ্ট নাগের বজ্রসংহারে অর্ধভগ্ন — ভাঙা অংশটি ভূমিতলে শায়িত; কাছে তৈলাক্ত জলের একটি ঝর্ণা আছে। বুদ্ধের জন্মের পরে দেবতারা এই ঝর্ণা সৃষ্টি করেন যাতে বুদ্ধমাতা নবজাত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় তেল-জল পেতে পারেন।

সম্রাট অশোক রাজ্যকালের বিংশতি বৎসরে সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে নিয়ে লুম্বিনী এসেছিলেন ও পবিত্র অশোকতরুর পূজা করেছিলেন। তারপর সেখানে স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করে একটি অনুশাসন লিখে যান। সৌভাগ্যবান লুম্বিনী-গামবাসীদের রাজকর দেওয়া থেকে মুক্ত করে দেন। গোরক্ষপুরের উত্তরে তরাই অঞ্চলে নিগলিভের অদূরে পাদেরিয়া গ্রামে অশোকের অনুশাসনলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুণ্যতীর্থ কপিলাবাস্তু-লুম্বিনী দর্শন করে পূর্বদিকে ২০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌঁছলেন গভীর বনে। তারপর লান-মো (রাম বা **রামগ্রাম**) রাজ্যে। জীবনীকারের মতে তিনি ৫০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

রামগ্রাম জনবিরল পরিত্যক্ত এলাকা। নগরও প্রায় ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীন নগরীর পূর্বদিকে একশ' ফুট উঁচু ইটের স্তূপ রয়েছে। পরিনির্বাণের পরে এ রাজ্যের রাজা বুদ্ধের দেহভস্মের একাংশ পেয়েছিলেন। তার উপর স্তূপ নির্মিত হয়েছে। স্তূপ থেকে মাঝেমাঝে উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হয়। পাশে নাগ সরোবর। কখনো কখনো সরোবর থেকে নাগেরা উঠে এসে স্তূপ প্রদক্ষিণ করে। বন্যহস্তী সদলবলে এসে স্তূপে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে।

নিকটে শ্রমণের বিহার। ঐ বিহারের মোহন্ত একজন শ্রমণের (অদীক্ষিত বৌদ্ধভিক্ষু)। একদা জনৈক সন্ন্যাসী দেখেন যে বন্যহস্তী এক পরিত্যক্ত স্তূপ পরিষ্কার করে ফুল ও জল দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করছে। দৃশ্যটি দেখে তাঁর মনে হয় — একটি পশু যা পারে মানুষ হয়েও সে তা পারে নি! তদবধি সন্ন্যাসী ঐ স্তূপের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে থেকে যায়। গ্রামবাসীদের অর্থসাহায্যে সেখানে বিহার নির্মিত হয়। আর ঐ সন্ন্যাসী শ্রমণের হল তার মোহন্ত। বিহারের নামও হয়ে গেল শ্রমণের বিহার।

শ্রমণের বিহার থেকে পূর্বদিকে একশ' লি দূরে অগ্রসর হয়ে হিউয়েন সাঙ আরেক বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে এক মহাস্তূপ নির্মাণ করে গিয়েছেন মহামতী অশোক। মধ্যরাতে গৃহত্যাগ করে এক জায়গায় যুবরাজ সিদ্ধার্থ মুকুট থেকে রত্নাদি খুলে ফেলে ছন্দককে দিয়ে প্রাসাদে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন – 'এখানে আমি কারামুক্ত হলাম, শৃঙ্খল মোচন করলাম ও শেষবারের মতো জোয়ালমুক্ত হলাম।'

এর পূবদিকে এক মৃত জম্বুবৃক্ষের পাশে আরেকটি ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। সেখানে তিনি রাজবেশ বদল করে এক কিরাতের কাছ থেকে মৃগচর্ম নিয়ে দেহে ধারণ করেছিলেন। সেই কিরাত ছিল ছদ্মবেশী ইন্দ্র। সন্নিকটে আরেকটি স্তূপের কাছে তিনি মস্তকমুণ্ডন করেছিলেন। যুবরাজ সিদ্ধার্থ কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে – কেউ বলেন উনিশ, কেউ বলেন উনত্রিশ বৎসর বয়সে। সেদিনটি ছিল বৈশাখের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিন; নয়তো পঞ্চদশ দিন।

মস্তক-মুণ্ডন স্তূপ থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বন্য রাজ্য। চলতে চলতে ১৮০ লি দূরে পড়ল বটবৃক্ষের বন। সেখানে বুদ্ধের চিতাভস্মের উপর একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। ত্রিশ ফুট উঁচু। বুদ্ধের পূতাস্থি আট ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে তারা অঙ্গারভস্ম ব্যতীত আর কোন স্মারক নিদর্শন পায়নি। সেই ভস্মের উপরই তারা স্তূপ নির্মাণ করে। অঙ্গারভস্ম স্তূপের কাছে প্রাচীন বিহারের মধ্যে অতীত-বুদ্ধেরও নিদর্শন আছে। বিহারের দুপাশে অনেক স্তূপের মধ্যে একটি স্তূপ ছিল অশোক নির্মিত। বিনষ্ট হলেও তার উচ্চতা তখনো ছিল একশ' ফুট।

সম্ভবত ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ অঙ্গারভস্ম স্তূপ থেকে কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্তর-পূর্ব দিকে। পথ অপ্রশস্ত ও বিপদাপন্ন। বন্যপ্রাণীসঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। দস্যুডাকাত ও শিকারীর দল ওৎ পেতে আছে পথে পথে। লুণ্ঠন ও হত্যার জন্য।

সেসব নির্মিঘ্নে পার হয়ে এসে পৌছলেন কৌ-শিহ্-ন-ক-লো। অর্থাৎ **কুশীনগর** – বুদ্ধের মহানির্বাণ স্থানে। পৌছে দেখলেন নগর-পাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত। গ্রাম ও নগর সবই প্রায় পরিত্যক্ত। প্রাচীন রাজধানী তথা নগরের ইটের ভিত ছড়িয়ে আছে দশ লি সীমানা জুড়ে। অতি সামান্য জনবসতি আছে। চারদিকটাই বন্য পতিত স্থান।

রাজধানীর উত্তর-পূর্ব কোনার দিকে অশোক-স্তূপটি রয়েছে কর্মকার চুন-তে বা চুন্দের ভবনে। চত্বরের ভিতরে যে কূপ রয়েছে, সেই কূপ থেকে বুদ্ধ ও তাঁর সঙ্গীরা জলপান করেছিল। পরিব্রাজক সেই কূপটি দেখলেন। মহানির্বাণের পথে পা বাড়িয়ে ভগবান বুদ্ধ চুন্দের ভবনে আহার গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর উত্তর-পশ্চিমে তিন-চার লি দূরে অজিতবতী নদী পার হয়ে শালবনে প্রবেশ করেন। ভারতের শালবৃক্ষ অনেকটা চিনদেশের ওক গাছের মতো – সবুজ-সাদা বাকল আর খুব উজ্জ্বল

পাতা। মল্লদের সেই শালবনে তথাগত অন্তিমশয্যায় শয়ন করেছিলেন দুঃখক্লেশে জর্জর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে।

তথাগত যেখানে নির্বাণলাভ করেছিলেন, সেখানে সমান উচ্চতায় চারটি শালবৃক্ষ তখনো দণ্ডায়মান রয়েছে দেখলেন। ইটের তৈরী বিরাট মন্দিরচৈত্যে তথাগত বুদ্ধের মহানির্বাণ মূর্তি আছে – উত্তরশয়ানে শায়িত তাঁর মস্তক। পাশে বিশাল অশোক স্তূপটি পড়ে আছে ভগ্নদশায়। তখনো দুশ' ফুট উঁচু ছিল। স্তূপের সামনে শীলাস্তম্ভ – স্তম্ভগাত্রের লিপিতে সম্রাট অশোক খোদাই করে গিয়েছেন বুদ্ধের মহানির্বাণের কথা। আশি বৎসর জীবনযাপন করে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চদশ দিনে নির্বাণলাভ করেন তিনি। স্থবিরবাদী মতে কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিনে। তবে তা কতদিন আগে তা নিয়ে নানা মত – কেউ বলেন নয়শ' বৎসর, কেউ বলেন এক হাজার। আবার কারো মতে বারোশ' তেরশ' অথবা পনেরোশ' বৎসর। (আমরা ইতিহাসে পাই ১১২০ থেকে ১১২৩ বৎসর। চিনদেশে ভগবান বুদ্ধকে আরো প্রাচীনকালের বলে গণ্য করা হয়।)

মল্লদের সেই শালবনে আরো অনেক স্তূপ রয়েছে – যেমন মৃগজাতক স্তূপ ও বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্রর সমাধি স্তূপ। সমাধিস্তূপের কাছে এক জায়গায় বজ্রপাণি দেব গুহ্যপদী-মল্ল বুদ্ধের নির্বাণলাভের পরে মূর্ছিত হয়ে আকাশ থেকে পতিত হয়েছিলেন। সেই স্তূপের কাছে নির্বাণোত্তর বুদ্ধের প্রতি দেবগণের সপ্তাহকাল ধরে পূজা নিবেদনের স্মারক-স্তূপ রয়েছে।

হিউয়েন সাঙ ভ্রমণবৃত্তান্তে বলেছেন – জু-লাইর অন্তিমকালে সর্বত্র উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সকলেই দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিচলিত ছিল। তারা বলাবলি করছিল – মহাজ্ঞানী প্রভুর অন্তিমকাল সমাগত; জাগতিক ধর্মীয় সদগুণ সমাপ্তপ্রায় এবং জগত সম্পদহীন হতে চলেছে।

তখন দক্ষিণ পার্শ্বে শায়িত বুদ্ধ বললেন – 'একথা বোলো না যে জু-লাই অন্তিম বিলুপ্তির দিকে; তাঁর আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব সদা বিরাজমান; তোমরা আলস্য ত্যাগ করে নির্বাণের জন্য সুসময়ের সন্ধান করো।'

তথাপি সমবেত ভিক্ষুর দলে ক্রন্দনরোল উঠলে অনিরুদ্ধ তাদের তিরস্কার করেছিল। দেহান্ত হলে মল্লরা শবাধার নিয়ে গিয়ে সংস্কারকার্য করতে চাইলে অনিরুদ্ধ সপ্তাহকাল দেহটিকে দেবতাদের অর্চনার জন্য রেখে দিতে বলেছিল। যেখানে সুবর্ণ শবাধারটি ছিল, সেখানে একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। সেখানে বসে মাতা মহামায়া পুত্রশোকে শোকার্ত হয়েছিলেন। আর বুদ্ধ শবাধার থেকে জাগ্রত হয়ে মাতৃদেবীকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। যেখানে বসে তিনি হাত বাড়িয়ে আনন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, সেখানে একটি স্তূপ রয়েছে। যেখানে দেহান্তের পরে বুদ্ধ

শবাধার থেকে চরণদ্বয় বার করে শোকার্ত প্রিয়শিষ্য মহাকাশ্যপকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ দিয়েছিলেন, সেখানেও স্তূপ নির্মিত হয়েছে।

নগরের উত্তরে তিনশ' কদমের কিছু বেশি দূরত্বে নদীর অন্যতীরে সুগন্ধী কাষ্ঠে বুদ্ধের দাহসংস্কার হয়েছিল। সেখানে স্মারক স্তূপ আছে। দহনস্থলের মাটি তখনও ছিল হলদেটে কালো রঙের, ভস্ম ও কাঠকয়লায় মেশা। পূর্ণ শ্রদ্ধাসহ কেউ প্রার্থনা জানালে এখনও বুঝি সেখানে কোন-না-কোন স্মারক নিদর্শন পেতে পারে।

তাঁর শবাধার সাত প্রকার মহামূল্য দ্রব্যে নির্মিত হয়েছিল। পূতদেহ সহস্র সূতীবস্ত্রে আবৃত করা হয়েছিল। পুষ্প, ধূপ, পতাকা, ছত্র সহকারে মল্লরা শবাধার বহন করে হিরণ্যবতী নদী অতিক্রম করে উত্তর তীরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর সুগন্ধী তৈল ও সুগন্ধী কাষ্ঠে অগ্নিসংস্কার করা হয়েছিল। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হলেও কেশ ও নখ দগ্ধ হয়নি। অগ্নিসংস্কারের পরে মল্লরা পূত দেহাবশেষের ভাগ দিতে অস্বীকার করলে সমবেত আট নৃপতিদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হয়। তারপর ব্রাহ্মণ চিহ-সিঙের মধ্যস্থতায় পূতাস্থি আট ভাগে ভাগ করে বিতরণ করা হয়। যেখানে আটজন রাজা বুদ্ধের দেহাবশেষের অংশ ভাগ করে নিয়েছিলেন, সেখানেও একটি অশোকস্তূপ নির্মিত হয়েছে। একটি প্রস্তর স্তম্ভও আছে সেখানে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০০ লি দূরের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুনিবাস তৈরী করে অতিথি সেবা করত। একদিন এক বৃদ্ধ শ্রমণের দেখা পেয়ে তাঁকে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করল এবং তাঁকে পায়সান্ন সেবা করতে দিল। শ্রমণ সামান্য আহার করে এবং রাত্রিবাস না করেই বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। কাতর ব্রাহ্মণকে ভিক্ষু তখন বলেছিলেন – 'তথাগত যখন বেঁচে ছিলেন আমি তাঁর শিষ্যত্ব নিই। তুমি যে পায়সান্ন দিয়েছ তা সুস্বাদু হলেও পুরোনো দিনের মিঠে জলের মতোও নয়। কারণ দেবতা ও মানুষের পুণ্যবল ক্ষীণতর হয়ে গেছে।' একথা জানিয়ে অদৃশ্য হলেন। শুধু বলে গেলেন যে তিনিই তথাগত পুত্র রাহুল। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ গৃহে রাহুলের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করল।

কুশীনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করে হিউয়েন সাঙ আরেকটি বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পৌঁছে গেলেন পো-লো-না-সে (**বারাণসী**) রাজ্যে। কুশীনগর থেকে দূরত্ব ৫০০ লি (৭০০লি?)। ৪০০০ লি সীমানা ঐ রাজ্যের। গঙ্গাতীরে অবস্থিত রাজধানী দৈর্ঘ্যে দশ লি আর প্রস্থে পাঁচ-ছয় লি।

জনবসতি ঘন। অধিবাসীরা মহাসম্পদশালী। তাদের বাসভবন দুর্লভ রত্নাদি ভরা। লোকজন নম্র, সদাচারী ও বিদ্যাচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অধিকাংশই অন্য ধর্মে বিশ্বাসী। অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ আছে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। ফসল হয় প্রচুর। ফল ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি প্রচুর আছে। ত্রিশটি বিহার বর্তমান। সকলেই প্রায় সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ের (হীনযান সর্বাস্তিবাদী?) তিন হাজার (দু হাজার?) বৌদ্ধভিক্ষুর বসবাস। দেবমন্দিরের

সংখ্যা শতাধিক ও ভক্ত দশ হাজারের উপর। তার মধ্যে অধিকাংশ শৈব। ভক্তবৃন্দ কেউ মুণ্ডিত মস্তক, কারো চুড়া-বাঁধা কেশ, কেউ নগ্ন, আবার কেউ বা ভস্মাবৃত। তারা ইহজীবন থেকে মুক্তির সন্ধানে রত।

রাজধানীতেই কুড়িটি দেবমন্দির আছে। কাংস্যনির্মিত এক দেবমূর্তি (শিব ?) আছে প্রায় একশ' ফুট উঁচু – জীবন্ত মূর্তিটি দর্শকের কাছে শ্রদ্ধা মিশ্রিত মহাবিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। রাজধানীর উত্তর-পূর্বে পো-লো-ন (বরণা) নদীর পশ্চিমে শতাধিক ফুট উচ্চতার অশোক স্তূপ দণ্ডায়মান। স্তূপের সামনে মসৃণ সবুজ পাথরের স্তম্ভ – আয়নার মতো সেই মসৃণতায় বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি যেন সদা দৃশ্যমান।

বারাণসী থেকে গঙ্গা অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ উত্তর-পূর্ব (উত্তর ?) দিকে দশ লি পথ পরিক্রমা করে এসে উপনীত হলেন 'লু-ঈ' বা মৃগদাব বিহারে। অর্থাৎ **সারনাথ**। দেখলেন বিহারের উঁচু চত্বর এবং সভাগৃহ দীর্ঘ করিডোর দিয়ে সংযুক্ত। বিহারের আটটি ভাগ একই প্রাচীরে বেষ্টিত। সেখানে বসবাসরত দেড় হাজার বৌদ্ধভিক্ষু। সকলেই হীনযানী সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ের।

প্রধান বেষ্টনীর মধ্যে একশ' (দু'শত ?) ফুট উঁচু মন্দির আছে। মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও একশত সিঁড়ি সবই শীলানির্মিত। শীর্ষে আম্র বৃক্ষের গিলটি করা অলঙ্করণ আছে। (তদর্থ সম্ভবত মন্দির-মস্তকে আমলক-স্থাপত্য ছিল।) ইষ্টকনির্মিত শতাধিক কুলুঙ্গী শ্রেনী রয়েছে আর সেখানে অর্ধোৎকীর্ণ রিলিফে বুদ্ধের স্বর্ণমণ্ডিত জীবন্ত মূর্তি শোভিত। চিত্রে তিনি ধর্মপ্রচাররত। গর্ভগৃহে আছে ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় কাংস্যনির্মিত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বুদ্ধমূর্তি।

প্রধান বুদ্ধমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিধ্বস্তপ্রায় প্রাচীন অশোকস্তূপ – ভূমির উপর তখনও শতাধিক ফুট উচ্চতায়। সামনে সত্তর ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভটিও অশোক নির্মিত – মরকতের মতো নরম ও তীব্র উজ্জ্বল স্তম্ভ। অবস্থান ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রবর্তন স্থলে। নিকটে যে স্তূপ রয়েছে সেটি অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য ও তাঁর চার সহচরের ধ্যানস্থল।

আরো কিছু স্তূপ রয়েছে। সেসব পূর্বজন্মের নানা কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। মৈত্রেয় বুদ্ধ একদা শাক্যমুনি বুদ্ধের কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিলেন যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। তার স্মরণে নির্মিত একটি স্তূপ আছে। আরেকটি স্তূপ কাশ্যপ বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী প্রদানের স্থান নির্দেশ করছে। পাশে রয়েছে চার অতীত-বুদ্ধের পদচারণার জন্য পঞ্চাশ কদম (পাঁচশ' ফুট ?) দীর্ঘ ও সাত ফুট উঁচু নীল রঙের প্রস্তরখণ্ড।

মন্দিরের পশ্চিমে তথাগতর স্নানের সরোবর এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্র-চীবর প্রক্ষালনের জন্য ব্যবহৃত সরোবর। মোট তিনটি সরোবর আছে। দৈব নাগেরা সেসব রক্ষা করছে। নিকটস্থ স্তূপ স্মরণ করাচ্ছে – ছদন্তবিশিষ্ট হস্তী হিসেবে বুদ্ধ পূর্বজন্মে ওখানে বসে সমস্ত দাঁত জনৈক শিকারীকে দান করেছিলেন। আছে তিত্তির জাতক স্তূপ, নিগ্রোধ

জাতক স্তূপ। আর কৌণ্ডিণ্য ও পঞ্চশিষ্যকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন যেখানে, সেই স্থানেও স্মারক নির্মিত রয়েছে। তিনশ' ফুট উঁচু স্তূপটি প্রশস্ত ভিতের উপর স্থাপিত – অলঙ্কৃত হয়েছে নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যে। স্তূপটিতে মূর্তি স্থাপনের জন্য কুলুঙ্গী নেই। উপরে গম্বুজ আছে, তার উপর শিখর; সেখানে গোলাকার ঘন্টা নেই। (হিউয়েন সাঙ কি আসলে ধামেখ স্তূপের কথা বললেন? মনে হচ্ছে যেন তাই।)

সারনাথ দর্শন করে গঙ্গার প্রবাহপথ অনুসরণ করে ৩০০ লি পূর্বদিকে এগিয়ে হিউয়েন সাঙ। পৌঁছলেন চ্যান-চু বা গর্জপুর বা **যুদ্ধপতি** নামক রাজ্যে। (এমন রাজ্যটি যে কোথায় তা কে জানে! কেউ বলেছেন – আধুনিক ঘারিপুরে ছিল।)

রাজ্যের সীমান্ত ২০০০ লি। গঙ্গাতটবর্তী রাজধানী দশ লির মতো সীমানা সম্বলিত। জনবসতি ঘন। জলবায়ু মনোরম, জমি উর্বরা। অধিবাসীরা সৎ ও উদ্যমী। দশটির বেশি সঙঘারাম আছে – বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা সহস্রাধিক। কুড়িটি দেবমন্দির আছে। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে অশোক স্তূপ আছে – সেটি বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের স্থান।

রাজধানী থেকে ২০০ লি পূর্বে অ-পি-তে-ক-ল-ন (অবিদ্ধকর্ণ) সঙঘারাম। তোখারার তীর্থযাত্রীদের জন্য এই সঙঘারাম নির্মিত হয়েছিল। সঙঘারাম থেকে ১০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে মো-হ-শো-লো বা মহাশাল নগর যার সমস্ত নাগরিকবৃন্দ ব্রাহ্মণ। কোন বৌদ্ধ নেই। গঙ্গার উত্তরে নারায়ণ মন্দির। আরো ত্রিশ লি পূর্বে একটি অর্ধপ্রোথিত অশোক স্তূপ আছে। স্তূপের সামনে একটি সিংহশীর্ষ প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের মরুদানব বশের বিবরণ লিপি খোদিত আছে।

দক্ষিণ-পূর্বে ১০০ লি পথদূরত্বে রয়েছে কুম্ভস্তূপের ধ্বংসাবশেষ যার সামান্য অংশ মাটির উপরে দাঁড়িয়ে। নির্বাণের পরে বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে যখন রাজন্যবর্গ প্রায় যুদ্ধের মুখোমুখি, তখন এক ব্রাহ্মণ কুম্ভপাত্রে দেহাবশেষ পরিমাপ করে ভাগ করে দিয়েছিল। ওই ব্রাহ্মণ পাত্রের ভিতরের দিকে মধু মাখিয়ে রেখেছিল। পাত্রের গায়ে তাই কিছুটা দেহাবশেষ লেগে ছিল। ভাগাভাগি শেষ হয়ে গেলে ব্রাহ্মণ পাত্রটি নিয়ে চলে যায়। তারপর দেশে ফিরে সেই পাত্রে-লেগে-থাকা দেহাবশেষের উপর স্তূপ (দ্রোণস্তূপ) নির্মাণ করে। কলস সহ। পরে সম্রাট অশোক স্তূপ থেকে দেহাবশেষ বার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ স্তূপের উপর এক বিশাল স্তূপও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

অতঃপর পরিব্রাজক অগ্রসর হলেন উত্তর-পূর্ব দিশায়। ১৪০ থেকে ১৫০ লি দূরত্বে গঙ্গা পেরিয়ে এলেন ফেই-শে-লি বা **বৈশালী** রাজ্যে। একদা এখানে লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। প্রাচীন বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক, বৃজি, উগ্র, ভোগ, ঐক্ষবাকু ও কৌরব এই আটটি জাতির মিলিত শক্তির মধ্যে লিচ্ছবিরাই ছিল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

লিচ্ছবি রাজ্যের সীমানা ৫০০০ লি। উর্বরা জমি। প্রচুর আম্রকানন ও কদলীবন আছে। রাজধানীর চূড়ান্ত ভগ্নদশা। পুরোনো নগর-ভিতের পরিসীমা ষাট থেকে সত্তর

লি। প্রাসাদনগরীর সীমানা চার-পাঁচ লি। সামান্য কিছু বসতি আছে বর্তমানে সেসব 'রাজা বিশালকা গড়' নামে পরিচিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল। রাজ্যের মানুষ সৎ, সৎকর্মে উৎসাহী, বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ উভয় ধর্ম মেনে চলে। অতীতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল শতাধিক – সবই ভেঙেচুরে গিয়েছে। তিন-চারটি টিকে আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি নগণ্য। গোটা দশেক দেবমন্দির আছে। নানা সম্প্রদায়ের লোকজন বাস করে – তার মধ্যে দিগম্বরদের সংখ্যা বেশি।

প্রাসাদ-নগরী থেকে পাঁচ-ছয় লি উত্তর-পশ্চিমে বিহার আছে। সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা সেখানে বাস করে। পাশের স্তূপটি নির্দেশ করছে যে বুদ্ধদেব ওই স্থান থেকে 'বিমলকীর্তি সূত্র' প্রচার করেছিলেন এবং গৃহকর্তার পুত্র পাও-চি (রত্নাকর) তাঁকে ছত্রদান করেছিল। (অবশ্য বুদ্ধ নিজে সূত্রটি প্রচার করেছেন না বিমলকীর্তি, প্রশ্ন আছে।) বিহারের পূর্বদিকে সারিপুত্র এবং অন্যান্যদের অর্হত্ব প্রাপ্তির স্তূপ।

দক্ষিণ-পূর্বে বুদ্ধের পূতাবশেষের উপর বৈশালীরাজার নির্মিত স্তূপ। পরে সম্রাট অশোক ঐ স্তূপ থেকে পূতাস্থির শতকরা নব্বুই ভাগ উদ্ধার করে আরো স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে অশোক স্তূপ ও শীলাস্তম্ভ আছে। স্তম্ভটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু – শীর্ষে সিংহ বিরাজমান। (বর্তমানে রাজা বিশালকা গড়ের উত্তরে কোলৌতে সিংহমূর্তিযুক্ত স্তম্ভ ও অশোক-শিলালিপি দেখা যায়।)

শীলাস্তম্ভের দক্ষিণে রয়েছে বুদ্ধের জন্য নির্মিত মর্কট-হ্রদ। সেখানে বুদ্ধদেবের থাকার জন্য কূটাগারশালা ছিল। একবার বানরেরা বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গাছের উপরে চড়ে বসেছিল। হ্রদের পশ্চিম স্তূপটি সেখানে। দক্ষিণ স্তূপটি বানরদের মধু দানের জায়গা।

পূর্বদিকে বৌদ্ধবিহার থেকে তিন-চার লি দূরে বিমলকীর্তির বাসভবনের ধ্বংসস্তূপ। সেখানে রয়েছে একটি স্তূপ। অদূরে যে প্রস্তরকক্ষ আছে, সেখানে বিমলকীর্তি অসুস্থ হওয়ার ভাণ করেছিল। কাছেই রত্নাকরের ভবনের স্তূপ। পাশে বৈশালীর নটী আম্রপালীর বাসভবনের জায়গায় আরেকটি স্তূপ রয়েছে। সেখানে বসে বুদ্ধের পালিতা মাতা মহা-প্রজাপতি ও আরো অনেক ভিক্ষুনী নির্বাণে (সঙেঘ) প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

তিন-চার লি উত্তরে যে স্তূপটি রয়েছে সেখান থেকে জু-লাই শেষবারের মতো কুশীনগর প্রস্থানের আগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দেবতা ও অন্যান্যরা। স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো তিনি বৈশালীর দিকে তাকিয়েছিলেন।

শেষদর্শন-স্তূপের দক্ষিণে বৌদ্ধমন্দির ও তার সামনে স্তূপ আছে। এই স্থানই সেদিনের আম্রপালী-উদ্যান যা বুদ্ধের চরণে নিবেদিত হয়েছিল। আম্রকাননের এক প্রান্তে স্তূপ আছে। সেখানে বুদ্ধ মার-রাজার সঙ্গে কথা বলে স্থির করেন – তাঁর নির্বাণকাল সমাসন্ন। মারের প্রভাবে আনন্দ এমনই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, আর কিছুদিন ধরাতলে ভগবান বুদ্ধ জীবনধারণ করুন, এই অনুরোধটুকু পর্যন্ত জানাতে পারেন নি।

কাছে বহুপুত্রক চৈত্য, সহস্র বুদ্ধ চৈত্য ও সহস্র প্রত্যেক-বুদ্ধ চৈত্য।

নগর থেকে পঞ্চাশ-ষাট লি উত্তর-পশ্চিমে যে মহাস্তূপ আছে, সেখান থেকে বুদ্ধ কুশীনারা যাত্রাকালে লিচ্ছবিদের অনুগমন করতে নিষেধ করেছিলেন। প্রবল স্রোতসম্পন্ন নদী তৈরী করে লিচ্ছবিদের বাধ্য করেছিলেন ফিরে যেতে। স্মৃতি হিসেবে তিনি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি লিচ্ছবিদের দান করে যান।

বৈশালী থেকে চৌদ্দ-পনেরো লি দক্ষিণ-পূর্বে একটি মহাস্তূপ আছে। সেখানে বালিকারামে সাতশত খ্যাতিমান বৌদ্ধপণ্ডিত সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতির আয়োজন করেছিল। এ ঘটনা ঘটে মহাপরিনির্বাণের একশ' দশ বৎসর পরে। যে পাঁচজন অর্হৎ সমাবেশের কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা হলেন কোশলের যশোদ (যশ), মথুরার সম্ভোধ, কনৌজের রেবত, বৈশালীর শাল্য ও পাটলিপুত্রের পূজাসুমেরু। সকলেই আনন্দের শিষ্য। (যাদের নাম হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেন নি, তাঁরা হলেন বৈশালীর অর্হৎ সব্বকামী, সুমন, বাসভাগামিক ও দশবল।) বিরোধের ক্ষেত্র ছিল বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুদের দ্বারা উত্থাপিত দশটি প্রশ্ন। সঙ্গীতিতে বিনয়-গর্হিত আচার বিচারের আলোচনা করে মীমাংসার চেষ্টা করা হয় ও সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৈশালীর সাতশ'পণ্ডিতের সঙ্গীতি-স্তূপ থেকে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেন। গঙ্গা অতিক্রম করে ৮০-৯০ লি (১০০ লি?) চলার পরে এলেন শি-ফেই-তো-পু-লো বা **শ্বেতপুব** সঙঘারামে। জীবনীকার বলেছেন, তিনি বৈশালীর দক্ষিণ থেকে শ্বেতপুর নগরে গিয়েছেন।

সঙঘারামটি দ্বিতল ভবনে – রৌদ্রকরোজ্জ্বল বারান্দা ও বর্ণোজ্জ্বল সভাকক্ষে সাজানো। আবাসিক বৌদ্ধরা মহাযানপন্থী – তারা জীবনযাপনে নিয়মানুগ। সেখান থেকে তিনি 'বোধিসত্ত্ব পিটক' সংগ্রহ করলেন। তারপর অগ্রসর হলেন মগধ রাজ্যের দিকে।

পথে দর্শন করেন আনন্দ পরিনির্বাণ স্তূপ। শ্বেতপুরা বিহার থেকে ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গাতীরে দুটি স্তূপ রয়েছে। সেই দুটিই আনন্দের পরিনির্বাণ স্থল নামে চিহ্নিত। আনন্দের অর্ধাংশ মগধে ও অপরার্ধ বৈশালীর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল বলে দুটি পরিনির্বাণ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। (আনন্দ ছিল জু-লাইর তুতো ভাই যিনি অনেক কিছু শ্রবণ করেছেন এবং স্মরণে রেখেছিলেন। মহাকাশ্যপের পরে সঙঘপ্রধান হয়েছিলেন তিনিই।)

তারপর চিনা পরিব্রাজক উত্তর-পূর্বে ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে গেলেন ফু-লি-চিহ বা বৃজি। রাজ্যটি ৪০০০ লি সীমান্ত বিশিষ্ট। উর্বর দেশ। প্রচুর ফল-ফুল জন্মে। আবহাওয়া ঠাণ্ডার দিকে। অধিবাসীরা কোপনস্বভাব। বিহার ও দেবমন্দির আছে। ত্রিশ ফুট উঁচু একটি স্তূপও আছে। বৌদ্ধরা সংখ্যায় কম – হাজার খানেক হবে। গোটা দশেক বিহার ও অশোকস্তূপ আছে। দেবমন্দিরের সংখ্যাও দশ কিন্তু অনুগামীর সংখ্যা অনেক।

বৃজি থেকে ১৪০০/ ১৫০০ লি পার্বত্য পথ পেরিয়ে নি-পো-লো বা নেপাল রাজ্য। ৪০০০ লি সীমানা। রাজধানী কুড়ি লি। এখানকার এক রাজার নাম ছিল অংশুবর্মন। রাজ্যটি তিব্বতের অধীন। নেপালীরা রুক্ষ, কপট, আস্থা-বিশ্বাস-ন্যায়পরতার প্রতি উদাসীন। শিক্ষা নেই তবে তারা কুশলী যন্ত্রবিদ। চেহারায় কুদর্শন ও স্থূলরুচিসম্পন্ন। বৌদ্ধমন্দির ও অন্য ধর্মের মন্দিরের পাশাপাশি অবস্থান সেখানে।

(বৈশালী থেকে হিউয়েন সাঙ সোজাসুজি মগধ যাত্রা করেছিলেন না শ্বেতপুরা বিহার, বৃজিরাজ্য ও নেপাল ভ্রমণ করে বৈশালী প্রত্যাগমন করে তারপর মগধ গিয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। বৈশালী থেকে মগধের রাজগৃহের দূরত্ব মাত্র দেড়শ' লি। তবে তিনি নেপাল গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।)

মগধ রাজ্যের সীমান্ত ৫০০০ লি দৈর্ঘ্য নিয়ে। মাগধীরা জ্ঞানপিপাসু। পাণ্ডিত্যকে সম্মাণ জানাতে জানে। রাজ্যে পঞ্চাশটির বেশি বিহার আছে; দশ হাজার ভিক্ষুশ্রমণ বসবাস করছে। অধিকাংশই মহাযানপন্থী। নদীর দক্ষিণ তটে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে যার সীমানা ৭০ লির মতো। নগরে কিছুমাত্র আর দর্শনীয় অবস্থায় নেই, কেবল নগরপ্রাকারের ভিতটুকু অবশিষ্ট আছে।

পুরাকালে যখন মানুষের অনেক বৎসর পরমায়ু ছিল তখন এই নগরের নাম ছিল কুসুমপুর; তখন রাজপুরীতে অনেক কুসুম প্রস্ফুটিত থাকত। পরে মানবজীবন কয়েক সহস্র বৎসর পরমায়ু সম্পন্ন হল আর তখন রাজধানীর নাম হল পাটলীপুত্র। পাটলী বৃক্ষ থেকে ঐ নামকরণ। বুদ্ধের মহানির্বাণের শত বৎসর পরে বিম্বিসারের প্রপৌত্র (?) সম্রাট অশোক রাজগৃহ থেকে মগধে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। (পরিব্রাজকের এই তথ্যটি ভুল।) সেসব বহু প্রাচীনকালের কথা। তখন কয়েক শত বিহার ছিল মগধে। সেখানে মাত্র দু-তিনটি বিহার মাত্র রয়েছে দেখা গেল।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী এলাকায় কয়েক সহস্র পরিবার বসবাস করছিল। রাজপুরীর উত্তরে কয়েক দশ ফুট উঁচু প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ঐখানে সম্রাট অশোকের কারাগার ছিল। লোকে বলত, অশোকের নরক। কারাপ্রধান চণ্ডগিরির কাছে নির্দেশ ছিল – ওই নরক থেকে যেন জীবন্ত কেউ না ফেরে। একদিন সম্রাট কারাপরিদর্শনে এসেছেন, আর কী আশ্চর্য, তার উপরেও ঐ বিধি প্রযুক্ত হল। তখন সম্রাট পূর্বাগত কারাপ্রধানের উপর একই বিধি প্রয়োগ করে তা পালনের নির্দেশ দেন। এরপর থেকে নরকের কারাবিধি লঘু করা হল। পরে ঐ কারাগার ভেঙে ফেলা হল। অর্হৎ উপগুপ্তের নিকট অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ সাতদিন পাটলীপুত্র নগরে বাস করে পুণ্যস্থান সকল দর্শন করলেন। ঐ নরকের দক্ষিণে যে স্তূপ ছিল সেখানে তথাগতের পূতাবশেষ সুরক্ষিত আছে। তা থেকে দৈব আলোক নির্গত হয়। স্তূপের নিচের অংশ ভূগর্ভে প্রোথিত; শুধু উপরের

গম্বুজ দৃশ্যমান। নিকটস্থ মন্দিরে যে প্রস্তরখণ্ড রয়েছে সেখানে বুদ্ধদেব একদা চরণ রেখেছিলেন। পদচিহ্ন তখনও সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। এক ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ ও ছয় ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট সেই চিহ্নের গোড়ালির দিকে চক্র ও দশাঙ্গুলিতে স্বস্তিক, ফুলদানী, মৎস্য এবং অন্যান্য নানা চিহ্ন বর্তমান ছিল। ঐ প্রস্তরখণ্ডে দাঁড়িয়ে তিনি আনন্দকে বলেছিলেন – 'এখান থেকে বজ্রাসন ও রাজগৃহের দিকে শেষবারের মতো দেখা আমার।'

মন্দিরের উত্তরে ত্রিশ ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভে শিলালিপি খোদিত – 'রাজা অশোক বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙঘকে তিনবার জম্বুদ্বীপ দান করেন এবং তিনবার মহামূল্য বস্তু দিয়ে মুক্ত করেন।' পুরোনো প্রাসাদের উত্তরে সম্রাট ভ্রাতা মহেন্দ্রর জন্য নির্মাণ করেছিলেন বিশাল পাহাড়ের মতো দেখতে প্রস্তর-গৃহ (গুহা?)। হিউয়েন সাঙ দর্শন করলেন – বুদ্ধের জন্য প্রস্তরনির্মিত ভোজনাধার, উপগুপ্তের জন্য নির্মিত দশটি গুহা, বুদ্ধাবশেষ নিয়ে গড়া পঞ্চ মহাস্তূপ (প্রবাদানুসারে নন্দরাজার গুপ্তধনাগার?), সম্রাট অশোকের অন্তিম জীবনের সঙ্গে জড়িত আমলক কাহিনী নিয়ে রচিত আমলক-চৈত্য।

আমলক-স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে এক প্রাচীন সঙঘারামের ভিতরে ছিল ঘন্টাচৈত্য। একদা নগরে শতাধিক সঙঘারাম ছিল। জ্ঞানীগুণী ভিক্ষুরা থাকতেন। বিপক্ষে তীর্থিকদল আলোচনায় এঁটে উঠতে না পেরে চুপচাপ থাকত। এক সময় বৌদ্ধধর্মের পতন হল। তীর্থিকের দল সরব হল। তারা তর্কযুদ্ধে স্বল্পজ্ঞানী বৌদ্ধদের পরাস্ত করে নতুন রাজবিধির প্রবর্তন করল। বিজ্ঞাপিত হল যে বৌদ্ধ সঙঘারামে ঘন্টা বাজানো নিষিদ্ধ। এ ঘটনার বারো বছর পরে আচার্য নাগার্জুনের শিষ্য আচার্য দেব নামক পণ্ডিত এসে তীর্থিকদের শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত করেন। ঐ ঘটনার স্মরণে মগধরাজা একটি চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। আরেক জায়গায় ব্রাহ্মণ কুটির ছিল যার প্রাচীন ভিতটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে – দুষ্টাত্মা-চালিত ঐ ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত অশ্বঘোষ তর্কে পরাস্ত করেছিলেন।

প্রাচীন নগরের দক্ষিণ-পূর্বে কু-কু-টা বা কুক্কুটরাম বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর রয়েছে। নির্মাতা রাজা অশোক। মহারাজ অশোক বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরে এক সহস্র অর্হৎ ও সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করে কুক্কুটরাম বিহারে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন এবং বিহারের জন্য প্রয়োজনীয় চার প্রকার সামগ্রী দান করেছিলেন।

প্রাচীন বিহার থেকে ১০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে তি-লো-শি-ক (তিলোদক) বিহার। চারটি মহাকক্ষ নিয়ে ত্রিতল সভামণ্ড আছে। উঁচু উঁচু ছাদ। বিশাল সঙঘারামটির নির্মাতা রাজা বিম্বিসারের অধস্তন কোন রাজা। সামনের রাস্তায় তিনটি বিহার। ত্রিশ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে তারা বোধিসত্ত্ব ও অবলোকিতেশ্বরের মন্দির আছে ঐ তিন বিহারে। অনেক ত্রিপিটক-বিশারদ ভিক্ষু বাস করেন। বাসিন্দা হাজার খানেক। সকলেই মহাযানী। চৈনিক পণ্ডিতের আগমনসংবাদ শুনে তাঁরা সদলবলে সাক্ষাত করতে এলেন। তিলোশিক থেকে ৯০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড় দেবর্ষিগণের বিচরণক্ষেত্র। ঘন জঙ্গল বিষাক্ত

সর্পাদিতে ভরা। শীর্ষে সমতল পাথরের উপর চৈত্য আছে। একদা বুদ্ধ সেখানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পাহাড় থেকে ত্রিশ লি উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালে বিহার আছে। পঞ্চাশজন মহাযানী বাস করে। গুণমতি বোধিসত্ত্বের সম্মাণে ঐ বিহার নির্মিত হয়েছিল। তিনি সাংখ্যপণ্ডিত ও মহাবৈদ্য মাধবকে পরাস্ত করেছিলেন।

গুণমতি বিহার থেকে কুড়ি লি দক্ষিণ-পশ্চিমে এক বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে শাস্ত্রগুরু শীলভদ্র নির্মিত সঙঘারাম আছে। পাহাড়ের শীর্ষ চৈত্যের মতো বলে সেখানে তিনি বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত করেছিলেন। আচার্য শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ – রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাচর্চায় তাঁর গভীর রুচি ছিল। দেশভ্রমণ করে নানা জ্ঞানীগুণীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। অবশেষে নালন্দায় আচার্য ধর্মপালের নিকট তাঁর ভিক্ষুত্বলাভ হয়। একবার দক্ষিণ ভারত থেকে এক উদ্ধত পণ্ডিত মগধে আসেন ধর্মপালের সঙ্গে আলোচনার জন্য। গুরুর অনুমতিক্রমে ত্রিশ বৎসরের শীলভদ্র ঐ ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাজিত করেন। উপস্থিত রাজা তখন শীলভদ্রকে একটি নগর পুরস্কার দিতে চান। শীলভদ্র বলেন – 'কাষায় বস্ত্র পরিহিত সঙঘজীবন নিয়েই আমি তৃপ্ত, নগর নিয়ে কি হবে?'

রাজা বলেন – 'ধর্মের মহারাজ গত হয়েছেন, জ্ঞানতরণী নিমগ্ন হয়েছে, জনগণের স্বীকৃতি ব্যতীত কোন কিছুই শিষ্যদের উদ্দীপ্ত করতে পারে না; তাই বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অনুগ্রহ করে এই দান গ্রহণ করুন।'

শীলভদ্র সেই নগরে সঙঘারামটি নির্মাণ করলেন।

শীলভদ্র সঙঘারাম থেকে ৪০-৫০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হলেন। নৈরঞ্জনা নদী অতিক্রম করে উপনীত হলেন গয়া। নগরে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস। তারা মহান ঋষিকুল থেকে উদ্ভূত ও রাজানুশাসন থেকে মুক্ত। নগরের ত্রিশ লি উত্তরে স্বচ্ছ ও পবিত্র জলের ঝর্ণা আছে। পাঁচ-ছয় লি দক্ষিণ-পশ্চিমে গয়া পাহাড়ের গভীর খাদ ও উত্তুঙ্গ শিখর। ভারতবাসীর নিকট এটি ধর্ম-পাহাড় হিসেবে গণ্য। প্রাচীনকাল থেকে স্বাধীন রাজন্যবর্গ যারা দেশেদশে সুশাসন কায়েম করে যশোলাভ করেছেন, তারাও ঐ পাহাড়ে চড়ে কৃতকর্ম অকপটে স্বীকার করে নেয়। শিখরে সম্রাট অশোক চৈত্য নির্মাণ করেছেন কেননা সেখানে ভগবান বুদ্ধ অনেক সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে 'রত্নমেঘসূত্র' উদ্ধার করেছিলেন।

গয়া পাহাড় থেকে সামান্য দূরে কাশ্যপের দেশ। সেখানে একটি চৈত্য আছে। ইনি উরুবিল্ল কাশ্যপ নামে পরিচিত। ঐ স্তূপের দক্ষিণে গয়া কাশ্যপ ও নদী কাশ্যপের নামেও দুটি স্তূপ আছে। আরো পূর্বদিকে এগিয়ে পাগবোধি পাহাড়। একদা বুদ্ধ এই পাহাড়ে ধ্যানসমাধিতে বসেছিলেন। পরে দেবতাদের নির্দেশে চৌদ্দ-পনেরো লি দূরে অবস্থিত বোধিবৃক্ষতলে গমন করেন। অতীত-বুদ্ধগণ সেখানে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভবিষ্যবুদ্ধগণও ঐ বজ্রাসনে বসে সিদ্ধিলাভ করবেন।

৮। বুদ্ধগয়া - রাজগৃহ - নালন্দা

জীবনীকারের মতে হিউয়েন সাঙ তিলোশিক বিহার থেকে আরো দক্ষিণ দিকে ১০০ লি পথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন বোধিবৃক্ষের ছত্রছায়ায়। বুদ্ধগয়া বা বোধগয়ায়। সময়কাল ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছেন দীর্ঘ আট বৎসর হল। দর্শন করে ধন্য হয়েছেন বুদ্ধের জন্মস্থান ও মহাপরিনির্বাণস্থল। আরো কত স্থান। বুদ্ধগয়া বুদ্ধের বোধিলাভের স্থান। সেখানে রয়েছে বোধিবৃক্ষ, মহাবোধি মন্দির ও অন্যান্য বৌদ্ধ নিদর্শন। অবস্থান বিষ্ণুতীর্থ গয়া থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। এক অর্থে মহামানব বুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আবার বিষ্ণুর অবতার হিসেবে হিন্দু দেবসম্প্রদায়ের একজন।

হিউয়েন সাঙ বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে পৌঁছে দেখলেন – সমগ্র চত্বরটি ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। উঁচু ও পোক্ত প্রাকার। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে হ্রস্ব। পূবদিকে প্রধানদ্বার নিরঞ্জনা নদীর দিকে মুখ করে। চত্বরের পরিসীমা পাঁচশ' কদম হবে। দুর্লভ বৃক্ষরাজি ও সুপরিচিত কুসুমে স্থানটি আচ্ছাদিত। মসৃণ ঘাস ও অদ্ভুত সব লতাগুল্ম সবকিছু ঢেকে রেখেছে।

প্রধানদ্বার পূর্বদিকে – যেদিকে নৈরঞ্জনা নদী রয়েছে। দক্ষিণদ্বার বিশাল কুসুমশোভিত সরোবরের দিকে। পশ্চিমদিকে খাড়া উচ্চভূমি রয়েছে প্রাকৃতিক সুরক্ষায়। উত্তরদ্বার দিয়ে প্রাকারবেষ্টিত স্থানের মধ্যে অবস্থিত বিশাল বিহারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ভিতরে পবিত্র নিদর্শনাদি খুব কাছাকাছি ভিড় করে আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ, উচ্চপদাধিকারী ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ অনেকানেক স্তূপ-চৈত্য ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করেছেন।

পরিবেষ্টনীর মধ্যভাগে যে বজ্রাসন আছে তিন সহস্র মহাজগতের মধ্যমণি হয়ে, তা ভদ্রকল্পের শুরু থেকে বিদ্যমান। অত্যন্ত কঠিন ও অবিনাশী আর সর্বাত্মক ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন বজ্র এর উপাদান। বজ্রাসনের পরিসীমা একশত কদম থেকে বেশি। বোধিলাভের স্থানটি বোধিমণ্ড নামে খ্যাত – পৃথিবী কম্পিত হলেও বোধিমণ্ড অবিচল থাকে। কালে কালে মানুষের ধর্মবোধ হ্রাস পেয়েছে। তাই তারা বোধিবৃক্ষে এসেও বজ্রাসনের দর্শন পায় না।

নির্বাণের পরে নানা দেশের নৃপতিকুল দুটি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি ঐ আসনের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্বদিকে মুখ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনপ্রবাদ, ঐ মূর্তি যেদিন মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিপ্রাপ্ত হবে, সেদিন বৌদ্ধধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। হিউয়েন সাঙ দেখেছেন, দক্ষিণস্থ মূর্তিটি বক্ষপঞ্জর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ রয়েছে।

বজ্রাসনের নিকটস্থ বোধিবৃক্ষ আসলে পিপ্পলী বৃক্ষ। বুদ্ধের সময় কয়েক শত ফুট উঁচু ছিল। দুষ্ট রাজাদের হাতে বারকয়েক বৃক্ষছেদন হয়। হিঁউয়েন সাঙ বোধিবৃক্ষটিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু দেখলেন। পুষা-শু (বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ) একটি চিরহরিৎ বৃক্ষ। কাণ্ড হলুদ-সাদা, শাখা-পত্রদল সবুজ। শরতে ও শীতে নিষ্পত্র হয় না। প্রতি বৎসর বুদ্ধের নির্বাণদিনে বৃক্ষটি সমস্ত পত্র মোচন করে। তারপর নতুন পত্র অঙ্কুরিত হয়। প্রতি বৎসর নানা দেশের রাজান্যবর্গ, বৌদ্ধভিক্ষুগণ ও সাধারণ মানুষ স্বতপ্রণোদিত হয়ে দলে দলে সমবেত হয়ে বাদ্য সহযোগে বৃক্ষটিকে সুগন্ধী জল ও দুধ দিয়ে স্নান করায়; পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে; প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে; তারপর জীর্ণ পত্র সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যায়।

সম্রাট অশোক প্রথমে বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন। এবং বোধিবৃক্ষ বিনাশ কল্পে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বৃক্ষটি নাশ করতে পারেননি। সেই পরমাশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। রানি (তিষ্যরক্ষিতা) একবার লোক নিয়োগ করে বৃক্ষছেদন করালেন। তা দেখে রাজা অশোক বৃক্ষমূলে সুগন্ধিত দুধ ঢাললেন। পরদিনই বৃক্ষটির পুনর্জন্ম হল। তারপর সম্রাট দশ ফুট উঁচু পাথুরে প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন।

সম্প্রতি বৌদ্ধধর্মের শত্রু ও নির্যাতক শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ ছেদন করে নিচের জলস্তর অবধি বৃক্ষমূল নষ্ট করে দিয়েছেন আর তারপর দাহ করেছেন। মাসকয়েক পরে মগধসিংহাসনে আরোহণ করে অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণবর্মার পুণ্য প্রচেষ্টায় বৃক্ষটি পুনরুজ্জীবিত হল – একরাতের মধ্যে বৃক্ষটি নাকি দশ ফুট বর্দ্ধিত হয়েছিল। রাজা পূর্ণবর্মা বৃক্ষটির চারদিকে চব্বিশ ফুট উঁচু পাথুরে প্রাচীর গড়ে দিলেন। ফলে বোধিবৃক্ষের উচ্চতা প্রস্তর-প্রাচীরের থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে রইল।

বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে একশ' ষাট ফুট উঁচু (মহাবোধি) বিহার। ভিতের উপর বিহারের সম্মুখভাগ কুড়ি কদমের বেশি। নীল রঙা ইটের উপর চুনের পলেস্তারা। থাকে থাকে কুলুঙ্গী আছে। আর তাতে রয়েছে স্বর্ণময় মূর্তি। চতুর্দেয়ালে মুক্তোমালা ও বিবিধ প্রকার নিপুণ খোদাই আছে। ছাদের উপরে আছে গিলটি করা তামার আমলক।

মন্দিরের পূর্বপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত ভবনটি কেমন তা নিয়ে দ্বিমত আছে। হতে পারে এটি তিনটি উচ্চ সভাকক্ষ নিয়ে গঠিত ভবন – একটার পিছনে আরেকটা; সভাকক্ষের ভিতর দিয়ে মুক্ত চলাচলের পথ অন্দরকক্ষের সঙ্গে যুক্ত। নয়তো এটি বহুতল মণ্ডপ যার গায়ের কানাচ একের পর এক তিনতলা সমান উঠে গিয়েছে এবং যার আলো-আঁধারি কক্ষ ও রহস্যময় মহাকক্ষের তিন তলাতেই দরজা আছে। সভাকক্ষের কাঠের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও নানা রঙের রত্নখচিত শিল্পকর্ম শোভা পাচ্ছে। কক্ষের বাইরের দরজার বাঁদিকে কুয়ান-জু-সাই (অবলোকিতেশ্বর) পুষার ও ডানদিকে জু-সি (মৈত্রেয়) পুষার দশ ফুট উঁচু রৌপ্যমূর্তি সাজানো। অতীতে মন্দিরস্থানে অশোক নির্মিত চৈত্য ছিল। পরে মন্দির হয়।

বর্তমান মন্দিরটির নির্মাতা এক ব্রাহ্মণ। ইনি হিমালয় থেকে শিবের আদেশ পেয়েছিলেন। পাশের সরোবর নির্মাণ করেছেন তারই সহোদর ভ্রাতা – তিনিও শিবের আদেশ লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিটি নির্মাণের জন্য এক ব্রাহ্মণ এসে সুগন্ধী মাটি ও প্রদীপ নিয়ে দরজা বন্ধ করে মূর্তি গড়তে শুরু করেন – ছয়মাস সময় নিয়ে। ঐ সময়ের মধ্যে মন্দির দরজা খোলা হবে না – এমনটাই শর্ত ছিল। কৌতূহলী জনতা সেই শর্ত লঙ্ঘন করে ফেলে। ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখে যে বুদ্ধের অপূর্বসুন্দর মূর্তি নির্মিত হয়েছে – কেবলমাত্র ডানদিকের বুকের উপর একখানা টুকরো তখন জুড়ে দেওয়া বাকি। ততক্ষণে শর্তভঙ্গ হওয়ার কারণে সেই শিল্পী-ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়েছে। তদবধি ঐটুকু অসম্পূর্ণতা নিয়ে মহামানব বুদ্ধ বিরাজমান। বোধিবৃক্ষের নিচে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় যেন 'মার'কে জানাচ্ছেন – এই পৃথিবী তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেবে। সেই ব্রাহ্মণশিল্পী স্বয়ং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব এমনটাই স্বপ্নে জানালেন এক শ্রমণকে :

একদা রাজা শশাঙ্ক বুদ্ধমূর্তির স্থানে মহেশ্বরমূর্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। মূর্তিস্থাপনের জন্য ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী কিন্তু বুদ্ধমূর্তি অপসারিত না করে মূর্তি আড়াল করে দেয়াল গাঁথে; তারপর সেই দেয়ালে মহেশ্বরদেবের চিত্র অঙ্কণ করায়।

বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিনে (স্থবিরমতে পঞ্চদশ দিনে) বুদ্ধ সম্যকসম্বোধি লাভ করেন। চিনা পঞ্জিকা অনুসারে তৃতীয় মাসের অষ্টম দিনে। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ বৎসর।

হিউয়েন সাঙ বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধমূর্তির অর্চনা করলেন। ভূমিশয়ানে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। অনুতপ্ত চিত্তে রোদন করলেন। আত্মধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন – 'জানিনা ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের সময় আমি কোথায় ছিলাম; এখানে এসে পৌঁছলাম মধ্য পর্বের সদৃশ-কালে (রিসেমব্লেন্স পিরিয়ড)। আমার কর্মদোষ কী ভয়ঙ্কর ছিল কে জানে!'

সে সময় বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা গ্রীষ্মঋতু পালন করছিল – নিকট-দূর দেশ থেকে তারা সমবেত হয়েছিল। যাদের সঙ্গে চৈনিক ভিক্ষুর সাক্ষাত হল, তারা সকলে সমবেদনায় অশ্রুপাত করল। (বৌদ্ধদের বিশ্বাস, সদ্ধর্ম পৃথিবীতে ৪৫০০ বৎসর বিদ্যমান থাকবে। তার মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর সদ্ধর্ম-কাল, পরবর্তী ১০০০ বৎসর সদৃশ-কাল এবং শেষ ৩০০০ বৎসর অন্তিম-কাল রূপে গণ্য।)

হিউয়েন সাঙ নয়দিন বুদ্ধগয়ায় অতিবাহিত করেন। তারপর সকল তীর্থস্থান দর্শন করেন। সিদ্ধিলাভের পরে বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচেই সাতদিন শান্তভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। পরবর্তী ছয় সপ্তাহ নিকটবর্তী নানা জায়গায়। বোধিবৃক্ষের উত্তরে পদচারণা করেছিলেন সপ্তাহকাল। পূর্ব-পশ্চিমে দশ পা করে। সেখানে অষ্টাদশ অলঙ্কৃত চরণচিহ্ন বিদ্যমান – তিন ফুট উঁচু বেদীর উপর। এই রত্নচঙক্রমণের উত্তরে বুদ্ধ পরের সপ্তাহ নিমেষহীন হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে। সেখানে উর্দ্ধদৃষ্টি বুদ্ধের মূর্তি আছে

অনিমেষলোচন চৈত্যে। বোধিবৃক্ষের পশ্চিমে রত্নঘর — সেখানে হিউয়েন সাঙ দেখেছেন — বৃহৎ মন্দিরে ব্রোঞ্জের রত্নখচিত দণ্ডায়মান পূর্বমুখী বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির সামনে ঘননীল অলঙ্কৃত প্রস্তরখণ্ড। বোধিলাভের পরে ব্রহ্মা ঐ রত্নগৃহ নির্মাণ করে বুদ্ধকে দেন। এখানেও বুদ্ধ এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলেন।

বোধিবৃক্ষের দক্ষিণে আছে একশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ যেখানে বুদ্ধ আসনের জন্য কুশঘাস সংগ্রহ করেছিলেন ছদ্মবেশী ইন্দ্রের কাছ থেকে। পাশে শুকসারিকা স্তূপ — এক ঝাঁক শুকসারিকা শুভসঙ্কেতে জানিয়েছিল বুদ্ধের বোধিলাভের সময় আসন্ন।

বোধিবৃক্ষের পূবদিকে দুটি 'মার' স্তূপ। প্রথমে মার, পরে তার দুই কন্যা, সিদ্ধার্থর ধ্যানভঙ্গ করতে চেষ্টা করেছিল। পিপ্পলবৃক্ষের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্যপ বুদ্ধের মন্দির। তার উত্তর-পশ্চিমে দুটি ইটের তৈরী কক্ষ আছে। সেখানে আছে পৃথিবী-দেবতার দুটি মূর্তি। এঁদের একজন সম্বোধিলাভের প্রাক্কালে মারের আসন্ন আক্রমণের কথা বলেছিলেন।

বোধিবৃক্ষের উত্তর-পশ্চিমে চল্লিশ ফুট উঁচু কুঙ্কুম (গৈরিক) স্তূপ। সাওকুটার শ্রেষ্ঠীদলের প্রধান একবার অলৌকিকভাবে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের সাহায্যে সমুদ্রের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর দেশে ফিরে স্তূপ নির্মাণ করে এবং ঐ স্তূপ সুগন্ধী কুঙ্কুমের আস্তরণে ঢেকে দেয়। পরে যখন তারা বোধিবৃক্ষে তীর্থযাত্রায় আসে, তারা দেখে যে সেই কুঙ্কুম-চর্চিত স্তূপ সহসা তাদের সামনে জাগ্রত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্বে বটবৃক্ষের পাশে রয়েছে স্তূপ ও মন্দির। বুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্তি আছে মন্দিরে। ব্রহ্মা ওই স্থানে বোধিলাভের পরে বুদ্ধকে ধর্মপ্রচার করার কথা বলেছিলেন।

পরিব্রাজক আরো দেখেছেন — বোধিবৃক্ষের প্রাচীরের ভিতরে চার কোনায় চার মহাস্তূপ। বজ্রাসনে বসার আগে তথাগত বোধিবৃক্ষের চার কোনায় পা রেখেছিলেন। তখন পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। তিনি যখন বজ্রাসনে এসে দাঁড়ালেন তখন সব শান্ত হল।

বোধিবক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীরের বাইরে প্রাচীন এক কুটির আছে। আর আছে দুটি স্তূপ। ওই স্থানে নন্দিকের কন্যা সুজাতা তথাগতকে পায়সান্ন দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, দুই কন্যা, নন্দা ও বালা, পায়সান্ন দিয়েছিল।

দক্ষিণ দ্বারের বাইরে সাতশ' পা পরিধি নিয়ে যে সরোবর আছে সেটি শিবের আদেশ-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা তৈরী। তার দক্ষিণে আরেকটি সরোবর আছে। সেখানে বুদ্ধ সম্যক সম্ভোধি লাভের পরে অবগাহন করেন। ইন্দ্র তাঁর জন্য ঐ সরোবর নির্মাণ করেন।

পশ্চিমে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আছে। সেখানে বুদ্ধ সিক্ত পরিধান শুষ্ক করতে মেলে দিয়েছিলেন। কাছে দুটি স্তূপ আছে — একটি বুদ্ধের ছিন্নবস্ত্র পরিধানের স্মৃতিতে, অন্যটি দরিদ্রা বৃদ্ধার ছিন্নবস্ত্র দানের স্মৃতিতে।

ইন্দ্র সরোবরের পূবে মুচলিন্দ নাগের সরোবর ও পশ্চিম পাড়ে মুচলিন্দ চৈত্য। সেখানে বোধিপ্রাপ্তির পরে বুদ্ধ সপ্তাহকাল সমাধিস্থ ছিলেন আর মুচলিন্দ নাগ তাঁকে

রক্ষা করেছিল। সরোবরের পূবদিকের মন্দিরে অনশনক্লিষ্ট তথাগতের মূর্তি আছে। পাশে পুষার শরীরচর্চার ক্ষেত্র যার উত্তর ও দক্ষিণে পিপুল বৃক্ষ আছে। কাছের স্তূপটি অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য ও তার চার সুহৃদ, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও ভদ্রিকার কুটিরস্থানে তৈরী। ঐ পাঁচজনের মধ্যে প্রথম তিনজন তাঁর খুল্লতাত ও শেষ দুজন সম্পর্কে মাতুল। রাজা শুদ্ধোদন তাদের পুত্র সিদ্ধার্থ সম্পর্কে খোঁজখবর ও সেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা সিদ্ধার্থর কৃচ্ছসাধনপর্বে সঙ্গী ছিল। পরে তথাগত কৃচ্ছমার্গ বর্জন করলে তারা তাঁকে ত্যাগ করে সারনাথে চলে যায়। পরে তারাই বুদ্ধের প্রথম শিষ্য হয়।

পঞ্চশিষ্য স্তূপের দক্ষিণ-পূর্বে বুদ্ধের নৈরঞ্জনা নদীতে স্নানের স্থান। কাছেই তাঁর পায়সান্ন গ্রহণের স্থান। আরেকটি স্তূপ দুই পর্যটক বণিকের (ত্রপুষ ও ভল্লিক) নিকট থেকে উনপঞ্চাশ দিন পরে প্রথম আহার্য গ্রহণের স্মরণে। সেখানেই চার দেবরাজা বুদ্ধকে একে একে সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক, মুক্তা ইত্যাদি নানা মূল্যবান রত্নে নির্মিত ভিক্ষাপাত্র দান করেছিলেন। বুদ্ধ অবশ্য কোন পাত্রই গ্রহণ করেননি। পরে দেবরাজারা চারটি শীলানির্মিত গাঢ় বেগুনি রঙের উজ্জ্বল ভিক্ষাপাত্র দান করেন। ভগবান ঐ চারটি ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে সবকটিকে নিয়ে একটি ভিক্ষাপাত্র করে নেন। সেকারণে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে চার ভাঁজের কিনারা আছে। হিউয়েন সাঙ আরো দর্শন করলেন তিন কাশ্যপের সঙ্গে সাক্ষাতের স্তূপ ও আরো অনেক নিদর্শন।

উত্তরদ্বারের বাইরে মহাবোধি সঙঘারাম। নির্মাতা শ্রীলঙ্কার জনৈক রাজা। প্রাচীর ঘেরা চত্বরে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু ত্রিতল ভবন – গোটাছয়েক আঙ্গিনা-চত্বর আছে। স্থাপত্য ও চিত্রাবলী সুন্দর। বুদ্ধমূর্তি রত্নমণ্ডিত কনক ও রজতে নির্মিত। বুদ্ধের দেহাবশেষসহ বিশাল সুন্দর চৈত্য আছে। বৎসরের শেষদিনে যখন বুদ্ধ-পূতাবশেষ দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়, তখন তা থেকে আলোক বিকীর্ণ হয় ও পুষ্পরাশি বর্ষিত হয়। সঙঘারামে প্রায় এক সহস্র স্থবির শাখার মহাযানী ভিক্ষু বাস করে। তারা বিনয় পালনে দক্ষ।

বোধিবৃক্ষের দশ লি দক্ষিণে পুণ্যস্থান আছে। প্রতি বৎসর বর্ষাবকাশের শেষে দলে দলে ভিক্ষুরা এসে জড়ো হয়। সাতদিন সাতরাত ধরে সুগন্ধী ফুল ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে ঐ বনে ঘুরে বেড়ায় ও পূজা করে। বুদ্ধের উপদেশমতো ভারতের বৌদ্ধরা শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে অশ্বযুজ (আশ্বিন) মাসের শেষদিন পর্যন্ত বর্ষাবাস পালন করে। এদেশে নক্ষত্রের নামে মাস। সময়ের পরিমাপ বদলায় না বা সম্প্রদায় বিশেষে পরিবর্তিত হয় না। চিনে সম্ভবত ভুল ব্যাখ্যার জন্যে অসময়ে বর্ষাবাস পালন করা হয়।

দশমদিনে নালন্দা মহাবিহার থেকে কয়েকজন শ্রমণ তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। তিনি তাঁদের সঙ্গে নালন্দা অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

(জীবনীকারের মতে হিউয়েন সাঙ বুদ্ধগয়া থেকে নালন্দা গমন করেন। সেখান থেকে রাজগৃহ ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণকথায় ঠিক তার সমর্থন মেলে না। সম্ভবত তিনি

বুদ্ধগয়া থেকে রাজগৃহ হয়ে নালন্দা গমন করেন এবং নালন্দা অবস্থানকালে রাজগৃহের অন্যান্য স্থানাদি দর্শন করেছিলেন।)

পথে যেতে যেতে বোধ হয় তিনি বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে নৈরঞ্জনা নদীর অন্যতীরে বনের মধ্যে গন্ধহস্তী স্তূপ দেখলেন। বুদ্ধ পূর্বজন্মে গন্ধহস্তী রূপে জন্মেছিলেন। কাছে বুদ্ধকাশ্যপের সমাধিস্থানে নির্মিত শীলাস্তম্ভ। পাশে চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন ও শরীরচর্চার স্থানে নির্মিত হয়েছে স্তূপ। মো-হা নদী পেরিয়ে পূর্বদিকে বনের মধ্যে আরেকটি স্তম্ভ দেখলেন — তীর্থিক উদ্ররামপুত্রের সমাধিস্থল।

মো-হো নদী থেকে পূর্বদিকে ১০০ লি দূরে কুক্কুটপাদ বা গুরুপাদ পর্বতে শ্রাবক মহাকাশ্যপ বাস করতেন। নির্বাণের প্রাক্কালে বুদ্ধ তাঁর সুবর্ণখচিত কাষায় ভিক্ষুবেশখানি, যা তাঁকে মহাপ্রজাপতি দিয়েছিলেন, সেটি মহাকাশ্যপকে দিয়ে যান। মৈত্রেয় বুদ্ধকে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম রক্ষা ও প্রচারের দায়ভারও দিয়ে যান তাঁকে। বিশ বৎসর পরে গুরুপাদ পর্বতে মহাকাশ্যপ সমাধি লাভ করেন।

হিউয়েন সাঙ কুক্কুটপাদ পর্বত থেকে উত্তর-পূর্বে ১০০ লি দূরে অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন বুদ্ধবন পর্বত। এখানে এক গুহায় বুদ্ধ অবস্থান করেছিলেন। তখন শক্র ও ব্রহ্মা শীলাপ্রস্তরে গোশীর্ষ চন্দন বেটে বুদ্ধের দেহে লেপন করেছিলেন। সমতল শীলাখণ্ড তখনো ছিল তার গন্ধমাখা।

আরো ৩০ লি পূর্বে পড়ল যষ্টিবন। পর্বতগাত্র জুড়ে বাঁশবনের ঘন ঝাড়। বুদ্ধর ষোলো ফুট উচ্চতায় সন্দেহ হওয়ায় এক ব্রাহ্মণ তাঁর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে বংশদণ্ড হাতে নিয়েছিল। কিন্তু মাপতে গিয়ে বুদ্ধের উচ্চতা সর্বদা যষ্টির থেকে বড়ো হতে লাগল। বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ হাতের যষ্টি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তা থেকে জন্মায় যষ্টিবন। অশোকস্তূপ আছে সেখানে। জয়সেন নামে এক উপাসক সেই বনে বাস করছিল।

ঐ বন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দশ লি দূরে দুটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। ভগবান বুদ্ধ ঐ ঝর্ণার সৃষ্টি করেছেন ও তার জল ব্যবহার করেছিলেন। যষ্টিবন থেকে ছয়-সাত লি দক্ষিণ-পূর্বে পর্বতশিখরে যে স্তূপ রয়েছে সেখানে দেব ও মানুষের সামনে বুদ্ধদেব দু-তিন মাস ধরে ধর্মপ্রচার করেন। রাজা বিম্বিসার ঐ পর্বতে দু-তিন লি দীর্ঘ ও কুড়ি পা'র বেশি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তিন-চার লি উত্তরে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে ঋষি ব্যাস বাস করতেন। আরো চার-পাঁচ লি উত্তরে বড়ো পর্বতগুহা ছিল। সহস্রজনের বসার মতো গুহা। তথাগত তিনমাস ধর্মপ্রচার করেন সেখানে। তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় রয়েছে বিরাট সুড়ঙ্গ যাকে অসুর-পুরী বলা হয়।

মগধ রাজ্যের কেন্দ্র পুরানো **রাজগৃহ**। পূবদিকের পাহাড় পেরিয়ে ৬০ লি অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ উপনীত হলেন রাজগৃহের কুশাগ্রপুর নগরে। এই স্থানে সুগন্ধী কুশ পাওয়া যায়। তা থেকে নাম কুশাগ্রপুর। রাজধানী চারদিকের পাহাড়ে সুরক্ষিত। পশ্চিমে

অপ্রশস্ত নির্গমদ্বার আছে। উত্তরে চলাচল পথ। রাজধানীর পরিসীমা ১৫০ লি। কণিকা বৃক্ষের সুগন্ধী স্বর্ণাভ ফুলে পথঘাট সুশোভিত। পথে যেতে যেতে দেখলেন – পড়ন্ত বসন্তেও সবুজ বনাঞ্চল হয়ে উঠেছে সোনালী রঙে রঙিন।

উত্তরদ্বারের বাইরের চৈত্যটি সূচিত করছে একটি ঘটনা। বুদ্ধকে হত্যার জন্য একদা দেবদত্ত এবং অজাতশত্রু প্ররোচিত করেছিল ধনপাল নামের মত্ত হস্তীকে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ হাতের পাঁচ আঙুল থেকে পাঁচটি সিংহ সৃষ্টি করে সেই মত্ত হস্তীকে নিরস্ত করেছিলেন। উত্তর-পূর্বে আরেকটি চৈত্য জ্ঞাপন করছে – সারিপুত্র একদা ভিক্ষু অশ্বজিৎ-এর কাছে বুদ্ধের কথা শ্রবণ করে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরে তিনি অর্হৎ হন।

অনতিদূরে গভীর খাদের পাশে বুদ্ধহননের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় থাকা শ্রীগুপ্তের স্তূপ। শ্রীগুপ্ত বিধর্মীদের কুমন্ত্রণায় বুদ্ধকে অগ্নিগর্ভে ফেলে ও বিষাক্ত অন্নভোজন দ্বারা হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। তার উত্তর-পূর্বে পর্বতপ্রাচীরের বাঁকে যে স্তূপ বিরাজমান, সেখানে মহাবৈদ্য জীবক সভাকক্ষ নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। ভবনের প্রাচীর ও বৃক্ষলতাদি দৃশ্যমান। কাছে জীবকের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ। একটি স্তূপও আছে।

প্রাচীন রাজগৃহ থেকে উত্তর-পূর্বে চোদ্দ-পনেরো লি দূরে গৃধকূট পর্বত – উত্তর পর্বতের দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে একটানা যুক্ত গৃধকূট। অনেকটা উচ্চতায় উঠে যেন দ্যুলোকে গিয়ে মিশেছে। চত্বরটির আকৃতি অনেকটা শকুনির মতো। নাম তাই গৃধকূট। আবার শিখরদেশে শকুনপক্ষীর জটলা বসত বলেও নামকরণটা হতে পারে। স্বচ্ছ জলের ঝর্ণা ও ফলাদিপূর্ণ বন আছে। বুদ্ধ তাঁর পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী ধর্মসাধনায় বহুদিন গৃধকূটে বাস করেছেন। প্রচার করেছেন 'সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সূত্র', 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' ও আরো অনেক সূত্র। পর্বতের সানুদেশ থেকে শিখর পর্যন্ত বিম্বিসার পাঁচ-ছয় লি দীর্ঘ পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। সেই বিম্বিসার মার্গের মধ্যে দুটি স্তূপ (হিয়াসিং ও তুইফান) আছে যেখানে রাজা রথ থেকে অবতরণ করে বুদ্ধদর্শনে পদব্রজে যাত্রা করেন এবং যেখান থেকে তিনি সঙ্গীদের অনুগমন করতে নিষেধ করেছিলেন।

গৃধকূটের শিখরদেশ পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে খাটো। শিখরের পশ্চিমে সুন্দর ইটের তৈরী বিহার আছে – বুদ্ধ সেখানে ধর্মোপদেশ দিতেন। ধর্মপ্রচাররত বুদ্ধের পূর্ণাবয়ব মূর্তি রয়েছে। সভাকক্ষের পূবদিকে বিদ্যমান বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি ছিল তাঁর শরীরচর্চার স্থান। নিকটে যে চৌদ্দ-পনেরো ফুট উঁচু বিশাল প্রস্তরখণ্ড রয়েছে সেটি দেবদত্ত গড়িয়ে দিয়েছিল বুদ্ধের উপর। হত্যার উদ্দেশ্যে। বিহারের দক্ষিণে যে শীলাগৃহ আছে সেখানে বুদ্ধ সমাধিস্থ হতেন। শীলাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে ও সামনে অলৌকিক প্রস্তরখণ্ড আছে। গৃধের বেশ ধারণ করে 'মার' আনন্দকে সেখানে প্রবল ভীতি প্রদর্শন করেছিল আর বুদ্ধ শীলাভেদ করে হাত বাড়িয়ে প্রিয় শিষ্যকে আশ্বস্ত করেছিলেন। বিহারের পাশে বেশ কয়েকটি শীলাগৃহ আছে যেখানে সারিপুত্র ও অন্যান্য অর্হৎরা সমাধিমগ্ন হতেন। সারিপুত্র

কক্ষের সামনে নির্জলা একটি কূপ আছে। বিহারের উত্তর-পূর্বে ঝর্ণার মাঝ বরাবর এক শীলাখণ্ডে বুদ্ধ কাষায় বসন শুকোতে দিতেন। ভক্তের জন্য পাথরে তার চিহ্ন আছে। পাশে প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত। আরো অনেক চৈত্য ও গুহা রয়েছে চারপাশে।

রাজগৃহ পর্বতনগরের উত্তরদ্বারের পশ্চিমে পি-পু-লো (বিপুল) পর্বত। একদা এর দক্ষিণ-পশ্চিম ঢিবির উত্তরাংশে পাঁচশত উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। হিউয়েন সাঙ তখনও বেশ কিছু ঝর্ণা দেখেন। কিছু প্রবাহ উষ্ণ ও কিছু শীতল। ঝর্ণার উৎস হিমালয়ের অনবতপ্ত হ্রদ (রাবণ লেক?)। স্বচ্ছ ও মিঠে জল তার। স্রোতধারা সিংহমুখ শ্বেতগজমুখ থেকে নির্গত হয়ে এক প্রস্তরনির্মিত জলাশয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন সেই জলাশয়ে স্নান করতে আসে ও রোগমুক্ত হয়। চারদিকে ছড়ানো বহু স্তূপ ও বিহার। এবং অনেক সাধুসন্ন্যাসীর বাস আছে। উষ্ণধারার পশ্চিমে পি-পো-লো (পিপ্পল) গুহা – বুদ্ধ সেখানেও ছিলেন। বিপুল পর্বতে বহু দিগম্বর শ্রমণের আনাগোনা হয়। শীর্ষে স্তূপ আছে।

গিরিব্রজের উত্তরদ্বারের বামদিকে (পূর্বদিকে) দু-তিন লি দূরে দেবদত্তের সমাধি গুহা – নিকটে রয়েছে রক্তচিহ্নযুক্ত প্রস্তরখণ্ড। সেখানে সমাধিস্থ ভিক্ষুগণ আত্মবিসর্জন দিয়ে অর্হত্ব লাভ করে। উত্তরদ্বার থেকে এক লি দূরে কলন্দ বেণুবন। তথাগত এখানে বহুবার বাস করেছেন। ইষ্টক বিহারভবনটি তখনও দণ্ডায়মান ছিল। সেখানে বুদ্ধের পূর্ণাবয়ব চিত্র আছে। বিনয় নীতিসমূহ তিনি এখানে বসে রচনা করেন। গৃহপতি কলন্দ প্রথমে উদ্যানটি বিধর্মীদের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল। পরে বুদ্ধের দর্শনলাভ করে ও তাঁর বাণী শ্রবণ করে কলন্দের অনুতাপ হয়। তখন তার উদ্যানটি বুদ্ধকে দান করার ইচ্ছা হয়েছিল। লৌকিক দেবতারা তার মনোভাব অনুমান করে বিধর্মীদের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হল। আর কলন্দকে জানাল – 'বুদ্ধকে উদ্যানটি দান করতে হলে, এক্ষুনি বিধর্মীদের কাছে চলে যাও।'

কলন্দের পুনঃক্রয়ের প্রস্তাবে শুনে বিধর্মীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্যান বিক্রি করে চলে গেল। কলন্দ সেখানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন।

বেণুবনের পূর্বদিকে অজাতশত্রু একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। মহানির্বাণের পরে বুদ্ধ পূতাবশেষ যখন রাজারা ভাগ করে নিচ্ছিল, অজাতশত্রুও এক ভাগ পেলেন। দেশে ফিরে সেই পূতাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করলেন। পরে সম্রাট অশোক সারা দেশে অনেকানেক স্তূপ নির্মাণের জন্য ওই সকল স্তূপ উন্মোচিত করে পূতাবশেষ উদ্ধার করেন এবং উদ্ধার-করা পূতাবশেষের সামান্য অংশ পূর্বোক্ত স্তূপে রেখে চৈত্যপুনর্নির্মাণ করেন। অজাতশত্রু স্তূপের পাশে আছে আনন্দের অর্ধপূতাস্থির উপর নির্মিত আনন্দস্তূপ।

বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচ-ছয় লি দূরে পাহাড়তলিতে যে বেণুবন আছে, সেখানে বড়ো একটি গুহা আছে। তথাগতের নির্বাণলাভের পরে আচার্য মহাকাশ্যপ ও অন্যান্য ৯৯৯ জন অর্হৎ ত্রিপিটক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। সেদিন

উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে সম্বোধিত করে মহাকাশ্যপ বলেছিলেন – 'যারা জানেন যে তারা তিনটি জ্ঞান ও ছয়টি অলৌকিক শক্তি সুনিশ্চিতরূপে আহরণ করেছেন এবং যারা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম নির্ভুলভাবে অবগত রয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই আসন গ্রহণ করুন, অন্যরা অনুগ্রহ করে বিদায় নিতে পারেন।'

এতদ্বারা সমবেত সুধীমণ্ডলী থেকে ৯৯৯ জন সভ্য নির্বাচিত হল। তখনও বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য আনন্দ সন্ন্যাস লাভ করেন নি বলে তাঁকে সভা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর একরাত ধরে কঠোর ধর্মাচরণ করে তিনি ত্রিজগতের সঙ্গে পুর্নজন্মের বন্ধন ছিন্ন করে অর্হত্ব লাভ করেন। তারপর স্থবির কাশ্যপকে প্রণাম জানিয়ে সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এঘটনা ঘটেছিল গ্রীষ্মাবকাশের পঞ্চদশ দিবসে।

মহাকাশ্যপ তখন আনন্দকে বলেন – 'ভিক্ষুদের মধ্যে তথাগত আপনাকে সর্বাধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সর্বধর্মজ্ঞাত শিষ্যরূপে আপনার প্রশংসা করতেন। আপনি আসন গ্রহণ করে মহাসভার জন্য সমগ্র সূত্রপিটক আবৃত্তি করুন।'

আনন্দ নির্বাণস্থলের দিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করতে লাগলেন। অন্যরা তা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছিল। তারপর উপালী বিনয়পিটক এবং কাশ্যপ অভিধর্মপিটক আবৃত্তি করেন। গ্রীষ্মাবকাশের তিন মাসে ত্রিপিটক সংগৃহীত হল। সম্প্রচারের জন্য তালপত্রে লিখিত হল। যেহেতু মহাকাশ্যপ সুধীমণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণতম, তাই তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ স্থবির-নিকায় নামাঙ্কিত হল।

ওই স্থানের কুড়ি লি পশ্চিমে আরেক জায়গায় মহাসাঙঘিকেরা সমবেত হয়েছিল। সেখানেও সম্রাট অশোক স্তূপ নির্মাণ করেন। মহাক্যশ্যপের সভায় যারা প্রবেশাধিকার পায় নি সেই সকল অর্হৎ ও সাধারণ ভক্ত সংখ্যায় কয়েক হাজার ছিল। তারা বলছিল – 'তথাগত যখন জীবিত ছিলেন আমরা একজন শিক্ষকেরই অধীনস্থ ছিলাম; মহামানব আজ বিগত হয়েছেন আর আমরা এমনভাবে বিতাড়িত হলাম; আমরা কি পারি না বুদ্ধকরুণার প্রতিদান দিয়ে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে?'

অতঃপর তারা পৃথকভাবে পূর্বোক্ত ঐ তিন পিটকের সঙ্গে বিবিধপিটক (প্রকীর্ণক?) ও ধারণীপিটক এই নিয়ে পাঁচ পিটক সংগ্রহ করল। এই সকল সংগৃহীত শাস্ত্র পরে মহাসাঙঘিক-নিকায় নামাঙ্কিত হল।

বেণুবনের সামান্য উত্তরে ছিল কলন্দ (করন্দ) সরোবর। দু'-তিন লি উত্তর-পশ্চিমে ষাট ফুট উঁচু অশোক স্তূপ ও পঞ্চাশ ফুট উঁচু অশোক স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভে অশোকের শিলালিপি আছে। স্তম্ভশীর্ষে আছে হাতি।

শীলাস্তম্ভের উত্তর-পূর্বদিকে তিন-চার লি দূরে রাজগৃহ নগর। বহিঃপ্রাকার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শক্তপোক্ত অন্তঃপ্রাচীর কুড়ি লির বেশি দীর্ঘ। চারদিকে চারটি দ্বার। রাজা বিম্বিসার প্রথমে কুশাগ্রপুর প্রাসাদে বাস করতেন। রাজধানীতে বাসভবনগুলি খুব ঘিঞ্জি ছিল বলে

প্রায়শ অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হত। রাজা নিয়ম করেছিলেন যার দ্বারাই অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটবে তাকেই 'শীতলবনে' নির্বাসিত করা হবে। ওই বন শ্মশানভূমি ছিল। একদিন রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল। রাজা বনে নির্বাসিত হলেন। খবর পেয়ে বৈশালীর রাজা সেনাদল নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করতে মনস্থ করল। খবরটা জেনে নিরীক্ষা রক্ষীরা রাজাকে জানাল। রাজা বিম্বিসার তখন তার বাসভবনের চারধারে প্রাচীর নির্মাণ করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সেজন্যে ওই জায়গার নাম হল রাজগৃহ। সেটাই হল নতুন নগর। পরে অজাতশত্রু রাজা হয়ে ঐ স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। রাজা অশোক যখন পাটলীপুত্রে রাজধানী সরালেন তখন ঐ নগরটি ব্রাহ্মণদের দান করে যান। সেজন্যে সেখানে এক সহস্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য লোকজন বাস করে না।

প্রাসাদনগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় আছে দুটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম। আর আছে জ্যেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের ভবন। তার স্মরণে স্তূপ আছে। পাশে রাহুলের ধর্মান্তকরণ-স্তম্ভ ও স্তূপ।

রাহুল স্তূপ থেকে ত্রিশ লির কিছু বেশি দূরত্বে নালন্দা মহাবিহার। জীবনীকারের হিসাব অনুসারে বোধগয়া থেকে সাত যোজন পথ অতিক্রম করে মহাবিহারের সীমানায় একটি গ্রামে পৌঁছনো যায়। সেখানে আচার্য মৌদগল্যায়ন জন্মেছিলেন। নালন্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হিউয়েন সাঙ ঐ গ্রামে পৌঁছে আহারাদি সাঙ্গ করলেন।

ইতিমধ্যে দুশ' ভিক্ষুশ্রমণ ও সহস্র নালন্দাবাসী এসে উপস্থিত হল। তাঁর আগমন উপলক্ষে সাদর সম্বর্ধনা জানানোর জন্য রাজকীয় শোভাযাত্রা নালন্দার বহিরাংশে প্রতীক্ষারত ছিল। অজস্র রঙিন পতাকা, অনেক ছত্র, বাদ্য ও পুষ্পমালা নিয়ে। আনন্দ কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠল। অতিথিকে পেয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস বাঁধা মানছিল না। পরিব্রাজক যে মুহূর্তে নালন্দার প্রবেশপ্রাচীর লঙঘন করলেন অমনি চারিদিকে কলরোল উঠল। শঙ্খঘণ্টার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। দূরদেশ থেকে এসেছেন অতিথি এই ভারতবর্ষে – এ অতি গৌরবের কথা। এই ভাবনা সকলকে স্পর্শ করছিল।

মহাবিহারের সমস্ত ভিক্ষু-শ্রমণ-শিক্ষার্থীরা সমবেত হল। কর্মসচিব ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করল যে মান্য অতিথি নালন্দা মহাবিহারে বাস করবেন এবং অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও নালন্দার সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র ভোগ করতে পারবেন। তারপর কুড়িজন মধ্যবয়স্ক শ্রমণ সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ করলেন নালন্দার অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্রের (৫২৯-৬৪৫ খৃঃ) সঙ্গে। সকলে তাঁকে 'সদ্ধর্ম রক্ষক' বলে সম্বোধন করে।

বয়োভারে আক্রান্ত অধ্যক্ষের বয়স একশ আট বছর। ছিলেন সমতট রাজবংশের ব্রাহ্মণ সন্তান। বৈভব বর্জন করে ভিক্ষু হলেন। জ্ঞানভিক্ষু। বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর দখলে। তাঁর যশ দেশদেশান্তরে প্রচারিত। হিউয়েন সাঙও শুনেছিলেন সে কথা। তখন থেকে তাঁকেই তিনি গুরুপদে বরণ করে নিয়েছেন। তিনিই একমাত্র আচার্য যিনি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এমন সর্বশাস্ত্রবিশারদকে চিনা

ভাষায় ঝেঙ-ফা-জ্যাঙ নামে সম্মান জানানো হয়। ইনি নাকি ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে নালন্দার আচার্যপদে বৃত হন।

আট বছর পরে দীর্ঘ পথপরিক্রমার শেষে সেই বহুবাঞ্ছিত গুরুদর্শন সম্ভব হল। নতজানু হিউয়েন সাঙ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন অধ্যক্ষের দিকে। রীতি অনুসারে শায়িত প্রণামে পদপ্রান্তে পড়ে পূজা করলেন। শীলভদ্র আনন্দিত হলেন বহুশ্রুত চৈনিক পরিব্রাজকের সঙ্গে মিলিত হয়ে। অধ্যক্ষ তাঁকে দুহাতে ধরে তুলে পাশে উপবেশনের ব্যবস্থা করতে বললেন। অধ্যক্ষের পাশে এক বিশেষ আসনে তাঁকে বসানোর ব্যবস্থা করা হল। অন্য ভিক্ষুরাও উপবিষ্ট হল। সকলে আসন লাভ করলে অধ্যক্ষ অতিথিকে প্রশ্ন করলেন – 'কোথা থেকে আগমন হল?'

'– চিন থেকে এসেছি, গুরুর কাছে যোগাচারভূমি শাস্ত্র শিক্ষা করতে।'

একথা শুনে অধ্যক্ষের নয়নে আনন্দাশ্রু বইল। শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রকে ডাকলেন। তাঁরও তখন বয়স সত্তর। একজন ত্রিপিটক বিশারদ ও বাগ্মী ব্যক্তি। অধ্যক্ষ তাঁকে বললেন – 'অতিথিকে জানাতে পারো তিন বছর আগে কি দুর্ভোগ হয়েছিল আমার।'

বুদ্ধভদ্র জানালেন – অধ্যক্ষ বাতরোগ (রিউমাটিজম)–এর শিকার। যখন রোগের প্রকোপ বাড়ে তখন জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। বেদনা এতই তীব্র হয় যে মনে হয় অগ্নিদাহ হচ্ছে নয়তো ছুরি দিয়ে চিরে ফেলা হচ্ছে। বিশ বছরের উপর এই কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। কখনো রোগমুক্তি মেলে, আবার প্রকোপ বাড়ে। তিন বছর আগে এতই কষ্টভোগ করতে হয়েছিল যে তিনি শরীর নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ও প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেন। এক রাতে স্বপ্নে তিন দেবতা দেখা দিলেন। ঐ তিন দেবতার মধ্যে একজন স্বর্ণাভ হলুদ, একজন সবুজ, আরেকজন রজতশুভ্র বর্ণের ছিল। তাঁদের সুন্দর কান্তি ও চমৎকার বেশ ছিল। এসে তাঁরা প্রশ্ন করলেন – 'কেন শরীর নাশ করতে চাইছ? শাস্ত্রে তো বলা হয়েছে যে দেহ থাকলেই ক্লেশ থাকবে। দেহত্যাগের কথা শাস্ত্রে তো নেই।' তারপর তাঁরা আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন। স্বর্ণাভ হলুদ বর্ণের দেবতা মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব, সবুজ বর্ণের দেবতা অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব আর রজতশ্বেত বর্ণের দেবতা মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব জানালেন – 'দেহত্যাগের সঙ্কল্প করে কোন লাভ নেই। আমরা কিছু উপদেশ দিতে এসেছি। আমার কথা শ্রবণ করো। আরো কিছুকাল সদ্ধর্ম ও যোগাচারভূমি শাস্ত্র প্রচার করতে হবে বিশেষ করে যারা এ বিষয়ে কিছু জ্ঞাত হয়নি তাদের কাছে। এক চৈনিক শিষ্য মহান ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চায়। আপনার কাছে শিক্ষালাভ করতে আসছে। তাঁকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ধৈর্যধারণ করতে হবে।'

সম্মতি জানাতেই বোধিসত্ত্বত্রয় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর প্রবল বেদনাও অন্তর্হিত হল।

মহাস্থবির জানতে চাইলেন – 'পথে কতদিন লাগল?'

'– তিন বছর।'

দেখা গেল, অধ্যক্ষের স্বপ্ন দেখার সময়ের সঙ্গে চৈনিক শিষ্যের ভারতযাত্রার সময় ঠিক মিলে যাচ্ছে।

হিউয়েন সাঙের বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট হল রাজা বালাদিত্য নির্মিত চতুস্তল ভবনের চতুর্থ তল। বুদ্ধভদ্রও সেখানে থাকেন। সাতদিন পরে স্থানান্তরিত হলেন অতিথি নিবাসে – ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব ভবনের উত্তরে। তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নির্দিষ্ট হল – একশ' কুড়িটি তাম্বুল ফল, কুড়িটি পানপাতা, এক আউন্স কর্পূর ও এক শেঙ পরিমাণ মহাশাল চাল। মহাশালের দানা কালো বিনের থেকেও বড়ো বড়ো; মগধ ছাড়া অন্যত্র জন্মায় না; রান্না করলে দারুণ সুগন্ধ ছড়ায়; কেবল রাজা ও মহান আচার্যের জন্য সেই চাল নির্দিষ্ট। তাঁকে আরো দেওয়া হল প্রতি মাসের তেল। মাখন ও দুধ যত খুশি। সঙ্গে এক ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণ পাচক। স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্যে নির্দিষ্ট হল একটি হাতি। সঙ্গে বহুভাষিক পরিচালক। মহাবিহারে দশ হাজার লোক বাস করে, তার মধ্যে কেবল দশজন এমন সুবিধা লাভ করতে পারে যেমনটি হিউয়েন সাঙ পেয়েছেন।

নালন্দা কথার অর্থ নাকি 'অজস্র দানেও অতৃপ্তি'। অতীতে তথাগত বোধিসত্ত্ব এই স্থানে রাজধানী নির্মাণ করে দুঃস্থ ও আর্তজনকে ভিক্ষা দান করতেন প্রভূত পরিমাণে। সেই থেকে লোকেরা এই স্থানের নাম করেছে 'অমিত দানবাসনার স্থান'।

নালন্দা বিহারের দক্ষিণদিকের আম্রবনে এক দীঘি ছিল। সেখানে নালন্দা নামে এক নাগরাজ বাস করত। তার জন্য নাম হয়েছে নালন্দা। নাগরাজের গল্পটা শুনেছিলেন স্থানীয় মানুষজনের কাছে। আগে এখানে 'আম্র' নামক ব্যক্তির বাগান ছিল। পাঁচশ বণিক এক কোটি স্বর্ণমুদ্রায় উদ্যান ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করেন। ভগবান বুদ্ধ এখানে তিন মাস ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

বুদ্ধের নির্বাণের পরে রাজা শক্রাদিত্য বুদ্ধের স্মরণে এখানে বিহার নির্মাণ করেন। শক্রাদিত্য বিহারে হিউয়েন সাঙ তখনও দেখলেন যে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর প্রতিদিন চল্লিশজন ভিক্ষু সেখানে তাদের ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণের জন্য প্রেরিত হচ্ছে।

রাজার মৃত্যুর পরে পুত্র বুদ্ধগুপ্ত প্রথম বিহারের দক্ষিণে দ্বিতীয় বিহার নির্মাণ করেন। পূবদিকে তৎপুত্র তথাগতগুপ্ত আরেকটি বিহার নির্মাণ করেন। উত্তর-পূর্বে পুত্র বালাদিত্য চতুর্থ বিহার নির্মাণ করেন। তাঁরই সময়কালে চিন থেকে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (ফা-হিয়েন) এসে নালন্দা মহাবিহারে বাস করেছিলেন। এ ঘটনায় প্রীত হয়ে রাজা বালাদিত্যও নাকি শেষজীবনে বৌদ্ধসন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র বজ্র উত্তরদিকে পঞ্চম বিহার নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের এক রাজা তারই পাশে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এভাবে ছয়জন রাজা বিহার নির্মাণ করে যান। পরে উঁচু ইষ্টক-প্রাকারে সকল বিহার অন্তর্ভুক্ত করে একটিমাত্র সাধারণ প্রবেশদ্বার রাখা হল।

সমগ্র এলাকায় বিস্তৃত অনেক প্রাঙ্গণ। সেগুলি আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। মূল্যবান চত্বর নক্ষত্রসম বিস্তারিত এবং পান্নাসবুজ শিবিরসকল গিরিশিখরের মতো উর্ধ্বগামী। মন্দিরাদি কুয়াশাচ্ছাদিত আর দেবকক্ষাদি মেঘলোক ছাড়িয়ে উপরের দিকে। বায়ুপ্রবাহ ও মেঘমালা যেন দ্বারপথ-গবাক্ষ থেকে উঠে আসে; চন্দ্র-সূর্য বাসভবনের গবাক্ষছত্রে (ইভ্‌স্) বিকীরণরত থাকে। নীল জলধারা উদ্যানের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমরেখায় প্রবাহমান। সবুজ কমলদল চন্দনমুকুলরাশির মধ্যে সুশোভিত।

প্রবেশদ্বারের ঠিক বাইরে আম্রকানন। প্রাঙ্গণস্থ শ্রমণ-বাসভবন চতুস্তল। কড়িবরগা রামধনু রঙের বর্ণবৈচিত্র্যে চিত্রিত এবং নানা পশুমূর্তি খোদিত। স্তম্ভসকল লাল-সবুজে রঙিন। স্তম্ভদ্বার ও গোবরাট নিপুণ ভাস্কর্যে সুন্দর। ভিত্তিমূল পান্না দ্বারা অলঙ্কৃত। আড়িবরগা রঙিন চিত্রে চিত্রিত। ভবনের শিরোদেশ উজ্জ্বল কিরণে ভাস্বর। গবাক্ষছত্র জুড়ে রঙিন পতাকা শোভিত; ভারতবর্ষে সহস্র বিহার রয়েছে কিন্তু কোন বিহারই নালন্দার মতো দারুণ চমৎকার ও ভাবগম্ভীর নয়।

সেবক ও অতিথি সহ সর্বদাই এখানে দশ হাজার শ্রমণ বিদ্যাভ্যাসে রত – তাঁরা মহাযান শাস্ত্র ও অষ্টাদশ হীনযান শাস্ত্র অধ্যয়নে রত। সেই সঙ্গে বেদসকল, যুক্তিশাস্ত্র, ব্যাকারণ, আয়ুর্বেদ ও গণিতশাস্ত্র পাঠ করে। অষ্টাদশ হীনযান শাস্ত্র বলতে মহাসাঙ্ঘিকদের একব্যবহারিক, লোকোত্তরবাদী, কৌক্কুটিক, বহুশ্রুতীয়, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, জেতবন্য, অপরশৈল ও উত্তরশৈল এবং স্থবিরবাদের হৈমবত সর্বাস্তিবাদ, বাৎসুপুত্রীয়, ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীয়, সাম্মাতীয়, ষণ্ণগারিক, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, কাশ্যপীয় ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বোঝায়। সহস্রাধিক শিক্ষার্থী টিকাসহ কুড়িটি শাস্ত্র, পাঁচশতাধিক শিক্ষার্থী ত্রিশটি শাস্ত্র, আর আচার্যসহ মাত্র দশজন গুণী পঞ্চাশটি শাস্ত্রে বিশারদ। একমাত্র আচার্য শীলভদ্র সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি সকল শ্রমণের শিক্ষক। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রথিতযশা ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল বৌদ্ধশিক্ষায় অপূর্ব সৌরভ যুক্ত করছেন। গুণমতী ও স্থিরমতী সমকালীন আচার্যদের মধ্যে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছেন। আচার্য প্রভামিত্র দীপ্ত যুক্তিবিচারে, আচার্য জিনমিত্র উচ্চাঙ্গের বার্তালাপে, আচার্য জ্ঞানচন্দ্র সচ্চরিত্রে ও তীক্ষ্মবুদ্ধি মেধায় অগ্রগণ্য।

প্রতিদিন শতাধিক শিক্ষাশ্রেণীতে বিদ্যাচর্চা হত। ছাত্রদল একবিন্দু সময় নষ্ট না করে শ্রম সহকারে পাঠ্যাভ্যাস করত। সকল শ্রমণেরা উচ্চ নীতিসম্পন্ন বলে পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাত শত বৎসরের ইতিহাসে কোন শ্রমণই অদ্যাবধি অপরাধমূলক কাজকর্ম করেনি। শ্রদ্ধাশীল রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য শতাধিক গ্রামের খাজনা দান করেছিল। প্রতি গ্রামে দুই শত পরিবার বাস করে। তারা প্রতিদিন কয়েক শত মণ তণ্ডুল, সঙ্গে নবনীত ও দুগ্ধ সরবরাহ করত। ফলে শিক্ষার্থীরা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-ঔষধ এই চার জরুরী দ্রব্যাদির সংস্থানের ব্যাপারে

নিশ্চিন্ত ছিল। সেজন্যে তাদের ভিক্ষাপ্রার্থী হতে হত না। এবম্বিধ সুব্যবস্থার কারণে নালন্দায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জন সুনিশ্চিত ছিল।

অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে হিউয়েন সাঙ মহাযান মতের সমস্ত মূলগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলেন। বিশেষ করে অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত মহাযান মতের যোগাচার দর্শন। সেসময় নালন্দায় সর্বশাস্ত্র বিশারদ একমাত্র আচার্য ছিলেন অধ্যক্ষ শীলভদ্র যাকে চৈনিক পরিভাষায় 'বেঙ-ফা-জেঙ' বলা হত। যিনি অন্তত পঞ্চাশটি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে অর্থনির্ণয় করতে পেরেছেন তাকে 'সান-জ্যাঙ' উপাধিতে ভূষিত করা হত। সেসময় নালন্দায় নয়জন এমন আচার্য বিদ্যমান ছিলেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে অন্তত দশজন সান-জ্যাঙ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল সতেরো মাস ধরে হিউয়েন সাঙ আচার্যের কাছে যোগাচারভূমিশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন। তারপর প্রচুর পরিশ্রম সহকারে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে তিনিও সান-জ্যাঙ উপাধি অর্জন করতে সক্ষম হন।

নালন্দায় হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা, ব্রাহ্মণ্য দর্শন অধ্যয়ন করেন। পাঠ করেন হেতু বিদ্যা (লজিক), মহাযানসূত্রালঙ্কার এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের দর্শন। নাগার্জুনের মাধ্যমিক মতবাদ আসলে সর্বাস্তিবাদের বাস্তবতা ও যোগাচার সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করছিল। হিউয়েন সাঙ নালন্দার আচার্যগণের সম্মতিতে ঐ দুই দার্শনিক ভাবধারার মিলন ঘটিয়ে হুই-জোঙ-লুন (নীতি সমন্বয়) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নালন্দায় বসে তিনি হিন্দুধর্মের সাংখ্য ও বৈশেষিক মতবাদের সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা করেছেন জৈন ধর্মেরও যা আসলে তাঁর কাছে বৌদ্ধভাবনার বিকৃতি মাত্র বলে মনে হয়েছে।

জীবনীকার জানিয়েছেন যে নালন্দায় সুস্থিত হয়ে বসার কিছুদিন পরে রাজগৃহের পুণ্যতীর্থাদি দর্শনে গেলেন। (আমরা ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে রাজগৃহের দর্শনীয় স্থানাদির কথা বলেছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নালন্দার কথায় ফিরে আসা যাক।)

মহাবিহারের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বিশালাকার মন্দিরটির নির্মাতা রাজা বালাদিত্য। তিনশ' ফুটেরও বেশি উঁচু মন্দির। বোধিবৃক্ষের কাছে যেমন বুদ্ধমূর্তি আছে অবিকল তেমন মূর্তি সেই মন্দিরে। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে যেখানে তথাগত ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেখানে স্তূপ আছে। আরো উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত স্তূপটি চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন-স্থল ছিল। আর দক্ষিণে রাজা শীলাদিত্য ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাচ্ছেন। তার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। শেষ হলে মূর্তিটি শতাধিক ফুট উঁচু হবে। দুশ' পা দূরে পূর্বদিকে প্রাচীরের বাইরে ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তির নির্মাতা রাজা পূর্ণবর্ধন। আশি ফুট থেকেও বেশি উঁচু মূর্তিটির জন্য ছয়তলা মন্দিরভবন রয়েছে। দুতিন লি উত্তরে একটি ইটের মন্দিরে তারা বোধিসত্ত্বের বিশাল মূর্তি আছে। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। উপবাসের দিনে বড়ো করে পূজা হয়। দক্ষিণদ্বারের ভিতরে বুদ্ধের কালে অলৌকিকভাবে নির্মিত

একটি জলকূপ রয়েছে। একবার পিপাসার্ত বণিকদলকে আঙুল দেখিয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন - ওখানে জল আছে। বণিকেরা মাটি খুঁড়তেই জলধারা বেরিয়ে এল।

একবার হিউয়েন সাঙ আচার্য শীলভদ্রের নিকট 'যোগাচারভূমি শাস্ত্র' ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু বক্তৃতার শুরুতেই বাইরে শোরগোল উঠল। পূর্বদেশ থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে জানাল – পোটলক পর্বতে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন রাজা হবেন। আরো নির্দেশ পেয়েছিলেন যে নালন্দাবিহারে একদিন চিনা অতিথির কাছে আচার্য শীলভদ্র যোগাচারভূমি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবেন এবং তা শ্রবণ করলে বুদ্ধের দর্শনলাভ হবে। সংবাদ পেয়েছি সেই চৈনিক অতিথি আজ নালন্দায়।

এ কথা শুনে আচার্য শীলভদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণে সম্মতি জানালেন। পনেরো মাস ধরে যোগাচারভূমি শাস্ত্র নিয়ে সেই বক্তৃতা চলেছিল। তারপর ব্রাহ্মণ গেলেন রাজা শীলাদিত্যের কাছে রাজত্বলাভের অভিলাষ নিয়ে। রাজা শীলাদিত্য ব্রাহ্মণকে তিনটি গ্রামের প্রধান নিযুক্ত করে দিলেন।

মহাবিহারে হিউয়েন সাঙ যোগাচারভূমি শাস্ত্র বক্তৃতা দিনে তিনবার, অভিধর্ম-ন্যায়ানুসার, প্রকরণার্যভাচা ও অভিধর্ম-সমুচ্চয়ব্যাখ্যা একবার করে, হেতুবিদ্যা শাস্ত্র, শব্দবিদ্যা শাস্ত্র, সমুচ্চয়-প্রণাম শাস্ত্র দুবার করে আর মাধ্যমিক শাস্ত্র ও শত শাস্ত্র তিনবার করে শ্রবণ করতেন। ইতিপূর্বে অভিধর্মকোষ শাস্ত্র, বিভাষা শাস্ত্র এবং ছয় অভিধর্ম-পদ শাস্ত্র কাশ্মীরে অবস্থানকালে শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর যে যে অংশ অনুধাবনে সমস্যা ছিল, এখানে সেসব জেনে নিচ্ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদি ও ব্যাকারণও শিক্ষা নিয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙ ভারতীয় ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন বলে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ ভারতবাসীর সঙ্গে আলোচনা করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন। জীবনীগ্রন্থমতে সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে তাঁর মোট পাঁচ বৎসর লেগেছিল। অন্য সূত্র অনুসারে, তাঁর নালন্দাবাসের প্রকৃত ব্যাপ্তি ছিল দুদফায় দুই বৎসর। প্রথম দফায় পনেরো মাস তিনি নালন্দায় অতিবাহিত করেন।

অবসর যাপনের জন্যে মাঝে মধ্যে হাতির পিঠে করে যেতেন মগধ রাজধানী রাজগৃহে। সেখানকার পুণ্যস্থান দর্শন করতেন। বেণুবন, রত্নগিরি, সপ্তপর্ণী গুহা ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল দূরদূরান্তরে। নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসছে নালন্দায়। প্রবেশ তোরণে অপেক্ষা করছে বিপুল ছাত্রসমাজ। মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সহজ নয়। দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন সফল হতে পারে। হিউয়েন সাঙের সময়ে নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে নালন্দা সঙঘারাম থেকে আট-নয় লি দক্ষিণ-পশ্চিমে কৌ-লি-কা (কোলিক) জনপদ – মৌদগল্যপুত্রের জন্মভূমি। তাঁর মৃত্যুও হয় সেখানে। অশোকস্তূপ আছে। ঐ জনপদ থেকে পূর্বদিকে তিন-চার লি দূরে একটি স্তূপ নির্দেশ

করছে যেখানে রাজা বিম্বিসার পাত্রমিত্র অমাত্যবর্গ নিয়ে বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের রাজগৃহে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। আরো বিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে সারিপুত্রের জন্মস্থান কা-লো-পি-না-কা। সেখানেও অশোক নির্মিত স্তূপ আছে। (কালোপিনাকার সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত। অন্য সূত্রে সারিপুত্রের জন্মস্থান নালন্দাগ্রাম।) কালোপিনাকা থেকে চার-পাঁচ লি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্তূপটি সারিপুত্রের শিষ্য অথবা কাশ্যপবুদ্ধের অনুগত অর্হৎগণের সমাধিস্থান। ত্রিশ লি দূরে আছে ইন্দ্রশৈল গুহা (সম্ভবত গিরিয়ক)। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ গুহার পাথরে কয়েকটি কূটচিত্র আঁকেন। বুদ্ধদেব তার ব্যাখ্যা দেন। ঐ পাহাড়ের পূর্ব শিখরে নির্মিত বিহারের সামনে আছে হংস স্তূপ বোধিসত্ত্বের আত্মবলিদানের স্মৃতিতে।

পনেরো মাস পরে তীর্থের ইশারা চৈনিক পরিব্রাজককে চঞ্চল করে তুলল। আবার তাঁর পথ চলা শুরু হল। নালন্দা থেকে কপোত বিহার হয়ে হিরণ্য পর্বত যাত্রা করলেন।

১৫০-১৬০ লি উত্তর-পূর্বে কপোত বিহার। বিহার থেকে দুই-তিন লি দূরে রয়েছে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। খাড়া পাহাড় ঘন জঙ্গলে ঢাকা। স্বচ্ছ জলের ঝর্ণাধারা আছে। সুবাসিত কুসুমদল শোভিত সুন্দর প্রাকৃতিক স্থান। অনেক মন্দির আছে। মধ্যে প্রধান মন্দিরে আছে চন্দন কাষ্ঠে নির্মিত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি। মৃণালহস্ত অবলোকিতেশ্বর পূষার কপালের উপরে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরটি সিংহলের রাজার গড়া। অলৌকিক ক্ষমতা আছে দেবতার। ভক্তগণ বাসনাপূরণের আশায় অনাহারে থেকে কয়েকদিন ধরে পূজার্চনা করে। দূর থেকে ফুল ছুঁড়ে মনোবাসনার কথা জানায়।

হিউয়েন সাঙও তিনটি বাসনার কথা জানিয়েছিলেন। এক, এদেশে পাঠ সমাপনান্তে যেন অক্ষতদেহে দেশে ফিরে যেতে পারেন। দুই, ইহজন্মের সাধনার ফলে জন্মান্তরে যেন তুষিত স্বর্গে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সেবা করতে পারেন। তিন, দেহধারী মনুষ্য জীবনের একাংশ বুদ্ধ-স্বরূপ বর্জিত থাকে বটে তবে তাঁর বুদ্ধ-সত্ত্ব কিছু আছে কিনা এবং তিনি কি কখনো বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত হতে পারেন কিনা জানতে চান। মনোবাসনা জানিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এবং সবিস্ময়ে দেখলেন যে ফুলগুলি দেবমূর্তির হাতে, বাহুতে ও স্কন্ধে গিয়ে পড়ল। তদর্থ তাঁর মনোরথ সর্বার্থে পূর্ণ হবে। এমনই আশ্বাস পেলেন।

তারপর প্রফুল্লমনে হিরণ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে ৪০ লি দক্ষিণ-পূর্বে পড়ল এক হীনযানী বিহার। ৭০ লি উত্তর-পূর্বে গঙ্গাতটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ আছে – সুন্দর দেবমন্দিরের সঙ্গে বড়ো চৈত্য আছে। ১০০ লি পূর্বে আছে লো-পান-নি-লো নামের জনপদ – সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত। সেখানে বিহার ও বৃহৎ অশোকস্তূপ আছে। সামান্য উত্তরে বিশাল এক সরোবর আছে। ত্রিশ লি পরিসীমার। সব ঋতুতে সরোবরে চার বর্ণের কমল ফোটে।

৯। অবশিষ্ট ভারত ভ্রমণ

হিরণ্যপর্বত - চম্পা - কজঙ্গল - পুণ্যবর্দ্ধন - কর্ণসুবর্ণ - সমতট - তাম্রলিপ্ত - উড্র - কন্যোধ - কলিঙ্গ - কোশল - অন্ধ্র - ধন্যকটক - চুলিয় - দ্রাবিড় - মলকুঠ - কোঙ্কনপুর - মহারাষ্ট্র - ভারুকচ্ছ - মালব - অঠলি - কিচা - বলভি - আনন্দপুর - সুরথ - গুচল - উজ্জয়িনী -চিতোর - মহেশ্বরপুর - আদিনভচিল - লঙ্গল - পিতশীলা - অভগু - সিন্ধ - মোরসম্পুরু - মগধ

নালন্দা থেকে যাত্রা করে লো-পান-নি-লো হয়ে পূর্বদিশায় নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে ২০০ লি অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন ই-লান-ন-পো-ফ-তো বা **হিরণ্যপর্বত** রাজ্যে। (কোন কোন ঐতিহাসিক স্থানটি মুঙ্গের বলে সনাক্ত করেছেন।) ৩০০০ লি পরিধি রাজ্যের। রাজধানীর পরিসীমা ২০ লি। উত্তরে গঙ্গা। উর্বরা জমি, মনোরম জলবায়ু ও সৎ অধিবাসীদের নিয়ে দেশ। সেখানে দশটি বিহারে চার হাজার শ্রমণ বাস করত। অধিকাংশ হীনযানী সর্বাস্তিবাদী (সাম্মিতীয়)। বারোটি দেবমন্দির আছে।

সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা দেশের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের হাতে রাজধানী-নগর অর্পণ করেছেন। তিনি দুটি বিহারও নির্মাণ করেন – প্রত্যেক বিহারে এক হাজার শ্রমণ বাস করে। দুই মহান আচার্য তথাগতগুপ্ত ও ক্ষান্তিসিংহ সেখানে বাস করেন। হিউয়েন সাঙ সেখানে এক বৎসর থেকে তাঁদের থেকে বিভাষা শাস্ত্র, অভিধর্ম-ন্যায়ানুসার এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন।

রাজধানীর দক্ষিণে যে স্তূপ আছে সেখানে বুদ্ধ স্বর্গবাসীদের নিকট তিনমাস ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাছাড়া সেখানে চার অতীত-বুদ্ধের স্মরণচিহ্ন বর্তমান। তার পশ্চিমে ভিক্ষু শ্রোতবিংশতিকোটির স্তূপ। রাজ্যের পশ্চিমে ও গঙ্গানদীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তার দুটি শিখর। ঐ পাহাড়ে বুদ্ধদেব এক বর্ষাকালে তিন মাস (গ্রীষ্মাবকাশ) অতিবাহিত করেন এবং যক্ষ পো-কু-লো (ভকুল)-কে পরাস্ত করেন। পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে উপবেশন করেছিলেন, সেখানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে তার নিদর্শন আছে। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ, চার ফুট এক ইঞ্চি প্রস্থ ও এক ইঞ্চি গভীর সেই দাগ। পাশে যেখানে বুদ্ধ কুণ্ডিকা (জলপাত্র) রেখেছিলেন সেখানেও এক ইঞ্চি গভীর চিহ্ন রয়েছে। আছে যক্ষের গৃহ ও পদচিহ্ন। রাজ্যের দক্ষিণদিকে বিজন বনাঞ্চল। ঐ বনে সুবৃহৎ ও মহাবলশালী অনেক হাতি আছে।

তারপর তিনি হিরণ্য পর্বত থেকে গঙ্গার ডান তট ধরে পূর্বদিকে এগোতে লাগলেন। ৩০০ লি পথ অতিক্রম করলেন। অদূরে চান-পো বা **চম্পা** রাজ্য। (চম্পা প্রাচীনকালের অঙ্গদেশ ও আধুনিক কালের ভাগলপুর।) রাজ্যটি ৪০০০ লি সীমান্ত বিশিষ্ট। রাজধানী বিশাল এলাকা জুড়ে – ৪০ লি সীমানায়। নগর প্রাকার ইষ্টক নির্মিত। অনেক উঁচু।

প্রাকারের ভিত ও পরিখা প্রশস্ত ও গভীর। দশটি বিহার আছে। দু'শ'র বেশি শ্রমণ বাস করে। হীনযানী বৌদ্ধ তারা। কুড়িটি দেবমন্দির আছে। কথিত আছে কল্পারম্ভে মানুষ বন্য ও গুহাবাসী ছিল। পরে স্বর্গ থেকে এক দেবীর আবির্ভাব হয়। ইনি যখন গঙ্গায় অবগাহন করছিলেন, তখন জলদেবতা তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে। এর ফলে দেবী চার সন্তানের জননী হন। বড়ো হলে পুত্রদের মধ্যে সমগ্র জম্বুদ্বীপ ভাগ করে দেওয়া হয়। চম্পানগরী হয় এক সন্তানের রাজধানী।

কয়েক যোজন দূরে পর্বতসঙ্কুল বিশাল অরণ্য প্রদেশ দৃষ্ট হয়। ২০০ লি দীর্ঘ সে অরণ্য। কয়েক শত বন্য হস্তীযূথ বিচরণ করে। রণহস্তী ওই এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়। তাদের ধরা ও পোষ মানানোর কাজ ওই অরণ্যেই করা হয়। সেকারণে হিরণ্যপর্বত ও চম্পায় সর্বাধিক রণহস্তী আছে। জঙ্গলে শৃগাল, গণ্ডার ও কালো চিতা আছে। সাধারণ লোকজন জঙ্গলের পথে পা বাড়ায় না।

হিউয়েন সাঙ পূর্বদিকে আরো ৩০০-৪০০ লি পথ পার হলেন। এসে পৌঁছলেন কিয়ে-চু-ওয়েন-কি-লো বা **কজঙ্গল** রাজ্যে। (রাজমহল বা রাজমহল-সক্রিগলির মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত ঐ স্থান।) ২০০০ লি সীমানা রাজ্যের। নিচু জমি, ভিজে আবহাওয়া। প্রচুর শষ্য উৎপাদিত হয়। মানুষজন স্পষ্টবক্তা। উচ্চাদর্শকে সম্মান করতে জানে। বিদ্যাচর্চাকেও মূল্য দেয়। গোটা ছয়-সাত বিহার আছে। শ'তিনেক ভিক্ষু বাস করে। দশটির মতো দেবমন্দির আছে। রাজা নেই – অন্য রাজ্যের অধীন দেশ। কিছুদিন আগে রাজা শীলাদিত্য পূর্বদিকে সমরাভিযানের সময় এখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

পথ আরো এগিয়ে চলে। পূর্বদিকে। বাংলার দিকে। গঙ্গা পেরিয়ে ৬০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে উপনীত হলেন পুন-ন-ফ-তন-ন বা **পুণ্যবর্দ্ধন** বা পুণ্ড্রবর্ধন নগরে। (অবস্থান নিয়ে বহু মতভেদ আছে। কেউ বলেন পুণ্যবর্দ্ধনের অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়, কেউ বলেন পাবনায়, কেউ বলেন রঙপুরে। অন্যমতে পুণ্ড্রবর্ধন মালদহের পাণ্ডুয়া অথবা বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে।)

রাজ্যের বেষ্টনী ৪০০০ লি। রাজধানীর সীমান্ত ৩০ লির অধিক। রাজ্য ঘনবসতিপূর্ণ। রাজধানীতে জলাশয়, কর্মদপ্তর, পুষ্পোদ্যান শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট। ভূমি সমতল, বালুকা-কঙ্করময়। নানা শস্য উৎপাদনে সক্ষম। প্রচুর কাঁঠাল জন্মে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। রাজ্যের কুড়িটি সঙঘারামে তিন হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করেন। প্রধানত হীনযান-পন্থী। তবে উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়। একশত হিন্দু দেবালয় আছে – তার মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও কার্তিকেয় উপাসক অধিক।

রাজধানীর কুড়ি লি পশ্চিমে পো-কিহ-পো বা পো-কিহ-শো (ভাস্প বা রাশিভ) সঙঘারাম। বড়ো বড়ো আলোকময় প্রাঙ্গণ। উঁচু উঁচু গম্বুজ ও মণ্ডপ। সাতশত শ্রমণ বাস করে। অদূরে অশোকস্তূপ। লোকপ্রবাদ এই স্তূপের নিকট বুদ্ধদেব তিন মাস ধর্মপ্রচার

করেন। স্তূপ থেকে কখনো কখনো উজ্জ্বল আলোর বিকীরণ হয়। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে পার্শ্ববর্তী মন্দিরে। নিকটবর্তী স্থানে চার অতীত-বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন। সংলগ্ন বিদ্যালয়ে সাতশত অধ্যাপক শিক্ষা দিতেন। সঙঘারামে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নানাস্থান থেকে লোকজন প্রত্যাদেশের জন্য এখানে হত্যা দেয়।

পুন্ড্র থেকে কামরূপ গমনপথে পূর্বদিকে বড়ো নদী আছে। এদেশের পুরুষেরা টুপী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা স্কন্ধ পর্যন্ত দেহ বস্ত্রাবৃত রাখে। অধিকাংশ মৃন্ময় কুটিরে বসবাস করে। গৃহ তৃণাচ্ছাদিত। প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত। ধনীরা ইষ্টক নির্মিত গৃহে বাস করে। নগরের উভয়পার্শ্বে পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বিপণীশ্রেণী। চণ্ডাল, নট ও মাংসবিক্রেতারা নগরের বর্হিদেশে বাস করে। ধান্য, মুগ, যব, তিল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত ও ফলমূল প্রধান আহার্যদ্রব্য। মৎস্য, ছাগমাংস ও মৃগমাংসও ভক্ষণ করা হয়। বৈশ্য-শূদ্রেরা মদ্যপান করে। স্বর্ণ ও মুদ্রার প্রচলন ব্যাপক নয় – বিনিময় বাণিজ্য পচলিত। কড়ির ব্যবহারও ছিল। অনধিক ত্রিশ বৎসরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে লোকজন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত। মানুষ ধর্মবিশ্বাসী ও বিষয়সুখবিরাগী। প্রায় কোন মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ছিল না। উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর ছিল। বেগারশ্রম ছিল না।

ভ্রমণকাহিনী অনুসারে – পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ হয়ে হিউয়েন সাঙ গিয়েছেন সমতট ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যে। তারপর ৭০০ লি উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য ভ্রমণ করেছিলেন। সেখান থেকে যান ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমের উড্র রাজ্যে। জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে – পুন্ড্রবর্ধন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৯০০ লি পথ অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ এসে পৌছন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে। তারপর সমতট হয়ে উড্র রাজ্যে। দক্ষিণ ও পশ্চিমভারত ভ্রমণ শেষ করে নালন্দায় ফিরে যান। তারপরে কামরূপ রাজের আমন্ত্রণে নালন্দা থেকে কামরূপ গমন করেন। আমরা এই ভ্রমণপথ অনুসরণ করছি।

হিউয়েন সাঙ **কর্ণসুবর্ণ** রাজ্যকে কীয়ে-লো-ন-সু-ফ-ল-ন বলেছেন। (বর্তমান পশ্চিমবাংলার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর-বর্ধমান এবং বাংলাদেশের যশোহর নিয়ে গঠিত রাজ্য।) আয়তন ৪৪৫০ লি। রাজধানী ২০ লির উপর এলাকা জুড়ে। জনবসতি ঘন। জমি নিচু ও আর্দ্র। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। কৃষিকাজে উন্নত। প্রচুর ফুল ও ফল জন্মে। অধিবাসীরা ধনী ও সচ্চরিত্র। বিদ্যাচর্চায় উৎসাহী। দশটি বিহার আছে। বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা তিনশত (অন্য সূত্রমতে দু'হাজার)। চর্চা হয় হীনযানের সাম্মিতীয় শাখার। তিনটি বিহারে দেবদত্তের শিক্ষানুসারে দুগ্ধজাত খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ।

রাজধানীর পাশে রক্তামৃত (রক্তভিত্তি / রাঙামাটি) বা লো-টো-ওয়েই-চিহ সঙঘারাম। বহুতল বিহারের গম্বুজ উচ্চ আর কক্ষসকল বিশাল ও আলোকময়। এই অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন দক্ষিণদেশ থেকে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে স্থানীয় এক বিধর্মীর দর্প চূর্ণ করেছিল। ঐ বিধর্মী নাকি উদরের উপর তাম্রপত্র বেঁধে আর কপালে

জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ভ্রমণ করত। কারণ জ্ঞানের চাপে তার উদর যেন বিদীর্ণ না হয় আর অজ্ঞ লোকজনের জন্য মশাল থেকে জ্ঞানের আলোক দর্শানো যায়। সেই বিধর্মীকে পরাস্ত করার পর রাজা জয়ী বৌদ্ধভিক্ষুর জন্য বিহার নির্মাণ করে দেন। সম্রাট অশোক নির্মিত একটি স্তূপ আছে। এখানে ভগবান বুদ্ধ সাতদিন ধরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। পঞ্চাশটি হিন্দু দেবালয় আছে। অধিকাংশ লোক হিন্দু।

কর্ণসুবর্ণ থেকে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সান-মো-ত-ত (**সমতট**) রাজ্যে পৌঁছলেন। কামরূপ থেকে সমতট রাজ্য ১২০০-১৩০০ লি দক্ষিণে। (বাংলাদেশের ঢাকা শহর কেন্দ্র করে সমতট রাজ্য কিনা প্রশ্ন আছে।)

সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য চক্রাকৃতি। বেষ্টন ৩০০০ লি। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লি। ভূমি নিচু ও উর্বরা বলে প্রচুর শস্য জন্মে। জলবায়ু প্রীতিকর। অধিবাসীরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও কষ্টসহিষ্ণু। সত্যধর্ম ও অপধর্ম উভয় ধর্মই প্রচলিত। ত্রিশটি সঙঘারামে প্রায় দু'হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণ বাস করে। রাজ্যে একশ' দেবমন্দির আছে। অনেক উলঙ্গ নির্গ্রন্থ বাস করে। নগরের নিকটে অশোকস্তূপ আছে। তথাগত সপ্তাহকাল ধরে এখানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। এর পাশে চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন স্থান দৃষ্ট হয়। স্তূপের নিকটস্থ সঙঘারামে সবুজ পাথরে (জেড) নির্মিত আট ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। মূর্তি থেকে সুবাস নির্গত হয়। বিকীর্ণ রঙিন আলোক হয় আকাশমার্গী। কেবল সৌভাগ্যবানেরা তা দেখতে পায়।

সমতট রাজ্য বেষ্টন করে আছে ছয়টি রাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকের পার্বত্য এলাকায় সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে রয়েছে শিহ্-লি-চা-ত-লো (শ্রীক্ষেত্র) রাজ্য। অবস্থান বার্মার প্রোম রাজ্যে অথবা ত্রিপুরায়। দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রকিনারে কা-মো-লাং-কা (কামোলঙ্কা) রাজ্য – ইরাবতী তীরবর্তী পেগু ও ইরাবতীর বদ্বীপ অঞ্চলে। পূর্বে তা-লো-পো-তি (থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী)। তালোপোতির পূর্বদিকে ঈ-শাং-ন-পু-লো (কম্বোডিয়া) এবং তার পূর্বে মো-হা-চন-পা (মহাচম্পা) যা লাওস ও ভিয়েতনামের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ইয়েন-মো-ন-চউ (যমনদ্বীপ) রাজ্য (অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি)। উপরোক্ত ছটি রাজ্যই গভীর সমুদ্র এবং পার্বত্য প্রদেশের ওপারে। লোকে সেখানে যাতায়াত করে না বটে তবে সেখানকার লোকজনের রীতিনীতি সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। হিউয়েন সাঙ ত্রিপুরাকে কমলাঙ্গ বলেছেন আর সেই কমলাঙ্গ থেকে কুমিল্লা নামের উৎপত্তি। ছয় রাজ্য সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্য লোকমুখে শুনে লেখা।

সমতট থেকে ৯০০ লি পশ্চিমী পথ অতিক্রম করে তিনি তান-মো-লি-তি (**তাম্রলিপ্ত**) গমন করেন। (দক্ষিণরাঢ়ের এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম সুহ্ম। তাম্রলিপ্ত প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত। বর্তমানের তমলুক। তখন সমুদ্রের খাঁড়ি এলাকায় অবস্থিত ছিল।) ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবেষ্টন ১৪০০ লি। রাজধানীর সীমানা দশ লির সামান্য বেশি। ভূমি নিচু ও উর্বরা। গ্রীষ্মপ্রধান এলাকা। প্রচুর শস্য ও ফলমূল জন্মে। অধিবাসীগণ চঞ্চল,

সাহসী ও পরিশ্রমী বটে তবে আচার-আচরণ রুক্ষ্ম। রাজ্যের দশটি সঙঘারামে প্রায় সহস্র ভিক্ষু-শ্রমণ-আচার্য বর্তমান। রাজধানীর নিকটস্থ অশোক স্তূপটির উচ্চতা দুশ' ফুটের মতো। স্তূপের নিকট চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন ও শরীরচর্চার চিহ্ন ছিল। তাছাড়া পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দিরও ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর হওয়ার জন্য প্রচুর দুষ্প্রাপ্য রত্নাদি নগরে মজুদ থাকে। লোকজনও ধনী।

পূর্ববর্তী পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রপথে সিংহল-জাভা হয়ে চিনদেশে যাত্রা করেন। তিনিও তাম্রলিপ্তে দুশ' ফুট উঁচু অশোকস্তম্ভটি দেখেছিলেন। নীল, রেশম ইত্যাদি জলপথে বন্দর থেকে প্রেরিত হত। ময়ূরবংশীয়দের রাজবাটি আট বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল। প্রাকার ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে।

হিউয়েন সাঙ শুনেছেন, দূরদেশে সমুদ্রের ওপারে সিংহল নামে রাজ্য আছে। সেখানকার অধিবাসীরা স্থবিরবাদী ত্রিপিটক সম্পর্কে অবহিত। সমুদ্র পথে ৭০০ যোজন জলপথে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছতে হয়। এক দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে দেখা হলে জানতে পারেন যে, তাম্রলিপ্ত থেকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার বদলে দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত গেলে সেখান থেকে শ্রীলঙ্কায় সমুদ্রযাত্রা মাত্র তিনদিনের।

এরপর হিউয়েন সাঙের গতিমুখ হল দক্ষিণ-পশ্চিমে উ-তু (উড় বা **উড্র**) রাজ্যের দিকে। (বর্তমানের উড়িষ্যা বা উৎকলে।) রাজ্যসীমানা ৭০০০ লি। রাজধানী (সম্ভবত যাজপুর) ২০ লির উপর সীমানায়। জমি উর্বর — অন্যরাজ্যের তুলনায় এখানকার শষ্যদানা বড়ো বড়ো। দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষরাজি ও সুন্দর পুষ্পাদি অজস্র। জলবায়ু উষ্ণ। অধিবাসীরা খানিকটা উগ্রপ্রকৃতির, দীর্ঘদেহী ও কৃষ্ণবর্ণের। অন্য দেশের তুলনায় তাদের ভাষা ও আচারব্যবহার অন্যরকম। অধ্যয়নে পরিশ্রমী। শতাধিক বিহারে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করে। মহাযানী বৌদ্ধ তারা। বিধর্মীদের মন্দিরও আছে পঞ্চাশটি। উভয় ধর্মসম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করে। অশোক নির্মিত দশটি স্তূপ আছে।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতের উপর পু-সিয়ে-পো-কি-লি (পুষ্পগিরি) বিহার। এখানকার প্রস্তর চৈত্য থেকে অলৌকিক রশ্মির বিকীরণ হয় ও নানাপ্রকার রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। চৈত্যের গম্বুজ ও আমলকের মধ্যে উপাসকগণ যে সূর্যছায়া (সানশেড) তৈরী করেছেন তা যেন চুম্বকের আকর্ষণে সূচের মতো ঝুলে থাকে। পুষ্পগিরির উত্তর-পূর্বে আরেকটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন চৈত্য আছে।

সাগরতটবর্তী অঞ্চলে চে-লি-ত-লো (চরিত্র? চিত্রতোলা?) নামে নগর আছে। ২০ লি সীমানা বিশিষ্ট সমুদ্রবন্দর। (সম্ভবত মহানদী তীরবর্তী কটকের কাছে অবস্থান।) সমুদ্রগামী বণিক ও পর্যটকগণ সেখানে যাতায়াত করে ও বিশ্রাম নেয়। নগরটি সুদৃঢ়। বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যে পূর্ণ। বহির্ভাগে পাঁচটি বিশালাকার বিহার ঘননিবদ্ধ স্থানে অবস্থান করছে — বিহারের মূর্তিসকল অত্যন্ত শিল্পরুচিসম্মত। সিংহল রাজ্য ২০,০০০ লি দূরে।

সেখানকার যে স্তূপে বুদ্ধের পূতদন্ত রক্ষিত আছে, তা থেকে মুক্তার আভা ও অন্য রত্ন থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি নির্গত হয়। প্রশান্ত রাতে নাকি তা এই বন্দর থেকে দেখা যায়।

উড্র রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল অরণ্য। ১২০০ লি বিস্তীর্ণ এলাকা পেরিয়ে হিউয়েন সাঙ পৌছলেন কুং-ইউ-তো বা **কন্যোধ** বা কঙ্গোদ রাজ্যে। (স্থানটি সম্ভবত চিল্কা সন্নিহিত অঞ্চলে।) রাজ্য ১০০০ লি সীমানার। রাজধানীর পরিধি ২০ লির বেশি। সমুদ্রতটের উপর পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। গ্রীষ্মপ্রধান এলাকা। নিয়মিত শষ্য উৎপন্ন হয়। অধিবাসীগণ দীর্ঘদেহী, নির্ভীক ও কৃষ্ণবর্ণ। ঔচিত্যবোধ আছে, তেমন কপট বলা যায় না। লেখ্যভাষা মধ্যদেশের মতো তবে কথ্যভাষার ধরণ অন্যরকম। বৌদ্ধ নয়। শতাধিক দেবমন্দির আছে। তীর্থিক দশ হাজারের উপর। পাহাড়ের ঢাল থেকে সমুদ্রতট অবধি নগর ও জনপদ বিস্তৃত। নগরাদি প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষিত। রাজ্যে অসীম সাহসী সেনাদল আছে বলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ সমীহ করে চলে। রাজ্যে বিশালদেহী কৃষ্ণবর্ণের হাতি পাওয়া যায়।

কন্যোধ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘোর বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ পৌছলেন ক-লেং-ক (**কলিঙ্গ**) রাজ্যে। (সেসময়ে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল বোধহয় অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী।) রাজ্যের বেষ্টনী ৫০০০ লি। রাজধানীর ২০ লির বেশি। শষ্য উৎপাদন খুব ভালো। ফল-ফুল প্রচুর। একটানা কয়েক শত লি এলাকা জুড়ে অরণ্যানি আছে। ঘন কালো রঙের হাতি আছে খুব। জলবায়ু উষ্ণ। অধিবাসীরা রুক্ষ্ম ও একগুয়ে প্রকৃতির। বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ। বাক্যালাপে ও আচার-ব্যবহারে মধ্যভারত থেকে পৃথক রকমের। দশটি বিহার আছে। স্থবিরবাদী শিক্ষালাভ করে পাঁচশত শ্রমণ। শতাধিক দেবমন্দির আছে। অবৌদ্ধদের মধ্যে বেশকিছু সংখ্যায় নির্গ্রন্থীরা রয়েছে। অতীতে রাজ্যটি নাকি ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। এক ঋষির কোপে প্রভূত প্রাণহানি হয় ও রাজ্যটি জনবিরল হয়ে যায়। রাজধানীর দক্ষিণ প্রাচীরের কাছে অশোকস্তূপ আছে যেখানে চার অতীত-বুদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন। মহেন্দ্রগিরি রাজ্যের প্রধান পর্বত। উত্তরের গিরিশিরায় একশত ফুট উঁচু প্রস্তর চৈত্য আছে সেখানে একজন প্রত্যেক-বুদ্ধ সমাধিলাভ করেছেন।

কলিঙ্গ থেকে হিউয়েন সাঙ উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন। কিয়াও-স-লো তথা **কোশল** রাজ্যের দিকে। পর্বত অরণ্য অতিক্রম করে ১৮০০ লি পথ পেরিয়ে। সম্ভবত স্থানটি বিদর্ভ বা বেরার। ছত্রিশগড়ও হতে পারে। পর্বত বনজঙ্গল আর জলাভূমি দিয়ে গড়া রাজ্যটির সীমান্ত ৬০০০ লি। রাজধানীর পরিসীমা ৪০ লির উপর। (রাজধানী চান্দা, নাগপুর, অমরাবতী, ইলিচপুর বা বৈরাগড়ে হতে পারে।) রাজ্যের জমি অত্যন্ত উর্বর। নগরগুলি দূরে দূরে নয়। অধিবাসীরা ধনী, দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণবর্ণের। রাজ্যের রাজা ক্ষত্রিয় কিন্তু বোধিধর্মের প্রতি আস্থাশীল। ঐ দেশে একশত বিহার আছে। দশ হাজার

বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করে। দেব উপাসক বিধর্মীদের সংখ্যাও কম নয়। রাজধানীর দক্ষিণে প্রাচীন বিহার আছে। পাশে অশোক স্তূপ। অতীতে বুদ্ধ বিধর্মীদের এই স্থানে পরাস্ত করেছিলেন। নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব এই বিহারে বাস করেন। সা-তো-পো-হা বা সাতবাহন রাজা পণ্ডিত নাগার্জুনকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একদা সিংহল থেকে দেব পূষা এসেছিলেন এখানে। নাগার্জুনের সঙ্গে আলোচনার জন্য। তিনি পণ্ডিত নাগার্জুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষালাভ করতে প্রয়াসী হন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে খ্যাতনামা দার্শনিক নাগার্জুন বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি কীর্তিমান চিকিৎসকও ছিলেন। জীবনদায়ী ঔষধের গুণে তিনি ও রাজ্যের রাজা শতাধিক বৎসরের পরমায়ু লাভ করেছিল। কথিত আছে, রাজার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারূঢ় হওয়ার বাসনায় অধীর হয়ে আচার্য নাগার্জুনের কাছে আত্মবলিদানের মাহাত্ম্যের কথা নিবেদন করে। করুণাপর আচার্য শুষ্ক নলখাগড়ার পাতা দিয়ে স্বহস্তে আপন মস্তক ছেদন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজা সাতবাহনেরও জীবনাবসান হয়।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০০ লি দূরে অবস্থিত পর্বতের নাম পো-লো-মো-লো-কিলি (ব্রহ্মগিরি?)। পর্বতটি অনেক উঁচু এবং একশিলায় নির্মিত বলে মনে হয়।

([illegible] হিয়েনের বর্ণনায় এটি পারাবত বিহার। পর্বতের সঠিক অবস্থান নিয়ে সংশয় আছে স্থানটি ভ্রামরগিরি হতে পারে। ভ্রামরী তথা পার্বতী থেকে পারাবত হতে পারে। স্থানটি দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলমও হতে পারে।)

সাতবাহনরাজ পাহাড়ের উপরে নাগার্জুনের জন্য সঙঘারামটি নির্মাণ করেন এবং পাথর কেটে প্রায় দশ লি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করেন। মহাবিহারটি পাঁচতলা। প্রত্যেক তলে চারটি করে সভাপ্রাঙ্গণ ও স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তিসহ শিল্পসুষমায় অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির ছিল। সর্বোচ্চ তলে শাক্যমুনি বুদ্ধের শাস্ত্রাদি ও পূষাদের লিপিসমূহ সংরক্ষিত। নিচের তলায় রসদাগার ও সাধারণ ভিক্ষুর বাসস্থান। মধ্যের তিনটি তলে মর্যাদাসম্পন্ন ভিক্ষুদের বাসস্থান। উঁচু থেকে ঝর্ণাধারা নেমে এসে প্রবাহিত হয়েছে ভবনের প্রত্যেক তলে। ফাঁকফোকর থেকে এসেছে আলো। পরবর্তীকালে শ্রমণেরা এমন আত্মকলহে জর্জরিত হল যে মঠ-পরিচালকেরা পবিত্রতা রক্ষার জন্য মঠের প্রবেশপথে পাঁচিল তুলে বিহার বন্ধ করে দেন। তদবধি বিহারটি জনহীন পড়ে আছে। বিহারে প্রবেশপথের হদিশ অজ্ঞাত।

চিনা অতিথি পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেবল খোদিত ভাস্কর্য দেখেন। রাজ্যে হেতুবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ মাসাধিককাল অবস্থান করে তাঁর কাছে 'সমুচ্চয়-প্রমাণ শাস্ত্র' শিক্ষালাভ করেন।

কোশল রাজ্য থেকে মহারণ্যের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে ৯০০ লি পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন অন-তো-লো বা অন্ধ্র রাজ্যে। (বর্তমান তেলেঙ্গানায়।) রাজ্যের সীমান্ত ৩০০০ লি দীর্ঘ। রাজধানী পিং-কি-লো (ভিঙ্গির, ভিঞ্জির বা বেঙ্গি) ২০ লির

অধিক পরিধি বিশিষ্ট। উর্বরা জমি ফসল উৎপাদনে চমৎকার। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর চরিত্রের। রাজ্যে কুড়িটি বিহার আছে এবং তিন হাজারের অধিক ভিক্ষু। রাজধানীর কাছেই বিশাল এক বিহার ছিল। বহুতল ভবনে উঁচু সভাকক্ষ ছিল। অতি সুন্দর তার গঠন। অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে। সামনে ছিল প্রস্তর স্তূপ। কয়েক শ' ফুট উঁচু। নির্মাতা অর্হৎ অ-চে-লো (আচার/অচল)। দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোক স্তূপ আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি লি দূরে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের উপর একটি প্রস্তর স্তূপ আছে। সেখানে চেন-ন পূষা (দিঙনাগ বোধিসত্ত্ব) 'হেতুবিদ্যা শাস্ত্র' রচনা করেছেন। বুদ্ধের দেহান্তের পরে হেতুবিদ্যার উপর তাঁর বাণী লুপ্ত হয়ে যায়। তখন মঞ্জুশ্রীর বোধিসত্ত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের যোগাচার-ভূমি-শাস্ত্র রচনা করেন।

পরবর্তী গন্তব্যস্থল দক্ষিণে ১০০০ লি পথ পেরিয়ে তে-ন-ক-চেক বা **ধন্যকটক** (ধান্যকটক বা ধনকন্টক) রাজ্যে। (অবস্থান কৃষ্ণা নদীর তটবর্তী বিজয়বাড়া।) রাজ্যের পরিধি ছিল ৬০০০ লি। রাজধানীর সীমানা ৪০ লির বেশি। উর্বর দেশ – প্রচুর ফসল জন্মে। পতিত জমিও অনেক। জনবিরল নগর সামান্যই নজরে পড়ে। জলবায়ু উষ্ণ। অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়, ভয়ানক স্বভাবের কিন্তু শিল্পরুচি সম্পন্ন। অতীতে অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল। বর্তমানে গোটা কুড়ি বিহারে হাজারখানেক বৌদ্ধসন্ন্যাসী বসবাস করে। তারা মহাসাঙিঘক সম্প্রদায়ের। শতাধিক দেবমন্দির আছে – অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক।

রাজধানীর পূর্বদিকের পাহাড়ে ফু-পো-শিহ-লো (পূর্বশীলা) বিহার আর পশ্চিমের পাহাড়ে অ-ফ-লো-শিহ-লো (অবরশীলা) বিহার। (এটি বর্তমান কালের অমরাবতী কিনা প্রশ্ন আছে।) পূর্ববর্তী রাজাদের তৈরী বিহার। নির্মাণ স্থাপত্য অতি সুন্দর। সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি ও ঝর্ণাদ্বারা সুশোভিত স্থান। দেবতারা বিহারটি রক্ষা করেন। তখন এখানে সহস্র শ্রমণের গমনাগমন ছিল। গত একশ' বছরে পর্বতের দেবদেবীর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। তার ফলে বিহার জনহীন হয়ে পড়েছে।

রাজধানীর দক্ষিণে পর্বতশিরায় অসুর-প্রাসাদ আছে। শাস্ত্রকার পো-পি-ফেই-ক (ভাববিবেক) সেখানে মৈত্রেয় বুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষারত। ইনি বাইরে সাংখ্যরূপী। আসলে নাগার্জুনের শিক্ষা পচার করতেন। কথিত আছে, মগধের ধর্মপালের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধের সাক্ষাত-অভিলাষী হন। তিন বৎসর প্রায়োপবেশনে অবলোকিতেশ্বর মূর্তির সামনে হৃদয়-ধারণী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর লক্ষ্য পূরণে অবলোকিতেশ্বরের পরামর্শ লাভ করেন। অনন্তর ধন্যকটকে দেবতা বজ্রপাণির সামনে বজ্রপাণি-ধারণী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তিন বছর পরে দেবতা আবির্ভূত হয়ে তাঁকে মৈত্রেয় দর্শনলাভের উপায় প্রকাশ করেন। সেইমতো মন্ত্রপূত সরিষা দিয়ে তিনি পর্বত বিদীর্ণ করে পর্বতশীর্ষে অসুর-প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছয়জন অনুগামীও ঐ গুহায় প্রবেশ করতে পেরেছিল।

হিউয়েন সাঙের সঙ্গে দুই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাক্ষাত হয়েছিল — সুভূতি ও সূর্য। তাঁরা মহাসাঙ্ঘিক শাখার ত্রিপিটকে পারদর্শী। চৈনিক অতিথি তাঁদের কাছে 'মূলাভিধর্ম শাস্ত্র' ও অন্যান্য আরো কিছু শিক্ষালাভ করেন। পরিবর্তে তিনিও তাঁদের মহাযানী শাস্ত্র শিক্ষা দেন। তারপর সদলবলে তীর্থ পর্যটনে নির্গত হলেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে তারা চু -লি-ইয় বা **চুলিয়** বা চোল রাজ্যে উপনীত হলেন। (বর্তমান অবস্থান সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায়।) রাজ্যের আয়তন মাত্র ২৪০০ লি। রাজধানীও দশ লি সীমানায় বেষ্টিত। বন্য জঙ্গলে এলাকাটি ব্যপ্ত — জনবসতি সামান্য। অবাধে দুষ্কৃতিরা রাজপথে বিচরণ করে। অধিবাসীরা দুর্দান্ত প্রকৃতির ও লম্পট। বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তপ্রায়। দিগম্বর সম্প্রদায় অনেক। দেবমন্দির আছে বেশ কিছু সংখ্যায়। রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে অশোক স্তূপ আছে। একদা পশ্চিমের প্রাচীন বিহারে এসে দেব বোধিসত্ত্ব ঐ বিহারের অর্হৎ উত্তরের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাকালে অর্হৎ উত্তর তুষিত স্বর্গে মৈত্রেয়বুদ্ধের কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করেন। আরো জানতে পারেন — দেব বোধিসত্ত্ব ভদ্রকল্পে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন।

চুলিয় থেকে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণে বিশাল অরণ্যর ভিতর দিয়ে ১৫০০ থেকে ১৬০০ লি পথ ভেঙে তা-লো-পি-তু বা **দ্রাবিড়** রাজ্যে পৌছলেন। রাজ্যের রাজধানী কান-চি-পু-লো বা কাঞ্চাপুর। (অবস্থান কাঞ্জীভরমে নয়, যখন সমুদ্র বন্দর রূপে বর্ণিত, তখন নাগপট্টমে হওয়াই সম্ভব।) এখান থেকে তিন দিনে সিংহলে পৌছনো যায়। রাজ্যের সীমান্ত ৬০০০ লি দীর্ঘ। রাজধানীর সীমানা ৩০ লির উপর। অত্যন্ত উর্বর জমি। প্রচুর শষ্য জন্মে। আর ফুলফলও জন্মায় অঢেল। মূল্যবান রত্নপ্রস্তরাদি সুলভ। অধিবাসীরা বিশ্বাসভাজন, সাহসী ও বিদ্যাচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাজ্যে শতাধিক বিহার আছে এবং স্থবির সম্প্রদায়ের দশ সহস্রাধিক বৌদ্ধসন্ন্যাসী আছে। দেবমন্দিরের সংখ্যা আশি। অধিকাংশ দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। একাধিকবার বুদ্ধ এই রাজ্য এসেছিলেন। রাজধানীর দক্ষিণে সামান্য দূরে বিশাল বিহার আছে। খ্যাতনামাদের মিলনকেন্দ্র এই বিহার। অশোক নির্মিত একশ' ফুট উঁচু স্তূপ রয়েছে যেখানে বুদ্ধ একদা তীর্থিকদের ধর্মপ্রচারে পরাভূত করেছিলেন।

ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব এই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্যের এক মন্ত্রীর পুত্র। বয়োপ্রাপ্ত হলে রাজা তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। বিবাহে অনিচ্ছুক মন্ত্রীপুত্র তখন বুদ্ধের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। অমনি দেবতাদের এক রাজা তাঁকে কয়েক শত লি দূরের পার্বত্য বিহারে পৌছে দিলেন। সেই বিহারে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ ও পঠনপাঠন হয়। পরে এই ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব রচনা করেন 'শব্দবিদ্যা-সংযুক্ত শাস্ত্র', 'শত-শাস্ত্র-বৈপুল্য', 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি শাস্ত্র' এবং 'হেতুবিদ্যা শাস্ত্র'।

সেই সময় সিংহল থেকে তিন শত বৌদ্ধ শ্রমণ ভারতে আসে। সেই দলে ছিল বোধিমেঘেশ্বর ও অভয়দংষ্ট্রা নামের দুজন। তারা জানাল — সম্প্রতি সিংহল দেশের

রাজা পরলোক গমন করেছেন; সারা দেশে দুর্ভিক্ষ; তাই তারা সমৃদ্ধ রাজ্য জম্বুদ্বীপে চলে এসেছে। বুদ্ধের তীর্থসকল দর্শন করার বাসনা আছে। হিউয়েন সাঙের সিংহলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল শুনে তারা জানাল যে সে দেশে যথার্থ জ্ঞানীগুণী বলতে তেমন কেউ আর নেই। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও হিউয়েন সাঙের তেমনই মনে হল। ফলে ইচ্ছে থাকলেও সিংহল যাত্রা নাকচ করতে হল।

কাঞ্চীপুর থেকে দক্ষিণদিকে ৩০০০ লির অধিক দূরত্বে মো-লো-কূ-ট (**মলকূট**) রাজ্য। (মলয়কুট বা মলকূট সম্ভবত তাঞ্জোর-মাদুরাই থেকে কোইম্বাটুর-কোচিন-ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যবর্তী স্থান হবে। হিউয়েন সাঙ মলকূটে গিয়েছিলেন কি না সন্দেহ আছে। জীবনীকারের বৃত্তান্ত থেকে মনে হয়, তিনি সেখানে যাননি। সিংহলেও যাননি। ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে তিনি মলকূট ও সিংহলে গিয়েছিলেন।) মলকূট রাজ্যের সীমানা ৫০০০ লি এবং রাজধানীর ৪০ লি। কৃষ্ণমৃত্তিকার জন্য অনুর্বর। সমুদ্র তীরবর্তী এই রাজ্যে নানা রত্নাদি সুলভ। বিশেষ করে মুক্তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আবহাওয়া অতি উষ্ণ। অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় ও খর্বাকৃতি, কর্কশ ও আবেগপ্রবণ। বিদ্যোৎসাহী নয় তবে ব্যবসায় উদ্যমী। প্রাচীন বিহারের সংখ্যা অনেক। তার সামান্যই সংরক্ষিত আছে। কতিপয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বাস। কয়েক শ' দেবমন্দির আছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি।

রাজধানীর অনতিদূরে পূবদিকে সম্রাট অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র নির্মিত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্তমানে কেবল তার গম্বুজ দৃশ্যমান। প্রায় বিনষ্ট একটি স্তূপও আছে – অশোকের তৈরী সেই স্তূপটি বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের স্মরণে। রাজ্যের দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে উত্তুঙ্গ শিখরমালা, গিরিশিরা, খাদান ও উপত্যকায় সজ্জিত মলয় পর্বত। সেখানে চন্দন, কর্পূর ও অন্যান্য বৃক্ষাদি জন্মে। তার পূর্বদিশায় পু-ত-লো-ক (পোতালক) পর্বত। শিখরদেশে স্বচ্ছ জলের হ্রদ আছে। নিকটেই প্রস্তরনির্মিত দেব-প্রাসাদ যেখানে কুয়ান-জু-সাই পূষার প্রায়শ আগমন ঘটে। খাঁড়া পর্বত ও খাদের উপর সরু গিরিপথ দিয়ে কষ্টকর যাত্রা করে খুব সামান্য লোকই উপরে উঠে বোধিসত্ত্ব দর্শন করতে পারে। পর্বতের পাদদেশে দর্শনোৎসুক জনগণকে তিনি কখনো কখনো পাশুপত তীর্থিক বা মহেশ্বর রূপে দর্শন দেন।

পোতালকের উত্তর-পূর্বে সমুদ্রতটে অবস্থিত নগর থেকে দক্ষিণ সমুদ্রে অবস্থিত সিংহলে যাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩০০০ লি সমুদ্রযাত্রা করে সেদেশে পৌছনো যায়। সেং-ক-লো তথা সিংহল রাজ্যের সীমান্ত ৭০০০ লি এবং রাজধানীর সীমানা ৪০ লি দীর্ঘ। জনবহুল স্থান। প্রচুর শষ্যাদি উৎপাদিত হয়। অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি ও আবেগপ্রবণ স্বভাবের। প্রভূত রত্নাদি ও নানা মূল্যবান সামগ্রী সেখানে সুলভ।

সিংহলের উদ্ভব নিয়ে কাহিনী আছে। সংক্ষেপে এরকম। জনৈকা দক্ষিণী কন্যার সঙ্গে একদা বনের সিংহরাজার বিবাহ হয়। তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মায়। ঘটনাচক্রে

পুত্র ঐ সিংহরাজকেই হত্যা করে ও প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে। একই সঙ্গে পিতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়। তারপর সমুদ্রযাত্রা করে ভাসতে ভাসতে সিংহল দ্বীপে পৌঁছয়। নানা রত্নরাজিতে পূর্ণ ঐ দ্বীপেই বাস করতে থাকে। কালেকালে বণিকের দল এসে বসতি স্থাপন করে। তার বংশধরগণ সিংহ-হত্যাকারীর সন্তান বলে সিংহল নামে পরিচিত হয়। অন্য কাহিনী মতে, জম্বুদ্বীপের এক বণিকপুত্রের নাম সিংহল। স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বণিকপুত্র সিংহলের রাক্ষসদের আক্রমণ থেকে রক্ষালাভ করে। পরে দ্বীপের রাক্ষসদের হত্যা করে রাজা হয়। তার নামানুসারে রত্নদ্বীপের নাম হয় সিংহল।

পূর্বে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম ছিল না। তথাগতের মহাপ্রয়াণের একশ' বছর পরে মগধসম্রাট অশোকের কনিষ্ঠভ্রাতা (?) মহেন্দ্র সংসার ত্যাগ করে চতুর্থস্তরের সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি আকাশপথে উড়ে এসে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। মহেন্দ্র-কালের দুশ' বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায় — একদল মহাবিহারের সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্যদল অভয়গিরির সঙ্গে। (ইতিহাস বলে — অশোক-পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙঘমিত্রা সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত হন। রাজধানীতে অবস্থিত মহাবিহার খৃষ্টপূর্ব ৩০৬ সালে ও অভয়গিরি বিহার রাজা ভট্টগামিনী দ্বারা খৃষ্টপূর্ব ৮৯ সালে নির্মিত।)

হিউয়েন সাঙ বলেছেন — রাজ্যের শতাধিক বিহারে দশ হাজার শ্রমণ বাস করে। তারা মহাযান ও স্থবির সম্প্রদায়ের। সকলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধ রীতিনীতি পালন করে থাকেন। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে বুদ্ধের পূতদন্ত সংরক্ষিত আছে। দিনে তিনবার করে রাজা পূতদন্ত মার্জনা করেন। কয়েক শত ফুট উঁচু মন্দির নানা রত্নরাজিতে সুশোভিত। মন্দিরশীর্ষের বৃহৎ পদ্মরাগ মণি থেকে যে উজ্জ্বল দ্যুতি বিকীর্ণ হয় শান্ত মেঘমুক্ত দিনে তা দশ হাজার লি দূর থেকে দেখা যায়। পাশের মণিমাণিক্য খচিত মন্দিরটি পূর্বতন রাজার নির্মাণ। ঐ মন্দিরে স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি আছে। মূর্তির শীর্ষে একটি অমূল্য মুক্তো শোভা পায়। একদা স্বয়ং বুদ্ধ মস্তক অবনত করে ঐ মুক্তো অপহরণ করতে এক তস্করকে সাহায্য করেছিলেন। রাজা এসে দেখলেন বুদ্ধমূর্তিটি নতমস্তকে বিরাজ করছে। পরে রাজা মুক্তো উদ্ধার করে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু মূর্তির নতমস্তক আর উন্নত হয়নি। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় লঙ্কা পর্বত। লঙ্কা পর্বতের উপর বসে তথাগত নাকি 'লঙ্কাবতার সূত্র' প্রচার করেন। সিংহল থেকে কয়েক হাজার লি দক্ষিণে নারিকীরা দ্বীপ। সেখানকার অধিবাসীরা তিন ফুটের বামন। দেহ মনুষ্যাকার হলেও আনন পক্ষিচঞ্চু বিশিষ্ট। তারা শষ্য উৎপাদন করে না, কেবল নারিকেল ভোজন করে। সমুদ্রপথে পশ্চিমদিকে আরো দুটি দ্বীপের কথা শোনা যায়।

দ্রাবিড় রাজ্য থেকে সত্তরাধিক সিংহলী ভিক্ষুকে নিয়ে হিউয়েন সাঙ উত্তরদিকে ২০০০ লি পথপরিক্রমা করে পৌঁছলেন কাঙ-কন-ন-পু-লো (**কোঙ্কনপুব**) রাজ্যে। গমনপথে গভীর বনজঙ্গল তো ছিলই। তার উপর ছিল দস্যুডাকাতের দল। আর তারা

পার হয়েছিল অনেক বিচ্ছিন্ন নগর ও জনপদ। (কোঙ্কনপুর রাজ্য সম্ভবত তুঙ্গভদ্রা নদীতটে আনাগুণ্ডি।) রাজ্যের পরিসীমা ৫০০০ লি দীর্ঘ ও রাজধানীর ৩০ লি। রাজ্যে একশত বিহার আছে। দশ হাজার ভিক্ষু বাস করে। মহাযান ও হীনযান উভয় মতবাদই চর্চিত হয়। বিধর্মীদের দেবমন্দিরও আছে অনেক। রাজপাসাদের সমীপবর্তী বিহারে তিনশত শ্রমণ বাস করে। বিহার-মন্দিরে যুবরাজ সর্বসিদ্ধার্থর মহামূল্যবান রত্নমুকুট এক রত্নাধারে সংরক্ষিত আছে। দু'ফুট দীর্ঘ রত্নমুকুট। যুবরাজ সর্বার্থসিদ্ধি পরে গৌতম বুদ্ধ হন। প্রাসাদ-নগরীতে আরেকটি মন্দিরের গর্ভগৃহে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের চন্দন কাষ্ঠে নির্মিত মূর্তি উপাসিত হয়। দশ ফুটের বেশি উঁচু ঐ মূর্তি। কথিত আছে, উক্ত মূর্তির নির্মাতা অর্হৎ শ্রোণকোটিবিংশ। নগরের উত্তরে ত্রিশ লি পরিসীমায় ঘেরা তালবৃক্ষের বন আছে। লিপিকর্মে তালপত্রের ব্যাপক ব্যবহার আছে নানাদেশ জুড়ে। তাল বনে স্তূপ আছে অর্হৎ শ্রোণকোটিবিংশ (শ্রুতবিংশতিকোটি?) ও চার অতীত-বুদ্ধের। রাজধানীর পূর্বে বুদ্ধস্তূপ, দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকস্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে।

কোঙ্কনপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমে বন্যপ্রাণীসঙ্কুল ও দস্যু অধ্যুসিত অরণ্য পেরিয়ে তাঁরা উপনীত হলেন মো-হ্-ল-ক তথা **মহারাষ্ট্র** রাজ্যে। ২৪০০ থেকে ২৫০০ লির মতো দূরত্বে। রাজ্যটি ৬০০০ লি সীমানা বিশিষ্ট। রাজধানীর সীমানা ত্রিশ লির উপর। পশ্চিমে বিশাল এক নদী আছে। (রাজ্যটি ছিল বুঝি মহারাষ্ট্রের নাসিক নগর কেন্দ্র করে।) অধিবাসীরা অহঙ্কারী ও সাহসী, যুদ্ধপ্রিয়। উপকার করলে কৃতজ্ঞ থাকে কিন্তু ক্ষতি করলে প্রতিহিংসাপরায়ণ। বিপন্নের সানুনয় আবেদনে আত্মবিসর্জনেও পরাঙ্মুখ হয় না কিন্তু যে কেউ অপমানজনক ব্যবহার করলে রক্তপিপাসু ও হন্তারক হয়ে ওঠে। রাজ্যের রণনায়ক যারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়, তারা মদমত্ত হয়ে যুদ্ধে যায়। রণহস্তীদেরও মদ্যপান করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠানো হয়। রাজ্যবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতার থেকে মৃত্যু অধিকতর কাম্য মনে করে। যুদ্ধে পরাস্ত হলে শাস্তি হয় না; সেনাদের নারীপোষাক পরতে বলা হয় – এই লজ্জায় তারা আত্মহত্যা করে। এদের শক্তিমত্তার উপর নির্ভর করে রাজ্যের রাজা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে করুণা করে। রাজা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত – যুদ্ধবিদ্যায় উৎসাহী। নাম পু-লো-কি-শে (পুলকেশী)। মগধের রাজা শীলাদিত্য ক্ষমতাবান হলেও এই রাজ্য আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

রাজ্যে শতাধিক বিহার আছে। পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমণ হীনযান-মহাযান উভয় ধর্মমত চর্চা করে। দেবমন্দির আছে অনেক – বিধর্মী উপাসকেরা দেহে ভস্ম মাখে। রাজধানীর ভিতরে-বাইরে পাঁচটি অশোক স্তূপ আছে। তাছাড়া আরো স্তূপ আছে। নগরের দক্ষিণের সঙঘারামে কুয়ানজুসাই বোধিসত্ত্বের শীলামূর্তি আছে।

রাজ্যের পূর্বদিকে পর্বতমালা – একেরপর এক গিরিশিখর মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান। ধাপে ধাপে শৃঙ্গ বিরাজমান। সেখানে এমন এক বিহার আছে যার ভিত্তিভূমি অন্ধকার

দীর্ঘ গিরিসঙ্কটের মধ্যে আর বিহারের আড়ম্বরপূর্ণ সভাকক্ষ ও সুগভীর গর্ভগৃহ পাহাড়শিখর খনন করে নির্মিত ও পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বিহারের সভাগৃহের তলসকল ও বহুতল ছাদগুলির পিছনে ছিল গিরিশিখর আর সামনের দিকে গিরিখাত। বিহারটি নির্মাণ করেছেন পশ্চিম ভারতের অর্হৎ অ-চে-লো (আচার)। শতাধিক ফুট উঁচু বিহারমন্দিরে সত্তর ফুট উঁচু প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি আছে। মূর্তির মস্তকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিরালম্ব সাত ধাপের চন্দ্রাতপ – এক ধাপ থেকে অন্য ধাপের মধ্যে তিন ফুট করে ব্যবধান। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধজীবনের ও তাঁর বোধিসত্ত্বকালীন নানা কাহিনী চিত্রিত – তাঁর বোধিলাভের সময়কাল ও মহানির্বাণের পূর্বলক্ষণাদি যুক্ত ঘটনাবলীও চিত্রিত হয়েছে। বিহারের বহির্দ্বারের দুপাশে প্রস্তর নির্মিত দুটি হস্তী আছে – পরিব্রাজক অতিথিকে জানানো হয়েছে যে ঐ হস্তীর গর্জনে ভূকম্প হয়। পূষা চেন্ন (দিঙনাগ) বিহারে বহুকাল বাস করেছেন। (ঐতিহাসিকগণের ধারণা হিউয়েন সাঙ নাম না করে আসলে অজন্তা গুহার বর্ণনা দিচ্ছেন।)

উত্তর-পশ্চিমে ১,০০০ লি রাস্তা গমন করে নেই-মো-তে (নর্মদা) নদী অতিক্রম করে তাঁরা পৌছলেন পো-লু-ক-চে-পো তথা **ভারুকচ্ছ** রাজ্যে। ২৪০০ থেকে ২৫০০ লি সীমান্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রাজ্য। রাজধানী ২০ লি সীমানার। লবণাক্ত জমি। গাছপালা কম। সমুদ্রজল থেকে নুন তৈরী করা হয়। মানুষজনের জীবিকা সমুদ্র-নির্ভর। তারা নীচাশয়, কপট, অজ্ঞ ও নানা ধর্মমতে বিশ্বাস করে। গোটা দশেক বিহারে শ'তিনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করে। মহাযান স্থবির সম্প্রদায়ের।

ভারুকচছ থেকে আরো ২,০০০ লি উত্তর-পশ্চিমে পথ পেরিয়ে তাঁরা মো-ল-পো তথা **মালব** দেশে উপনীত হলেন। মালব রাজ্যটি বৃহৎ – প্রায় ৬০০০ সি পরিসীমা নিয়ে। রাজধানীর পরিধি ৩০ লির উপর। মোহা নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তটে অবস্থান। অধিবাসীরা নম্র সভ্য চারুকলাপ্রেমী ও বিদ্যোৎসাহী। পঞ্চ ভারতের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব ও উত্তর-পূর্বে মগধ দেশে শিক্ষার কদর আছে। জ্ঞানীরা সম্মানিত হয়। অধিবাসীরা বাগ্মী ও সংস্কৃত রুচির। কয়েক শত বিহারে বিশ সহস্রের অধিক সন্ন্যাসী বাস করে। হীনযান সাম্মিতীয় শাখার বৌদ্ধ তারা। কয়েক শত দেবমন্দিরও আছে। ভস্মাচ্ছাদিত দেবপূজক বিধর্মী উপাসকরাও আছেন। পাশুপতীরা সংখ্যায় বেশি। ষাট বৎসর পূর্বে শীলাদিত্য নামে এক বিদ্বান দয়ালু প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন মালব রাজ্যে। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে তিনি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ অতি সুন্দর এক বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। সাত বুদ্ধের মূর্তি ছিল মন্দিরে। প্রতি বৎসর এক মহামোক্ষ পরিষদ ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করতেন।

রাজধানী থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লি দূরে ব্রাহ্মণদের নগর আছে। সেখানে আছে গভীর খাদ। জনৈক উদ্ধত ব্রাহ্মণ পশ্চিম ভারতের ভিক্ষু ভদ্ররুচির সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে পরাভূত হন। রাজা ঐ ব্রাহ্মণের কঠিন শাস্তি দিতে গেলে ভদ্ররুচির

অনুরোধে তাঁর লঘু শাস্তি হয়। ব্রাহ্মণ পরাজয় সহজে মেনে নিতে না পেরে মহাযান ধর্ম ও পূর্ববর্তী সন্ন্যাসীদের অকারণ নিন্দায় মুখর হন। তখন ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয় ও ব্রাহ্মণ জীবন্ত অতলে তলিয়ে যায়। বিরাজমান গভীর খাদটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

মালব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে হিউয়েন সাঙ উপনীত হলেন খাঁড়ির কাছে। তারপর উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হলেন। ২৪০০ থেকে ২৫০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌঁছলেন ও-চ-লি বা **অঠলি** রাজ্যে। (অবস্থান অনির্ণীত – তবে বর্তমানের কচ্ছ হতে পারে।) ৬০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা রাজ্যটি নেহাৎ ছোট নয়। রাজ্যবাসীরা ধনী ও উন্নতিশীল। কৃষিজীবীর তুলনায় বণিকের সংখ্যাধিক্য আছে। লবণাক্ত মাটিতে বালির ভাগ খুব। ফুল ফল কম জন্মায়। জলবায়ু উষ্ণ। ধুলোবাতাস বেশি। মানুষজন নিকৃষ্ট মনোভাবপন্ন। সম্পদ মূল্যবান জ্ঞান করে। নৈতিক বিষয় লঘু করে দেখে। রাজ্যে লঙ্কা বা গোলমরিচের গাছ আছে যেমনটি চিনের সেচুয়ান রাজ্যে মেলে। আছে সুগন্ধী তাংলি বা থঙলি (অলিবেনাম) গাছ। (সম্ভবত সালই গাছের কথা বলা হয়েছে অথবা গুগ্গুলের কথা। ঐ গাছ থেকে সুগন্ধী রজন পাওয়া যায়।) দেবমন্দিরের সংখ্যা দশের বেশি।

অঠলি থেকে উত্তর-পশ্চিমে তিন দিনে ৩০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে **কি-চা** বা কচ্ছ রাজ্যে পৌঁছলেন। (রাজ্যটি খেদা না কচ্ছ না ক্যাম্বে তা ঠিক জানা যায়নি।) মালবের অধীন উন্নত রাজ্য – ৩০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। অনেকটা মালবের মতোই। দশটি বিহার আছে। সেখানে সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করে। দেবমন্দিরও আছে বেশ কিছু।

কিচা থেকে উত্তরদিশায় ১০০০ লি এগিয়ে পৌঁছে গেলেন ফ-ল-পি বা **বলভি**। (বর্তমানে এটি ভাবনগর বা কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।) বুদ্ধ জীবিতকালে একাধিকবার বলভি গিয়েছিলেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন, সম্রাট অশোক সেখানেই স্তূপ নির্মাণ করেছেন। এখানে শ'খানেক বিহার আছে। হীনযান সাম্মিতীয় শাখার ছয় হাজার ভিক্ষু বাস করে। বলভির রাজা তখন ধ্রুবভট্ট – ইনি মালবের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও কান্যকুব্জের রাজা শীলাদিত্যের জামাতা। রাজা রুক্ষ দুর্বিনীত মেজাজের। প্রতি বৎসর নানা দেশের সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ জানায় রাজধানীতে। সাত দিনের সমাবেশে। তখন সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, শয্যাদি, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অকাতরে দান করা হয়। রাজধানীর অদূরে আচারের সঙ্ঘারাম। সেখানে বোধিসত্ত্ব গুণমতি ও স্থিরমতি বাস করতেন। উভয়ে আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্য। আচার্য স্থিরমতি বলভীর বপ্পপাদ বিহারের নির্মাতা। গুণমতির খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন বসুমিত্র।

বলভি থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ লি যাত্রা করে এসে উপনীত হলেন অ-নন-তো-পু-লো বা **আনন্দপুব** রাজ্যে। (রাজ্যটি বনস ও সবরমতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে।) মালবের শাসনাধীন রাজ্য। ২০০০ লি দীর্ঘ সীমানার। দশটির বেশি বিহার আছে। সাম্মিতীয় শাখার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হবে সহস্রাধিক। বেশ কিছু দেবমন্দির আছে।

পশ্চিমে আরো ৫০০ লি পথ পেরিয়ে উপনীত হলেন পশ্চিম ভারতের সু-ল-ক বা **সুরথ** রাজ্যে। সীমান্ত ৪০০০ লি। (রাজ্যটি সৌরাষ্ট্র তথা আধুনিক কালের কাথিয়াবাড় হওয়া সম্ভব।) রাজধানী (হাল আমলের জুনাগড়?) যার সীমানা ছিল ৩০ লির বেশি। পশ্চিমে মোহি নদী। সমুদ্রপথের উপর অবস্থিত রাজ্যটি মালবের শাসনাধীন – সমুদ্র নির্ভর জীবিকাই প্রধান। অধিকাংশ লোক বণিক সম্প্রদায়ের। তাদের প্রকৃতি রুক্ষ ও প্রচণ্ড। বিদ্যাচর্চায় অনাগ্রহী। মাটি লবণাক্ত। ফুল ও ফল সামান্য উৎপাদিত হয়। শীত ও গ্রীষ্ম একরকম হলেও ঝড়ঝঞ্ঝা খুব আছে। পঞ্চাশের অধিক বিহার আছে। তিন হাজারের উপর ভিক্ষু-শ্রমণ বসবাস করে। দেবমন্দিরের সংখ্যা শতাধিক। রাজধানীর কাছে ইয়ো-শান-তো (উজ্জয়ন্ত) পর্বতে বিহার নির্মিত হয়েছে। (এই উজ্জয়ন্ত পর্বত আধুনিক কালের গিরনার নয়তো?) বৌদ্ধবিহারের অধিকাংশ ভবন পাথর কুঁদে বানানো। স্থানটি বহুকাল ধরে মুনিঋষিদের আদর্শ বিচরণ স্থল।

সুরথ থেকে ১৮০০ লি দূরে উত্তরে রাজপুতানার **গুচল** বা গুর্জ্জর রাজ্য। চিনা ভাষায় বলা হয়েছে কু-চে-লো। (এটি আধুনিক কালের কাথিয়াবাড় হওয়া মুস্কিল।) ৫০০০ লি সীমান্ত রাজ্যের। রাজধানী পি-লো-মো-লো (ভিলমল বা বারমের?)। ৩০ লি সীমানা রাজধানীর। একটি মাত্র বিহার আছে। শতখানেক বৌদ্ধভিক্ষু বাস করে। অধিকাংশ মানুষ অবৌদ্ধ। দেবমন্দির আছে বেশ কয়েকটি। রাজা ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ।

গুচল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৮০০ লি পথ অতিক্রম করে উ-শে-ইয়েন-না বা **উজ্জয়িনী** রাজ্যে। (একদা অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। ভারতে একাধিক উজ্জয়িনীর কথা শোনা যায় – বেনারস, কৌশাম্বী ও রাজগৃহের কাছে।) ৬০০০ লি সীমানা নিয়ে ঐ উজ্জয়িনী রাজ্য। অধিবাসীরা ধনী ও উন্নতিশীল। বেশ কিছু বিহার আছে তবে অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়। গোটা তিন-চার বিহারে বৌদ্ধভিক্ষুরা বাস করে। তাদের সংখ্যা তিন শ'র মতো হবে। দেবমন্দির যথেষ্ট সংখ্যায় আছে। রাজধানীর কাছে একটি স্তূপ আছে যেখানে একদা সম্রাট অশোক নরক-কারাগার নির্মাণ করেছিলেন।

উত্তর-পূর্ব দিকে ১০০০ লি পথ অতিক্রম করে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ উপনীত হলেন চিহ্-কি-তো অর্থাৎ **চিতোব** রাজ্যে। ৪০০০ লি পরিসীমা রাজ্যের। রাজধানী মাত্র ১৫ লি সীমানা দিয়ে ঘেরা। উর্বর জমি। ফসল জন্মে ভালো। গম ও দানাশষ্য অধিক মাত্রায় জন্মে। লোকজন নীতিপরায়ণ ও শান্ত প্রকৃতির। অধিকাংশ মানুষ অবৌদ্ধ। ব্রাহ্মণ রাজা আবার বৌদ্ধধর্মে গভীর আস্থা রাখে। বেশ কিছু সঙঘারাম আছে তবে পুরোহিত্রে সংখ্যা সামান্য। দশটি দেবমন্দির কেন্দ্র করে আছে কয়েক হাজার ভক্ত।

চিতোর থেকে ৯০০ লি পথ পেরিয়ে মান্য অতিথি পৌছলেন মো-হি-শি-ফ-লো-পু-লো বা **মহেশ্বরপুর**। (সম্ভবত স্থানটি প্রাচীন মণ্ডল নগরে।) ৩০০০ লি সীমানার রাজ্য আর রাজধানীর সীমানা ৩০ লি। অনেকটা উজ্জয়িনীর মতোই দেশ। লোকজন

বিধর্মী – বুদ্ধের অনুশাসনে শ্রদ্ধা নেই। দেবমন্দির আছে। অধিকাংশ লোক পাশুপত ধর্মীয়। ব্রাহ্মণ রাজা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী নয়।

(ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে তিনি মহেশ্বরপুর থেকে গুচল হয়ে সিন্ধ রাজ্যে গমন করেন – তারপর মৌলোসানপুলু, পোফতো, আদিনভকিল, লঙ্গল, পারস্য, পিতশিল, অফানতু, ফলন হয়ে ভারত ত্যাগ করেন। জীবনীকারের মতে হিউয়েন সাঙ মহেশ্বরপুর থেকে সুরথ আদিনভকিল লঙ্গল পিতশিলা অভণ্ড হয়ে সিন্ধ রাজ্যে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর মোরসম্পুরু-পর্বত হয়ে মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা এই পথপরিক্রমা অনুসরণ করব।)

মহেশ্বরপুর থেকে সুরথ রাজ্য ছুঁয়ে অ-তিয়েন-পো-চিহ্-লো বা **আদিনভচিল** (অত্যনবকেল) রাজ্য। (রাজ্যটি যে ঠিক কোথায় তা জানা যায়নি – অদিনবকিল, আগিনবচিল, ঔদুম্বর, খজিশ্বর, কচ্ছেশ্বর ইত্যাদি অনেক সম্ভাব্য নাম শোনা যাচ্ছে।) পরিব্রাজকের মতে রাজ্যের সীমানা ৫০০০ লি দীর্ঘ, রাজধানীর ৩০ লি; দূর পশ্চিমে সিন্ধুতীরে ও সমুদ্রতটের নিকটে অবস্থান কিয়ে-চি-সু-ফা-লো নামক রাজধানীর। ঘরবাড়ি সুন্দর। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সুলভ। রাজ্যের রাজা নেই – সিন্ধুরাজের শাসনাধীন। জমি নিচু, সিক্ত ও লবণাক্ত। আশিটি বিহারে পাঁচ হাজারের উপর বৌদ্ধ উপাসক আছে। অধিকাংশ হীনযানের সাম্মিতীয় শাখার। রাজধানীতে চমৎকার মহেশ্বর মন্দির আছে। অশোকস্তূপ আছে গোটা ছয়েক।

পশ্চিমে ২০০০ লি পথ অতিক্রম করে লং-কিয়ে-লো (**লঙ্গল**) রাজ্য। (অবস্থান কি পূর্ব মাকরানে? লাকুরিয়ান বা লাকুর রাজ্যেও হতে পারে। মহাসিন্ধুর কাছে কোন উপসাগরের নিকটে অবস্থিত। লঙ্গল ভারতের বহির্দেশীয় রাজ্য।) পারস্যের অধীনস্থ। রাজধানী সু-তু-লি-স্যু-ফ-লো (সুনুরিশ্বর বা শম্ভুরিশ্বর ?)। রাজ্যে দু'-তিনটি (শতাধিক?) বিহার আছে। কয়েক শত (৬০০০?) ভিক্ষু বাস করে। হীনযান সর্বাস্তিবাদী শাখার। শাক্যমুনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত আছে। কয়েক শত দেবমন্দির আছে। অধিকাংশ পাশুপত ধর্মীয়। নগরে মহেশ্বরের সুন্দর মন্দির আছে। রাজ্যের পূর্বদিকে হোমো (ওরমুজ?) নগর। তার উত্তর-পশ্চিমে ফুলিং বা ফুলিন রাজ্য (বাইজেন্টাইন?)। লঙ্গলের পশ্চিমে প্রমীলা রাজ্যের পথ। তারপর উত্তর-পশ্চিমে পারস্যে যাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি দ্বীপে পশ্চিমী প্রমীলা রাজ্য। সেখানে কেবল নারী বসবাস করে। রাজ্যটি ফুলিং-এর অধীন। সম্বৎসরে একবার ফুলিং রাজ্য থেকে রাজা পুরুষদের সে রাজ্যে মিলনের জন্য পাঠায়। রাজ্যে পুরুষসন্তান লালন করা হয় না।

পারস্য বিশাল দেশ। প্রধান নগর সুলসতণ্ডন (সুরস্থান) ৪০ লি সীমানার। রাজ্যবাসীরা ধনী। জল তুলে সেচের ব্যবস্থা আছে। মুক্তো, রত্ন, সিল্ক, ক্ষৌমবস্ত্র (লিনেন), ভেড়া, অশ্ব ও উট মেলে। সুন্দর ব্রোকেডের সিল্ক, পশমজাত দ্রব্য ও কার্পেট বোনা হয়। লোকেরা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ও আবেগপ্রবণ। শালীনতার অভাব আছে, ন্যায়নীতির তোয়াক্কা করে না।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম তবে শিল্পের প্রতি খুব। বিবাহরীতি যথেচ্ছ। মৃতদের ফেলে দেওয়া হয়। এমনিতে তারা দীর্ঘদেহী। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, কোন ঢাকা থাকে না। বিধর্মীদের প্রধান আরাধ্য দেবতা দিনৎ (বোধহয় দিনপতি, অর্থাৎ সূর্য)। দু'তিনটি বিহার আছে। শাক্যবুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্র আছে রাজপ্রাসাদে।

লঙ্গল থেকে উত্তর-পূর্বে ৭০০ লি দূরে পি-তো-শি-লো বা **পিতাশীলা**। (অবস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবের থর ও পার্কার জেলার মধ্যে।) রাজ্যটির ৩০০০ লি সীমান্ত। রাজা নেই – রাজ্য শিনটু রাজ্যের অধীন। জমি লবণাক্ত। প্রবল শীতার্ত বাতাস। গম ও শষ্য প্রচুর জন্মে – ফল ফুল কম। মানুষজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। বিদ্যাচর্চার প্রতি আগ্রহ কম তবে প্রকৃত বৌদ্ধ। পঞ্চাশটির উপর বিহার আছে – বৌদ্ধসংখ্যা তিন হাজারের উপর। হীনযান সাম্মিতীয় শাখার বৌদ্ধ তারা। কুড়িটির মতো দেবমন্দির আছে। প্রধানত পাশুপতধর্মীয় ভক্তদের মন্দির। রাজধানী থেকে পঞ্চাশ (১৫-১৬?) লি উত্তরে বনের মধ্যে বুদ্ধপূতাস্থির উপর নির্মিত কয়েক শত ফুট উঁচু অশোকস্তূপ আছে। তা থেকে মাঝেমাঝে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্গত হয়। পূর্বজন্মে ঋষি তথাগতকে এখানে এক রাজা হত্যা করেছিল। অর্হৎ মহাকাত্যায়ন কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন বিহারও আছে কাছে।

উত্তর-পূর্ব দিশায় ৩০০ লি দূরত্বে অ-ফন-তু বা ও-ফন-ক (**অভণ্ড** বা অভন্ত) রাজ্য। (স্থানটি মধ্যসিন্ধু অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারে যার রাজধানী প্রাচীন ব্রাহ্মনাবাদ।) রাজ্যের পরিসীমা ২৪০০ লি আর রাজধানীর ২০ লি। রাজা নেই, শাসন চলে সিন্ধুদেশের। প্রচুর পরিমাণে গম ও শিম উৎপাদিত হয়। ফুল-ফল কম। বায়ুপ্রবাহ খুব। শীতও বেশি। লোকজন ভীতিপ্রদ ও আবেগপ্রবণ। শিক্ষার মূল্য কম তবে বুদ্ধের ত্রিরত্নে গভীর আস্থা আছে। কুড়ির উপর বিহার আছে এবং দু'হাজার বৌদ্ধ। অধিকাংশ সাম্মিতীয় শাখার অনুগামী। পাশুপতধর্মীদের পাঁচটি মন্দির আছে।

রাজধানীর উত্তর-পূর্বে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন বিহারের ভিত্তিমূল আছে। বুদ্ধ সেখানে ভিক্ষুদের চর্মপাদুকা পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সংলগ্ন অশোকস্তূপটি শত ফুট উঁচু ছিল যার ভিত তখন ভূমিগর্ভে লুপ্ত ছিল। অশোকস্তূপের পাশে যে মন্দির আছে সেখানে নীল পাথরে নির্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি পূজিত হচ্ছে। দক্ষিণের অরণ্যে আটশ' কদম দূরে অশোকস্তূপ আছে। সেখানে বুদ্ধ রাত্রিযাপন করেছিলেন এবং শীতের জন্য একসঙ্গে তিনটি চীবর পরিধান করেছিলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষুদের একাধিক চীবর পরিধানের অনুমতি দেন।

অভণ্ড থেকে তাঁর গতিমুখ হয় পূর্বদিকে। ৭০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছলেন সিন-তু বা **সিন্ধ** রাজ্যে। অবস্থান স্পষ্ট নয়। রাজ্যের আয়তন ৭০০০ লি সীমানা দিয়ে ঘেরা। রাজধানীর নাম পি-শান-পো-পু-লো (ভিচভপুর?) যার সীমানা ৩০ লি। রাজ্যে গম উৎপাদিত হয়। পাওয়া যায় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, ষণ্ড, ভেড়া, এক কুঁজের উট আর

লাল-সাদা-কালো রঙের তিন ধরণের লবণ। অন্য দেশে এই লবণ নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অধিবাসীরা হঠকারী, কলহপ্রবণ ও নিন্দুক। গভীর জ্ঞানের অভাব আছে তবে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। কয়েক শ' বিহার আছে এবং দশ হাজারের উপর বৌদ্ধ। হীনযান সাম্মিতীয় শাখার। লোকজন অলস ও অকর্মার ঢেঁকি। উচ্চস্তরের বৌদ্ধ সাধকগণ অবশ্য অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় অর্হৎ হতে পেরেছেন। ত্রিশটির উপর দেবমন্দির আছে। রাজা শূদ্রবর্ণের বৌদ্ধ। অনেক স্তূপ আছে। অশোকস্তূপ আছে। কথিত আছে, অর্হৎ উপগুপ্ত এ রাজ্যে ধর্মপচার করেছিলেন। সিন্ধুনদীর নিচু জলায় বেশ কিছু পরিবার বাস করে তারা পশুপালক হলেও নরহত্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের মস্তক মুণ্ডিত; পরিধানে ভিক্ষুর পোষাক। মহাযান ধর্মকে তারা কলঙ্কিত করেছে। এদের পূর্বপুরুষরা নিষ্ঠুর ও দুষ্ট ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে সৎ হওয়ার চেষ্টা করেছিল কিছুকাল।

পূর্বদিশায় ৯০০ লি এগিয়ে পড়ল মৌ-লো-সান-পু-লো (মোরসম্পুরু) রাজ্য। (স্থানটি হয়তো মূলস্থানপুর যা আধুনিক কালের মুলতান।) রাজ্যটি ৪০০০ লি সীমান্ত বেষ্টিত। রাজধানী ৩০ লির উপর এলাকায়। সে-কিয়া বা চেকা রাজ্যের অধীন। জমি উর্বর, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসীরা সৎ, বিদ্যোৎসাহী ও নীতিপরায়ণ। দশটির উপর বিহার আছে তবে অধিকাংশই নষ্ট। দুয়েকটিতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা বাস করছে।

উল্লেখযোগ্য এখানে দারুণ সুন্দর এক মন্দিরে সূর্য দেবতার মূর্তি আছে। স্বর্ণ ও বিবিধ রত্নে সুসজ্জিত দেবমূর্তি। সেখানে সারা রাত ধরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রদীপ জ্বলে। ধূপ জ্বলে। সারা দেশ থেকে প্রতিদিন সহস্র তীর্থযাত্রী পূজার জন্য আসে। রাজা ও বিত্তবানেরা আসেন। তারা মন্দিরচত্বরে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছেন তীর্থযাত্রীর বসবাসের জন্য। বিনামূল্যে খাদ্য পানীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়। মন্দিরের চতুর্দিকে পুষ্পবাগিচা, গাছপালা, পুকুর ও উদ্যান আছে।

মোরসম্পুরু রাজ্য থেকে হিউয়েন সাঙ উত্তর-পূর্ব দিকে ৭০০ লি চলে গেলেন। পৌঁছলেন পো-ফ-তো বা পর্বত রাজ্যে। ৫০০০ লি রাজ্যের সীমানা -- শাসক চেকা রাজ্যের। ধান গম ও শষ্য উৎপাদিত হয়। দশটির বেশি বিহার আছে। বৌদ্ধ সহস্রাধিক। উভয় যানের শাস্ত্রচর্চা চলে। রাজধানী সংলগ্ন বিহারে শতাধিক বৌদ্ধ বাস করে। এই বিহারে শাস্ত্রবিদ জিনপুত্র 'যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র'-এর উপর টীকা রচনা করেন। শাস্ত্রবিদ ভদ্ররুচি ও গুণপ্রভ গৃহত্যাগ করে এখানে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অগ্নি সংযোগে বিহারটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চারটি অশোকস্তূপ আছে। পর্বত রাজ্যে কয়েকজন উত্তম গুরুশিক্ষক লাভ করে হিউয়েন সাঙ এখানে দু'বৎসর ব্যয় করলেন সাম্মিতীয় শাখার 'মূলাভিধর্ম', 'সদ্ধর্ম-সম্পারিগ্রহ শাস্ত্র' ও 'প্রশিক্ষা-সত্য শাস্ত্র' ইত্যাদি শিক্ষালাভ করতে।

শিক্ষান্তে পর্বত দেশ থেকে চৈনিক পরিব্রাজক ফিরে এলেন মগধ রাজ্যে।

১০। নালন্দা কামরূপ কনৌজ ও প্রয়াগ

হিউয়েন সাঙ নালন্দায় প্রত্যাগমন করে আচার্য শীলভদ্রের চরণে প্রণতি জানালেন।

নালন্দার পশ্চিমে তিন যোজন দূরে তিলোদক বিহার। সেখানে বালপতীর অধিবাসী প্রজ্ঞাভদ্র নামে এক আচার্য বাস করছিলেন। সর্বাস্তিবাদী শাখার ত্রিপিটক সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী। অবগত আছেন শব্দবিদ্যা ও হেতুবিদ্যাও। কিছু প্রশ্ন কিছু রহস্য তখনো ছিল হিউয়েন সাঙের মনে। নিরসনের জন্য প্রয়াসী হলেন। দু'মাস তিলোদক বিহারে শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করলেন আচার্য প্রজ্ঞাভদ্রের কাছে।

ইতিমধ্যে কানে এল যে সুরথবাসী ক্ষত্রিয় আচার্য প্রসেনজিত নামে এক মহাজ্ঞানী শাস্ত্রবিদ বর্তমানে যষ্ঠিবন পর্বতে বাস করছেন: বিদ্যাচর্চায় বাল্যকাল থেকেই ক্ষত্রিয় প্রসেনজিতের প্রবল আগ্রহ ছিল। ইনি শাস্ত্রবিদ ভদ্ররুচির নিকট প্রথমে হেতুবিদ্যা, তারপর স্থিতমতি বোধিসত্ত্বের কাছে শব্দবিদ্যা ও হীনযান-মহাযানের অন্য শাস্ত্রাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। আচার্য শীলভদ্রের কাছে যোগাচার-ভূমি শাস্ত্রও শিক্ষা করেন। চতুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজা পূর্ণবর্ধন গুণীজনের কদর দিতে জানেন। তিনি আচার্য প্রসেনজিতকে কুড়িটি গ্রামদান করতে চেয়েছিলেন। রাজা শীলভদ্রও আশিটি গ্রামদান করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আচার্য কোনপ্রকার দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। যষ্ঠিবন পর্বতে বাস করে শিক্ষাদান করে যেতে লাগলেন।

বিদ্যাচর্চায় সদাগ্রহী হিউয়েন সাঙ আবার দুটি বৎসর তাঁর নিকটে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য রয়ে গেলেন। চর্চা করলেন নানা শাস্ত্র এবং তাদের উপর বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা।

শিক্ষা যখন প্রায় সাঙ্গ হওয়ার মুখে, তখন একদিন এক আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন হল। দেখলেন নালন্দাবিহার কেমন জনমানবহীন ও নোংরা হয়ে পড়েছে। বাসভবনে মহিষ চড়ে বেড়াচ্ছে। বালাদিত্য প্রাঙ্গণের পশ্চিমদ্বার দিয়ে তিনি প্রবেশ করছেন। দেখতে পাচ্ছেন যে চতুর্থ তলে এক স্বর্ণময় অবয়ব থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি আনন্দিত মনে ভবনের উপরে উঠতে চেষ্টা করছেন। পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। সেই স্বর্ণকায়কে সাহায্য করতে বললেন। তিনি বললেন – 'আমি মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব; তুমি আপন কর্মশক্তিতে উপরে উঠতে পারবে না; ওইদিকে চেয়ে দেখো।'

ঐ স্বর্ণপুরুষের নির্দেশমতো দিকে তাকিয়ে দেখলেন – এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড বিহারের বাইরের সমস্ত গ্রাম-নগর গ্রাস করে ফেলেছে। তারপর বললেন – 'যত শীঘ্র সম্ভব ঘরে ফিরে যাও; দশ বছরের মধ্যে এখানকার রাজা শীলাদিত্য মারা যাবে; দেশ দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতায় ভরে উঠবে; মন্দলোকেরা তোমার ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে; এটা

জেনে রাখা দরকার।' তারপর হিউয়েন সাঙ স্বপ্ন থেকে সজাগ হলেন। সন্ত প্রসেনজিতকে জানালেন সব কথা। আচার্য বললেন – 'এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়। এখন কি করা উচিত, এ সিদ্ধান্ত কিন্তু নিজেকেই নিতে হবে।'

স্বপ্নের সঙ্গে হিউয়েন সঙের বহুবার সংযোগ ঘটেছে। ভারত যাত্রার আগেও হয়েছে। যেন অজ্ঞাত থেকে বোধিসত্ত্ব সর্বদা তাঁর সুরক্ষায় ব্যাপৃত আছেন।

ইতিমধ্যে বোধগয়ায় উৎসবের দিন সমাগত। ঐ সময় বুদ্ধের পূতাবশেষ প্রদর্শিত হয়। তদুপলক্ষে নানা দেশ থেকে ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে। হিউয়েন সাঙ ও আচার্য প্রসেনজিত সেই সুযোগ অবহেলা করলেন না। তাঁরা দুজনে **বোধগয়া** যাত্রা করলেন।

বুদ্ধের পবিত্র পূতাবশেষ দর্শন জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। পূতাবশেষের কিয়দংশ ছোটবড়ো নানা আকারের দানা। বড়ো দানার অবশেষগুলি মুক্তোর মতো পাটল-সাদা দ্যুতিসম্পন্ন। অস্থি-অবশেষ ব্যতীত মটরদানার মতো রক্তিমাভাযুক্ত মাস-অবশেষও রয়েছে। অজস্র ভক্ত সেই পূত দেহাবশেষের প্রতি গন্ধ-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। সেদিন প্রসেনজিৎ ও হিউয়েন সাঙ দুজনেই অসম আকারের ঐ পূতাবশেষ নিয়ে কথা বলছিলেন। বুঝি সন্দেহ প্রকাশই করছিলেন। এমন সময় গৃহালোক ম্লান হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ও বাইরে আশ্চর্য দ্যুতি প্রকাশিত হল। বাইরে এসে দেখলেন পূতাস্থি স্তূপ থেকে আকাশের দিকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হচ্ছে। তার প্রভায় চন্দ্র-নক্ষত্রাদি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ছড়াচ্ছে মৃদু সৌরভ। তারপর সেই উজ্জ্বল আলোকরাশি নিষ্প্রভ হতে লাগল। এবং পূতাস্থির আধারখানি কেন্দ্র করে পাক খেতে লাগল। পাক খেতে খেতে ঐ আধারেই বিলীন হল। বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে যাদের মনে সন্দেহ উঠেছিল, তারা সন্দেহমুক্ত হল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলাবলি করতে লাগল – শাক্যমুনির পূতাস্থি কেন্দ্র করে এ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করে বোধিবৃক্ষের পূজা ও অন্যান্য স্থান দর্শন করে বোধগয়ায় আট দিন কাটিয়ে তাঁরা দুজনে নালন্দা বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'মহাযান-সংগ্রহ শাস্ত্র' ও 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্র-সিদ্ধি শাস্ত্র'-এর উপর টীকাটিপ্পনি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আচার্য শীলভদ্র হিউয়েন সাঙকে সেই কাজটা করতে বললেন। ইতিপূর্বে আচার্য সিংহপ্রভা একটা বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছিলেন। তবে তা আচার্যের মনঃপূত হয়নি। হিউয়েন সাঙ তিন হাজার শ্লোকে উভয় মতবাদের চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন। আচার্য শীলভদ্র ও অন্যান্যরা ঐ উপস্থাপনা সাবলীল হয়েছে বলে মত দিলেন। তাতে আচার্য সিংহপ্রভ ক্ষুব্ধ হয়ে বোধিবিহার চলে গেলেন। সেখানে পূর্ব ভারত থেকে আগত সহপাঠী চন্দ্রসিংহের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললেন – 'নবাগত চৈনিক অতিথির হাতে যেভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তার একটা বিহিত করতে আপনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করুন।'

কিন্তু তর্কসভায় এসে চন্দ্রসিংহ বাক্যহারা হয়ে গেল। এর ফলে হিউয়েন সাঙের যশরাশি আরো বর্ধিত হল।

কনৌজের রাজা শীলাদিত্য নালন্দাবিহারে এক শত ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এরপরেই তাঁকে কন্যোধ জয়ে যাত্রা করতে হয়। এসে উপনীত হন উড্র (উড়া) রাজ্যে। সেখানকার বৌদ্ধরা হীনযানী। তারা বিদ্রূপ করে বলে – মহাযান শাস্ত্র বিধর্মীদের শিক্ষা বুদ্ধ তা শেখান নি।

রাজা শীলাদিত্যকে তারা বলে – 'ব্রোঞ্জমূর্তি নালন্দায় স্থাপন করা ঠিক হয়নি কেননা নালন্দার শিক্ষা শূন্যপুষ্প বিধর্মীদের। কাপালিক শিক্ষার সমান।'

কিছুকাল আগে প্রজ্ঞাগুপ্ত নামে সাম্মিতীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ সাতশ' শ্লোকে মহাযান শাস্ত্র খারিজ করেছিল। উড্রের বৌদ্ধেরা রাজাকে জানায় – 'প্রজ্ঞাগুপ্তের সেই মতবাদই তাদের মতবাদ। আসল বৌদ্ধ মতবাদ। মহারাজ যদি সন্দেহমুক্ত না হন তবে তর্কসভার আয়োজন করে বিচার করতে পারেন।'

এভাবে তারা মহাযান শিক্ষার উপর কালিমা লেপনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। রাজা শীলাদিত্য তখন নালন্দার অধ্যক্ষের কাছে উভয় শাখার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চারজন ভিক্ষুকে উড্রদেশে পাঠাতে অনুরোধ করলেন। নালন্দা থেকে চারজন পণ্ডিত উক্ত তর্কসভায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত হল – সাগরজ্ঞান, প্রজ্ঞাপ্রভা, সিংহপ্রভা এবং হিউয়েন সাঙ। নির্বাচিত তিন পণ্ডিতকে আশ্বস্ত করে হিউয়েন সাঙ বলেছিলেন – 'আমি দেশে বসে এবং পরে কাশ্মীরে বসে হীনযানীদের সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রপাঠ করেছি। তাদের পক্ষে মহাযান ধর্মকে খারিজ করা সম্ভব নয়। আপনারা চিন্তিত হবেন না।'

পরে অবশ্য রাজা শীলাদিত্য সেই তর্কসভা বাতিল করে পণ্ডিতদের উড্রে পাঠাতে নিষেধ করে দিলেন।

একদিন লোকায়ত শাখার জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে হিউয়েন সাঙকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হল। তিনি চল্লিশটি যুক্তি খাঁড়া করে তাঁর বক্তব্য লিখে নালন্দার বিহারদ্বারে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর ব্যক্তিগত পরিসেবককে পাঠালেন ঐ লিপি ছিঁড়ে ফেলে পদদলিত করতে। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন চাইল যে সে কে, তখন পরিচারক জানাল – সে মহাযানদেবের দাস।

তারপর আচার্য শীলভদ্র ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সামনে বিতর্কসভা বসল। হিউয়েন সাঙ ভূত, নির্গ্রন্থ, কাপালিক, যুতিক, সাংখ্য ও বৈশেষিকদের সম্পর্কে যুক্তিজাল সাজালেন। ভূতেরা আত্মার মুক্তির জন্য দেহ যেভাবে ভস্মাচ্ছাদিত করে রাখে, তা দেখে তাদের উনুনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা বিড়ালের মতো ধূলিমাখা মনে হয়। নির্গ্রন্থরা নগ্নদেহে বিচরণ করে বিশিষ্ট হয়েছে এবং তারা মাথার চুল ছেঁড়া পবিত্র কর্ম বলে মনে করে; ভগ্ন পাঁজরে ও ভাঙা পায়ে তাদের মনে হয় নদীতীরে দাঁড়িয়ে থাকা পচা গাছ। কাপালিকরা

মাথায় ও গলায় করোটি মালা পড়ে থাকে আর তাদের বিশ্রী চেহারা দেখলে মনে হবে কবর হাতড়ে বেড়ানো যক্ষের দল। যুতিকেরা নোংরা পোষাক পড়ে থাকে আর অখাদ্যকুখাদ্য ভক্ষণ করে; তাদের শরীর থেকে বেরোয় কাদাপুকুরের শূকরের মতো দুর্গন্ধ। এদের আচরণ সত্য পথ বলে মেনে নেওয়া কি মূর্খামি নয়? তারপর সাংখ্য ও বৈশেষিক মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করলেন।

ব্রাহ্মণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। তর্কে পরাস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং কথামতো মস্তকছেদনে সম্মত হলেন। হিউয়েন সাঙ বললেন – 'আমরা বৌদ্ধ, মানুষের জীবনহানি চাই না; বরঞ্চ আমার সেবাদাসত্ব স্বীকার করে নিন।'

ব্রাহ্মণ তাই করল। ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাগুপ্তর সাতশ' শ্লোকে মহাযান মতবাদ খারিজের রচনাটি হস্তগত হয়েছিল। সে বিষয়ে হিউয়েন সাঙের যথাযথ জ্ঞান ছিল না। ওই ব্রাহ্মণ পাঁচবার উক্ত রচনা পাঠ করেছেন জেনে তাঁর কাছে সেবিষয়ে বিস্তৃত জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন – 'রাত্রে কথা হবে। তা না হলে সকলে তো জানবে যে আপনি আপনার ভৃত্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।'

রাতে ব্রাহ্মণের কাছে প্রজ্ঞাগুপ্তের মতবাদের মূল বিষয়গুলি জ্ঞাত হলেন। তারপর প্রতিপক্ষে মাত্র ষোলোশ' শ্লোকে ঐ বক্তব্যের নিরসন করলেন। তাঁর রচিত ব্যাখ্যা আচার্য শীলভদ্র ও তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করল।

অতঃপর হিউয়েন সাঙ পরাজিত ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন – 'তর্কে পরাস্ত হয়ে আমার দাস হয়ে আপনি যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। আপনাকে মুক্তি দিলাম। এখন থেকে আপনি আপনার অভীষ্টকর্মে প্রবৃত্ত হউন।'

ব্রাহ্মণ হিউয়েন সাঙের অনুমতি নিয়ে পূর্বভারতের কামরূপ রাজ্যে গমন করলেন।

কামরূপের রাজা কুমার তাঁর কাছে বিদেশী পণ্ডিতের নানা প্রশংসা শুনে ঐ চিনা পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন নালন্দায়।

কামরূপরাজের প্রতিনিধি তখনো এসে পৌঁছয়নি। একদিন বজ্র নামে এক নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী এসেছিলেন হিউয়েন সাঙের কাছে। বিদেশী অতিথি শুনেছিলেন যে নির্গ্রন্থরা দারুণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। হিউয়েন সাঙ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন – 'এখন ঘরে ফিরতে চাই। জানি না এদেশে থেকে যাওয়া ঠিক হবে, না দেশে ফিরে যাওয়া। তাছাড়া শেষপর্যন্ত দেশে ফিরে যেতে পারব কি না, পৌঁছবো কিনা, তাও জানি না। আপনি যদি গণনা করে বলতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করে বলুন।'

নির্গ্রন্থ বজ্র গণনা করে বললেন – 'এদেশে থেকে যাওয়া আপনার পক্ষে বেশি ভালো কেননা এদেশের ধার্মিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে। দেশে ফিরে যেতে চাইলে তাও সম্ভব হবে। দেশেও আপনি সম্মান লাভ করবেন। তবে এদেশে থেকে যাওয়া বেশি ভালো। আপনার আয়ু আরো দশ বছর আছে। তবে যদি দীর্ঘায়ু

লাভের জন্য সৎকার্য করেন তবে কতদিনের জন্য আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাবে, তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য।'

'— দেশেই ফিরে যেতে চাই। তবে সঙ্গে এত শাস্ত্রগ্রন্থাদি আছে, অনেক বুদ্ধমূর্তি আছে সেসব নিয়ে পৌঁছবো কি করে জানি না।'

'— চিন্তিত হবেন না। রাজা শীলাদিত্য ও রাজা কুমার আছেন, তাঁরা লোকজন দিয়ে আপনার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

তখনো উপরোক্ত দুই রাজার সঙ্গে চিনা পরিব্রাজকের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। তাঁরা কেন সাহায্য করবেন তাঁকে। নির্গ্রন্থ বজ্র আশ্বস্ত করেন — 'উভয়ের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাত হবে। কুমার ইতিমধ্যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই রাজা শীলভদ্রের সঙ্গেও আপনার সাক্ষাত হবে।'

দেশের জন্য পরিব্রাজকের মন উতলা হয়ে উঠল। নালন্দা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে বসলেন। পুঁথি ও বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেকদিন ধরে ঘরছাড়া। মাটির ডাক শুনেছেন। ফিরে যেতে মন পড়ে আছে। বিহারের সমস্ত সন্ন্যাসীরা এসে অনুরোধ জানাচ্ছে — 'থেকে যান এদেশে, থেকে যান আমাদের কাছে। এ হল ভগবান বুদ্ধের দেশ। চিন তো অনেক দূরে। সেদেশে বৌদ্ধধর্মের আর কত কদর হতে পারে! ধর্মই বা সেখানে কতটা মানা হয় কে জানে! আপনি মনেপ্রাণে বুদ্ধের একান্ত অনুগত ভক্ত, আপনি বুদ্ধের দেশে বসবাস করুন।'

হিউয়েন সাঙ বললেন — 'যখন ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন তা প্রচারিত হোক। যারা বুদ্ধবাণী শোনেনি তাদের কথা ভুলি কি করে, বিশেষ করে যখন আমি উপকৃত। চিন অতি সুসভ্য দেশ, সেখানকার লোকজনের আচারআচরণ উচ্চমার্গের; চিন সম্রাট বিচক্ষণ ও অমাত্যবর্গ বিশ্বস্ত। পিতা সন্তানের প্রতি যেমন কোমলহৃদয়, সন্তানও পিতার তেমনি তথোপযুক্ত। সেদেশে দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা শ্রদ্ধার্হ জ্ঞান করা হয়, বৃদ্ধ ও জ্ঞানীরা সম্মানিত হয়ে থাকেন। তারা নির্ণয় করতে সক্ষম, কি সূক্ষ্ম ও কিই বা সুগভীর। তাদের প্রজ্ঞা দেবতাসম। তারা প্রকৃতির নিয়মানুগ কর্ম সম্পাদন করে। সপ্ত গ্রহ তাদের সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে দিতে অপারগ। তারা সময় বিভাগের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে; ছয় সুরের যন্ত্র নির্মাণ করেছে। তারা পশুপাখি বশ করতে জানে; ভূত-আত্মাকে অনুপ্রাণীত করতে জানে। সর্বপ্রাণীর উপকারের জন্য ধনাত্মক-ঋণাত্মক নীতি (ইন ও ইয়াং) প্রয়োগে সক্ষম। পূর্বদেশে বুদ্ধবাণীর উদ্ভব হয়েছে। তারা বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তারা ধ্যানের অভ্যাস করে স্বচ্ছ জলের মত প্রশান্তভাবে। তারা 'বিনয়' নীতি পালন করে ফুলের সৌরভের মতো সুন্দরভাবে। 'দশভূমি' অবস্থা অর্জনের আকাঙ্খায় তারা বোধিসত্ত্ব-কর্ম অভ্যাস করার মনোভাব লালন করে। বুদ্ধের 'ত্রিকায়' লাভের জন্য যুক্তকরে আধ্যাত্মিক উচ্চতা লাভে সচেষ্ট থাকে।

মহান সাধকরা সেদেশে জন্মেছেন চিনের জনগণের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে। তারা তাঁদের চমৎকার শিক্ষা স্বকর্ণে শুনেছে ও তাঁদের স্বর্ণময় উপস্থিতি চাক্ষুষ দর্শন করেছে। তারা অশ্ববাহিত গাড়ির মতো, দুটো অশ্ব তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কতদূর নিয়ে যাবে কেউ জানে না। সেদেশে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেননি বলে কি করে তার নিন্দা করছেন?'

ভিক্ষুরা অধ্যক্ষের কাছে গেল চৈনিক অতিথিকে এদেশে থেকে যাওয়ার আর্জি জানাতে। আচার্য শীলভদ্র প্রিয় শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন – 'তাহলে কি সিদ্ধান্ত হল?'

হিউয়েন সাঙ প্রত্যুত্তরে জানালেন – 'যেদেশে বুদ্ধ জন্মেছেন সেদেশে বাস করতে নিশ্চয়ই অসম্মত হতে পারি না। তবে এদেশে এসেছি সত্য ধর্ম জানতে। সমস্ত মানবকুলের মঙ্গলের জন্য। এই আগমনের ফলে সৌভাগ্যবশতই আপনার কাছ থেকে যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি। সেজন্যে আমার সকল সন্দেহের নিরসন হয়েছে। এখানকার সমস্ত পুণ্য তীর্থ দর্শন করেছি আর প্রাণভরে নানা শাখার শিক্ষাদি লাভ করেছি – যেজন্য মনে হয় আমার এদেশে আসা ব্যর্থ হয়নি। এখন আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই। যা শিখেছি সেসব চিনা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। কারণ অন্য যারা শিক্ষালাভ করতে চায়, তাদেরও তা জানার সুযোগ করে দিতে হবে। এভাবে আমি আমার গুরুদক্ষিণা দিতে চাই। সেকারণে আর আমি এখানে থাকতে চাই না।'

এই বলে অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

অধ্যক্ষের মন চায় না এমন নিষ্ঠাবান শিষ্যকে বিদায় জানাতে। তবু বিদায় দিতে হবে। স্বদেশকে মুছে দেওয়া যায় না মন থেকে। যে মাটিতে মানুষের জন্ম সেখানে ফিরে যাওয়ার সাধ মানুষের থাকবেই। সেদেশে সত্যধর্ম প্রচার করাও পবিত্র কর্তব্য।

বললেন – 'বোধকরি বোধিসত্ত্বের তেমনই ইচ্ছা আর আমিও এমনটাই প্রত্যাশা করি। বিহারবাসীরা, অতিথিকে আর অনুরোধ জানিয়ে ব্যস্ত করা অনুচিত হবে। তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভালো।'

অতঃপর নালন্দা থেকে মান্য অতিথির বিদায়ের আয়োজন চলতে লাগল।

দিন দুয়েকের মধ্যেই কামরূপ থেকে রাজপ্রতিনিধি এসে পড়ল। আমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসেছে শীলভদ্রের কাছে। হিউয়েন সাঙকে কামরূপে যেতে হবে। সমস্যা হল ইতিমধ্যে রাজা শীলাদিত্য আয়োজিত বিতর্ক সভায় হিউয়েন সাঙের যোগদান স্থির হয়ে গিয়েছে। হীনযানীদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হবে। এমতাবস্থায় কামরূপ যাত্রা করা অসম্ভব।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে প্রতিনিধি চলে গেল। অনতিকালের মধ্যে আবার অনুরোধ জানিয়ে কামরূপের প্রতিনিধি এল। এবারও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তৃতীয়বারে কামরূপ রাজার পত্র এল প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে। পত্রে রাজা কুমার জানিয়েছেন – রাজা শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ নষ্ট করে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষতি করেছিলেন, তিনিও প্রয়োজনে তেমনই এক দুষ্ট রাজা হয়ে উঠতে পারেন। নালন্দা বিহার ধূলিস্মাৎ করে দিতে পারেন!

এরপর আর রাজার আমন্ত্রণ নাকচ করা সম্ভব হল না। অধ্যক্ষও বললেন – 'আমন্ত্রণ গৃহীত না হলে দুর্ভোগ হতে পারে।'

অতএব হিউয়েন সাঙ অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে নালন্দা বিহারকে চিরবিদায় জানিয়ে কামরূপ রাজার প্রতিনিধির সঙ্গে **কামরূপ** যাত্রা করলেন। কাল ৬৪২ খৃষ্টাব্দ। (জীবনীগ্রন্থে যাকে রাজা কুমার বলা হয়েছে, তিনিই ইতিহাসের পাতায় ভাস্করবর্মা নামে পরিচিত। এক বিশাল নদী অতিক্রম করে সেরাজ্যে গমন করতে হয়।)

রাজা কুমার প্রভূত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হল। প্রতিদিন মনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত, খাদ্য-পানীয়, গন্ধ-পুষ্প ও সর্ববিধ উপাচারের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ক-মো-লু-পো বা কামরূপ রাজ্যের বেষ্টনী ছিল ১০,০০০ লি। রাজধানীর ৩০ লি। নিচু ও স্যাতসেতে দেশ : ফসল নিয়মিত জন্মে। কাঠাল ও নারকেল হয় প্রচুর। নগরে স্রোতধারা ও পুষ্করিনী অনেক। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীগণ ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণপীতাভবর্ণ। তারা সৎ হলেও স্বভাবে উগ্র ও রুক্ষ। তবে শিক্ষার্থীরা পরিশ্রমী। রাজ্যবাসী দেবপূজারী – তারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করে না। তাই একটিও সঙঘারাম নেই। বৌদ্ধ যারা আছে তারা গোপনে ধর্মচর্চা করে। কয়েক শত দেবমন্দির আছে। তারা নানা সম্প্রদায়ের ভক্ত। কামরূপের রাজা ব্রাহ্মণ – নারায়ণদেবের বংশজ। সহস্র প্রজন্ম ধরে এই বংশ রাজত্ব করছে। রাজা-প্রজা উভয়ই শিক্ষানুরাগী। রাজা বৌদ্ধ না হলেও শ্রমণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

রাজ্যের পূর্বদিকে সারি সারি পাহাড় পর্বত। প্রধান নগর নেই। বিস্তৃত হয়েছে চিনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার বর্বর রাজ্য পর্যন্ত। অধিবাসীরা তাই অনেকটা মন ও লাও জাতীয়। পর্যটক জেনেছেন যে দু'মাসের পথদূরত্বে চিনরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার সেজুয়ান প্রদেশ পড়ে। অনেক নদনদী ও দুর্গম পর্বত আছে সেপথে। পদে পদে বিপদ আছে বিনাশকারী বাষ্প, লতা-গুল্ম ও বিষধর সাপ থেকে। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে দলেদলে বন্য হাতির পাল বিচরণ করে। ফলে রাজ্য থেকে রণহস্তীর যোগান হয় খুব।

মাসাধিক কাল হিউয়েন সাঙ কামরূপ রাজ্যে বাস করলেন। এদিকে কন্যোধ অভিযান সমাপ্ত করে কান্যকুব্জরাজ শীলাদিত্য ফিরে এসে সংবাদ পেলেন যে রাজা কুমার চৈনিক অতিথিকে সেদেশে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি কামরূপের রাজাকে অবিলম্বে মান্য অতিথিকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। রাজা কুমার সম্মত হলেন না। জানালেন – 'আপনি আমার মাথা নিতে পারেন কিন্তু আমি এক্ষুনি গুরুজিকে পাঠাবো না।'

সে কথা শুনে রাজা শীলাদিত্য পুনরায় প্রতিনিধি পাঠালেন। জানালেন – 'যেহেতু আপনি বলেছেন যে আমি আপনার মাথাখানা পেতে পারি, আপনি তাহলে আমার প্রতিনিধির কাছে সেটাই দিন যাতে সে তা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে।'

রাজা কুমার প্রমাদ গুণলেন। বুঝলেন আর অপেক্ষা করা সঠিক হবে না। স্বয়ং অতিথিকে নিয়ে রওনা দিলেন কান্যকুব্জের দিকে। সঙ্গে গেল ত্রিশ হাজার নৌকা ও বিশ হাজার হাতি। তাঁরা গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাত্রা করেছিলেন। রাজা শীলাদিত্য তখন কজঙ্গলের কাছে অপেক্ষা করছেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তাঁর শিবির স্থাপন করে। সেখানে পৌঁছে উত্তর তীরে রাজা কুমার ও হিউয়েন সাঙ আস্তানা স্থাপন করলেন। তারপর অতিথিকে রেখে রাজা কুমার স্বয়ং নদী পার হয়ে কনৌজরাজের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন।

কনৌজরাজ জিজ্ঞাসা করলেন – 'বিদেশী অতিথি কোথায়? তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন না যে বড়ো?'

কুমার জানালেন – 'আপনি সাধুসন্তদের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তাই চিনা গুরুজীকে আপনার কাছে পাঠানো সঠিক মনে হল না।'

ঠিক হল পরদিন রাজা হর্ষ স্বয়ং অতিথির সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাবেন।

শিবিরে ফিরে রাজা কুমারের মনে হল কান্যকুব্জরাজ হয়তো রাতেই হিউয়েন সাঙের দর্শনার্থী হবেন। সেইমতো তাঁরা উভয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

রাতের প্রথম প্রহরে নদীর বুকে সহস্র আলো দেখা গেল। সেই সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। কনৌজ রাজের আগমন ঘটল। রাজা কুমারও আলোকমালা নিয়ে রাজার অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হলেন।

শীলাদিত্যর সঙ্গে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সাক্ষাত হল। অতিথির পদতলে পুষ্প নিবেদন করে যথোচিত পূজাসম্মান প্রদর্শন করার পর রাজা শীলাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন – 'ইতিপূর্বে আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তাঁর না আসার কারণ কি?'

অতিথি জানালেন – 'দূরদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি। পাঠ অসমাপ্ত ছিল বলে আমন্ত্রণ মান্য করা সম্ভব হয়নি।'

শীলাদিত্য জানতে চাইলেন – 'শুনেছি চিনে খুব প্রচলিত 'যুবরাজ চিনের বিজয়' নামে এক সঙ্গীত। তা ওই রাজার সুকৃতি কিপ্রকার যে এত প্রশংসা প্রাপ্য হয়।'

হিউয়েন সাঙ জানালেন – 'চিনেদেশে প্রজানুরঞ্জনে যারা সফল হন তাদের উদ্দেশে গীত রচনার রীতি আছে। যুবরাজ চিন বর্তমানে চিনের শাসক। তিনি সিংহাসনারোহণের আগেই দেশকে অরাজকতা, নানা দুর্যোগ, প্রজাবিদ্রোহ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করেছেন। সমগ্র দেশে ও জগতে শান্তি স্থাপন করেছেন। রাজ্যবাসীরা তাঁর এই সৎকর্মের জন্য প্রশংসাসূচক গীত রচনা করেছে।'

পরদিন অতিথিকে রাজা শীলাদিত্য আপন শিবিরে আমন্ত্রণ জানালেন।

সকালেবেলায় চিনা অতিথি রাজ সকাশে উপস্থিত হলে রাজা ও তাঁর কুড়িজন গুরু অভ্যর্থনা জানালেন। অতিথিকে প্রাসাদে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। সঙ্গীত সহকারে তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। খাদ্য পরিবেশন করা হল। পুষ্পবৃষ্টি হল। তারপর

রাজা বিদেশী অতিথি রচিত 'হীন মতবাদের খণ্ডন' নামক একটি রচনাটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঐ রচনায় হিউয়েন সাঙ হীনযান মতবাদ খণ্ডন করে মহাযান মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজা উক্ত পুঁথি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন। তারপর উপস্থিত গুরুজনদের জানালেন – 'আপনারা এর বিপরীত কথাই বলে এসেছেন। আপনারা কি এই মতবাদ খারিজ করতে পারেন?'

উপস্থিত রাজপণ্ডিতেরা ঐ বিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সক্ষম হল না। কনৌজের প্রধান রাজপণ্ডিত দেবসেন অনুপস্থিত। বৈশালী গিয়েছেন। হয়তোবা এই প্রকার বিতর্কসভা হতে পারে অনুমান করে এড়িয়ে গিয়েছেন।

রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী (রাজ্যশ্রী) বুদ্ধিমতী এবং সাম্মিতীয় মতাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। রাজাসনের পিছনেই উপবিষ্টা ছিলেন। হিউয়েন সাঙের ব্যাখ্যা শ্রবণ কবে চিনা অতিথির প্রশংসা করলেন। রাজা শীলাদিত্য তখন বললেন – 'মহাযানের এই মতবাদ অতি উচ্চ স্থানীয়। তবু হীনযানীরা তাদের নিজস্ব মতাদর্শ আঁকড়ে থাকতে পারে। সেজন্যে এক আলোচনা সভা হওয়া প্রয়োজন।'

সেদিনই কান্যকুব্জ রাজ এক মহতী আলোচনা সভার উদ্যোগ নিলেন। রাজধানী কান্যকুব্জে সেই সভা অনুষ্ঠিত হবে। চৈনিক শিক্ষক রচিত পুঁথিটি নিয়ে দেশের সকল পণ্ডিতদের সঙ্গে আরো আলোচনা হবে – এই মর্মে রাজাদেশ ঘোষিত হল।

তারপর কজঙ্গল থেকে নৌকাযোগে রাজা শীলাদিত্য, রাজা কুমার ও হিউয়েন সাঙ **কনৌজে** উপনীত হলেন।

রাজার আদেশে ইতিমধ্যে সেখানে ধর্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভাস্থলে দুটি বিচালী আচ্ছাদিত বৃহৎ সভাস্থল নির্মাণ করা হয়েছে। একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপনের জন্য অন্যটি সমাগত সন্ন্যাসীদের জন্য। প্রতি সভাস্থলে সহস্র মানুষের স্থান সংকুলান হয়। রাজার সাময়িক বাসভবন সভাস্থল থেকে পাঁচ লি পশ্চিমে।

ভারতের পাঁচটি অঞ্চল থেকে অষ্টাদশ রাজা সমবেত হয়েছেন। হীনযান-মহাযান উভয় শাখায় পণ্ডিত তিন সহস্রের অধিক বৌদ্ধশ্রমণ ও ভিক্ষু আচার্যরা এসেছেন। দ্বিসহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-নির্গ্রন্থ এসেছেন। নালন্দা মহাবিহার থেকে এসেছেন সহস্রাধিক শ্রমণ।

রাজভবনে স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছে। সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সেই মূর্তি সভাস্থলে নীত হল। ইন্দ্র সদৃশ শোভমান রাজা শীলাদিত্য শ্বেত চামর হস্তে ডানদিকে এবং ব্রহ্মার মতো দর্শনধারী রাজা কুমার ছত্র হস্তে বামদিকে রইলেন। উভয়ে মুকুট, মালা ও মুক্তা-মরকতে সুসজ্জিত। বুদ্ধমূর্তির পিছনে দুটি হস্তী পুষ্পরাজি বহন করছিল। তারা যাত্রাপথে পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল। রাজহস্তীর পিছনেই হিউয়েন সাঙের ও রাজগুরুদের হস্তীদল। অষ্টাদশ রাজন্যবর্গ ও অন্যান্যরা সুসজ্জিত হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে সঙ্গে রইলেন। তিন শত হস্তীর শোভাযাত্রা ছিল।

সভাস্থলে পৌঁছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি একটি মহামূল্য আসনে স্থাপিত হল। রাজা শীলাদিত্য ও চিনা অতিথি প্রথমে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর আঠারো রাজা, নানা দেশ থেকে আগত উচ্চমার্গীয় সহস্র আচার্য পূজা নিবেদন করলেন। তারপর পাঁচশ' ব্রাহ্মণ ও নানাদেশের দুশ' অমাত্য অর্চনা করল। চত্বরের বাইরে তখন অবস্থান করছিল অসংখ্য বিধর্মী ভক্ত ও আমজনতা।

সভামণ্ডপের ভিতরে বাইরে উপস্থিত সকলকে সুখাদ্য দান করার পরে বুদ্ধের নিকট একটি স্বর্ণপাত্র, একটি স্বর্ণময় ধর্মদণ্ড, তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, তিন সহস্র রৌপ্যমুদ্রা ও তিন সহস্র বস্ত্র দান করা হল। অন্য সন্ন্যাসীরাও যথোচিত উপহার লাভ করলেন।

চৈনিক অতিথিকে সভাপতির আসনে বসানো হল। সভায় যে শাস্ত্রলিপিখানি নিয়ে আলোচনা হবে নালন্দার শ্রদ্ধেয় আচার্য বিদ্যাভদ্র সেটি পাঠ করলেন সকল শ্রোতার সামনে। ঘোষণা করলেন – 'যদি ঐ লিপি অযৌক্তিক ও খণ্ডনযোগ্য হয় তবে দোষস্বীকার করে শাস্ত্ররচয়িতা শিরঃশ্ছেদ করবেন বলে মনস্থ করেছেন।'

তারপর আলোচনা শুরু হল। পরপর পাঁচদিন ধরে। উক্ত মতবাদ খণ্ডিত হল না। তখন হীনযানী বৌদ্ধ ও অন্য বিধর্মীর দল অতিথিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। রাজা হর্ষবর্ধন কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের অপকর্ম হতে নিরস্ত করলেন। ক্রমাগত আঠারো দিন ধরে আলোচনা হল। তবু ঐ রচনাটি খণ্ডন করা গেল না। কনৌজের সেই মহাসম্মেলনে হিউয়েন সাঙ পাঁচশত ব্রাহ্মণ, জৈন এবং অন্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিদকে বিতর্কে পরাস্ত করলেন। সভাশেষে রাজা হর্ষবর্ধন জয়ী অতিথিকে দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা, ত্রিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা, একশত বস্ত্র দান করলেন। অন্য রাজারাও প্রভূত দানধ্যান করলেন।

তারপর সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়ে চিনা পরিব্রাজককে জনসমাগমের মধ্য দিয়ে যাত্রা করানো হল। মহাযান মতের জয় ঘোষণা করে ধর্মসভা ভঙ্গ হল। মহাযানীরা তাঁকে 'মহাযানদেব' নামে সম্মান জানাল। হীনযানীরাও তাঁকে 'মোক্ষদেব' উপাধি দিল। রাজাবাসের পশ্চিমে এক মন্দির ছিল আর সেখানে কাশ্মীর থেকে উদ্ধার করা বুদ্ধের দন্তাবশেষ সুরক্ষিত ছিল। তর্কসভায় পূজিত স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি দান করা হল ঐ মন্দিরে।

পরদিন ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ রাজার কাছে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পার্থনা করলেন। রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে বললেন আসন্ন প্রয়াগের ধর্মসম্মেলনের কথা। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে তিনি রাজত্ব করছেন। সর্বদাই চিন্তিত থাকেন যাতে তাঁর আনন্দ ও পুণ্যকর্ম হ্রাস না পায়। তাই পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে পঁচাত্তর দিন ধরে দানকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

ধর্মপ্রাণ হিউয়েন সাঙ এমন সৎকর্মে উদাসীন থাকতে পারলেন না। স্বদেশে যাত্রা পিছিয়ে দিলেন। রাজার সঙ্গে **প্রয়াগ** নগরে উপনীত হলেন।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। হর্ষদেবের দক্ষিণেই তাঁর আসন। সেই সঙ্গে কুড়িটি রাজ্যের কুড়িজন রাজা আমন্ত্রিত হয়েছেন। রাজা শীলাদিত্যের নিবাস নির্মিত হয়েছে গঙ্গার উত্তর তীরে। রাজা ধ্রুবদত্তর নিবাস হয়েছে সঙ্গমের পশ্চিমে। রাজা কুমার আস্তানা পেতেছেন যমুনার দক্ষিণ তীরের পুষ্পোদ্যানে।

কনৌজ ধর্মসভা আরম্ভ হওয়ার একুশ দিন পরে প্রয়াগের উৎসব শুরু হল। সম্ভবত ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। এটি শীলাদিত্যের ষষ্ঠ মহামোক্ষ পরিষদ।

গঙ্গা-যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে (প্রয়াগে)আয়োজিত হয়েছে। চৌদ্দ-পনেরো লি সীমানার এক প্রান্তর আছে । দানক্ষেত্র রচিত হল সেখানে। খড়ের ছাউনি দেওয়া আস্তানা নির্মিত হল দানসামগ্রী রাখার জন্য। দানের জন্য স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, চুনি, পান্না, নীলকান্তমণি ইত্যাদি রত্নাদি ছিল। রেশম বস্ত্র, পশম বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। রাজাজ্ঞায় প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল।

সম্মেলনের প্রথম দিনে দানক্ষেত্রের শিবিরে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হল। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পুষ্পরাশি বর্ষিত হল। মহামূল্য দ্রব্যাদি দান করা হল। পরদিন আদিত্যদেব তথা সূর্যের মূর্তি স্থাপিত হল। এবং একই রকমে অর্চনা ও দানকর্ম হল। তৃতীয় দিনে ঈশ্বরদেবের (শিব) মূর্তি স্থাপিত হল। এবং অন্য দিনের মতো পূজার্চনা ও অজস্র দানধ্যান করা হল । চতুর্থদিন থেকে শুরু হল ভিক্ষাদান পর্ব। প্রথমে দশ সহস্র শ্রমণকে দান করা হল। তারা একশত সারিতে উপবিষ্ট ছিল। প্রত্যেক শ্রমণকে একশত স্বর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা, একপ্রস্থ রেশমবস্ত্র ও খাদ্য-পানীয়-ধূপ-ফুল দান করা হল। শ্রমণেরা দান গ্রহণ করে একে একে প্রস্থান করছিল।

দানগ্রহণের জন্য পঞ্চম দলটি ছিল ব্রাহ্মণদের। কুড়ি দিন ধরে তাদের দান করা হল। ষষ্ঠ দলে ছিল বিধর্মীরা। দশ দিন ধরে তাদের দানকর্ম হয়েছিল। সপ্তম দলে ছিল দূরদেশ থেকে আগত প্রার্থীরা। দশদিন লাগল তাদের জন্য। অষ্টম দলে ছিল দরিদ্র ও স্বজনহীনেরা। এক মাস ধরে তাদের ভিক্ষাদান করা হল।

পাঁচ বছর ধরে রাজকোষে সঞ্চিত ভাণ্ডার অকাতরে দান করলেন মহারাজ হর্ষ। দান করা হল না কেবল হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি। রাজা তাঁর অঙ্গবস্ত্র, মুক্তা, কর্ণাভরণ, বলয় কণ্ঠহার ও যাবতীয় রত্নালঙ্কার সবই দান করলেন। তারপর কনিষ্ঠা ভগিনী রাজশ্রীর থেকে পুরোনো মলিন বেশ গ্রহণ করে পরিধান করলেন। বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলেন। দশদিকের দশদিগদেবতাকে প্রণাম জানালেন। প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর দশমুক্তি হয়। প্রজ্ঞা ও গুণে দুই প্রকার গৌরব অর্জিত হয়।

দানপর্ব সাঙ্গ হলে সমবেত রাজন্যবর্গ পুনরায় দানগ্রহীতাদের কাছ থেকে রাজা হর্ষের অলঙ্কার-মুকুট ও অঙ্গবস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে হর্ষবর্ধনকে প্রত্যর্পণ করল। রাজা হর্ষ পূর্ববৎ শোভনীয় হয়ে উঠলেন।

অতঃপর হিউয়েন সাঙ বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুরোধ এল আরো কটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য। এই প্রকার অনুরোধ উপরোধে চলে গেল আরো দশটা দিন। রাজা কুমারও তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বন্ধ করতেই অধিকতর আগ্রহী।

চৈনিক অতিথি হৃদয়ঙ্গম করছিলেন তাঁদের মনোভাব। তাদের আন্তরিকতা। কিন্তু তাঁর জীবনের একটা কর্তব্য আছে। একটা ব্রত আছে। তিনি বললেন – 'চিনরাজ্য এদেশ থেকে অনেক দূরে। অনেকদিন পরে সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছে। আমরা তার কিছু কিছু বিষয় জানি, সবটা জানি না। সেজন্যে আমার এদেশে আসা। যা জানি না তার খোঁজে। আমার দেশের ঋষি যারা বুদ্ধধর্ম আরো জানতে চেয়েছেন তাদের আন্তরিকতার জন্যই আমার এই সাধ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। আমি তো কখনো তাঁদের ভুলতে পারি না। শাস্ত্রেই বলা হয়েছে যারা ধর্ম প্রবর্তনায় বিঘ্নকারী, তারা ভবিষ্যৎ জন্মে বহুবার চক্ষুহীন হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে! আপনারা যদি আমাকে এদেশে রেখে দেন তবে ওদেশের বহু মানুষকে ধর্মশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না কি যে তাহলে চক্ষুহীন-জন্ম নিয়ে কুকর্মের শাস্তিটা ভয়ানক হবে?'

এরপর কি আর অসম্মতি জানানো যায়? রাজানুমতি পাওয়া গেল। রাজা হর্ষ তাঁকে দক্ষিণের সমুদ্রপথ দিয়ে দেশে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ সম্মত হলেন না কেননা তিনি চিনসীমান্তে অবস্থিত কাওচাঙের রাজাকে কথা দিয়ে এসেছেন, তাঁর দেশ হয়ে প্রত্যাগমন করবেন। সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে।

রাজা হর্ষ জানতে চাইলেন – 'যাত্রাপথের জন্য আপনার কত খরচ প্রয়োজন?'

'– কিছুমাত্র নয়।' পরিব্রাজকের উত্তর।

তবু কনৌজরাজ পরিব্রাজকের ব্যয়নির্বাহের জন্য পয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি দিলেন। রাজা কুমারও তাঁকে নানা রসদ দিলেন। হিউয়েন সাঙের খুব পছন্দ হল রাজা কুমারের দেওয়া উত্তম পশমে তৈরী হারালি (হাতাশূন্য ঢিলা জামাবিশেষ) পরিধেয়খানি। বর্ষার সময় এই বসনটি কাজে লাগবে।

রাজন্যবর্গ কয়েক লি দূর পর্যন্ত মান্য অতিথির অনুগমন করলেন। তারপর দূরদেশের অতিথিকে বিদায় জানালেন। বিদায়বেলায় অশ্রুধারা বাধা মানল না। মিলনের পরে বিচ্ছেদ এক অনিবার্য সত্য। মিলনের আনন্দ ও বিরহের বেদনা উভয়ই সমভাবে গ্রহণ করাই উত্তম শিক্ষা।

ভারতভূমি ত্যাগ করে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন মহান পরিব্রাজক ভক্ত ও জ্ঞানতাপস চিনা অতিথি – হিউয়েন সাঙ। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে।

১১। প্রত্যাবর্তন

কনৌজ - কৌশাম্বী - জালন্ধর - সিংহপুর - তক্ষশীলা - লম্পক - সাওকুটা - বৃজিস্থান - কপিশ - অন্তরাব - খোস্ত - কুন্দুজ - মুঞ্জন - হিমতল - বাদাকসান - ইয়মগান - কুরান - টার্মিস্তাত - শিগনি - শাওমি - পামির - ওশ - কাশগর - চেকুক - খোটান - পিমো - নিয়া - চের্চেন - সাচাউ - লিয়াংচাউ - চ্যাঙান

কনৌজ থেকে স্বদেশের পথে রওনা দিলেন। সঙ্গে সসৈন্যে উত্তর ভারতের রাজা উদিত। রাজা শীলাদিত্য সম্মানিত অতিথির যাত্রাপথের ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজা উদিতের কাছে একটি মহামাতঙ্গ, তিন হাজার সুবর্ণমুদ্রা ও দশ হাজার রজতমুদ্রা দিলেন।

তিন দিন পরে রাজা শীলাদিত্য কয়েক শত অশ্বারোহী, রাজা কুমার ও রাজা ধ্রুবপঠকে সঙ্গে নিয়ে আবার অতিথিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলেন। এতই গভীর তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল চৈনিক অতিথির প্রতি যে তাঁর জন্য চারজন 'মহাতার' রাজকর্মচারী সঙ্গে দিলেন। আর দিলেন শ্বেত রেশমের উপর রক্তিম শীলমোহর করা রাজার পত্র। পথে যত রাজ্য পড়বে সেই সব রাজ্যের রাজার নামে। সকলে যেন পরিব্রাজককে অশ্ব দিয়ে সাহায্য করেন যতক্ষণ না তিনি হান রাজ্যে উপনীত হতে পারেন।

প্রয়াগ থেকে যাত্রা করে সাতদিন ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে হেঁটে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে এসে উপনীত হলেন **কৌশাম্বী** রাজ্যে। নগরের দক্ষিণে প্রবীণ গোশিলের উদ্যান যা তিনি বুদ্ধকে দান করেছিলেন। ভগ্ন রাজপ্রাসাদের মধ্যে চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধের দেহধাতু রক্ষিত স্তূপ, বুদ্ধের স্নানাগার – সেইসব পুণ্যস্থান পুনরায় দর্শন করে রাজা উদিতের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করলেন। এক মাসের উপর। পথে অনেক রাজ্য অতিক্রম করতে হল। দর্শন করলেন নানা তীর্থ। তিন যোজন দূরে পড়ল **ভিলসণ** রাজ্যের রাজধানী। অহিচ্ছত্র থেকে সেবার এখানে এসেছিলেন। সাক্ষাত হল সতীর্থ সিংহপ্রভ ও সিংহচন্দ্রের সঙ্গে। দু'মাস সেখানে বসে শাস্ত্রচর্চা করলেন।

আবার পথচলা। উত্তর-পশ্চিম দিকে। মাসাধিক কাল নানা দেশ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন **জালন্ধর**। রাজা উদিতের রাজ্যে। প্রায় দশ বছর আগে এসেছিলেন। নাগরধ্যান মঠের চন্দ্রবর্মনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। সেবার চার মাস ছিলেন জালন্ধরে। এবারেও তাঁকে এক মাস থাকতে হল। রাজা উদিত তাঁর পশ্চিমে যাত্রাপথের জন্য উপযুক্ত সঙ্গীদল নির্বাচন করে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। কুড়ি দিন পরে পৌঁছলেন **সিংহপুর** রাজ্যে। রাজ্যের রাজধানী কেতস – লবণ পর্বতের উত্তর ঢালে অবস্থিত; পিণ্ডদাদনখান থেকে ষোলো মাইল ও চাকোয়াল থেকে আঠারো মাইল দূরে।

হিউয়েন সাঙের সঙ্গে উত্তরাপথের আরো একশত সন্ন্যাসী দেশে ফিরছিল শাস্ত্র ও বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করে। সিংহপুর থেকে কুড়ি দিন ধরে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। এলাকায় দস্যু ডাকাতের দল ছিল অনেক। হিউয়েন সাঙ গমনপথের আগে আগে একজন শ্রমণকে যেতে বলেছিল। যদি দস্যুডাকাতের দেখা মেলে, তবে তাদের আগাম জানানো হবে যে তাঁর কাছে রয়েছে কেবল শাস্ত্রপুঁথি, বুদ্ধমূর্তি ও পূতাস্থি যাতে যাত্রাপথে তাঁদের কোন বিপদ আপদ না হয়। ঘটনাচক্রে অনেকবার দস্যুদলের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল। তবে তারা কোন ক্ষতি করেনি।

বিশ দিন চলার পরে পৌছলেন প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র **তক্ষশীলা** রাজ্যে। পূর্বজন্মে রাজা চন্দ্রপ্রভা সহস্রবার মস্তক দান করেছিলেন – সেই পুণ্যস্থানটি আবার দর্শন করলেন। মাত্র পঞ্চাশ যোজন দূরে কাশ্মীর রাজ্য। সেবার তক্ষশীলা থেকে কাশ্মীরে যাত্রা করেছিলেন। দুটি বৎসর বাস করেছিলেন সেখানে। চিনা পণ্ডিতের আগমন সংবাদ পেয়ে কাশ্মীরের রাজা প্রতিনিধি মারফত আরেকবার কাশ্মীরে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাল। হাতির পিঠে পচুর মালপত্র নিয়ে যাত্রা করতে হচ্ছিল বলে সেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হল না। সাত দিন তক্ষশীলায় অবস্থান করে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করলেন।

তিন দিন পরে এসে পৌছলেন সিন্ধু নদের তীরে। পাঁচ-ছয় লি প্রশস্ত নদী। অতিক্রম করতে গিয়ে সমস্যা হল। তাঁরা যখন মাঝনদীতে, সহসা ঝড় উঠল। শাস্ত্রগ্রন্থাদি রক্ষার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছিল সে ভয়ে এমনই নাজেহাল হল যে নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল। তার প্রাণরক্ষা হল বটে তবে পঞ্চাশটি পুঁথি ও কিছু দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় ফুলের বীজ জলে পড়ে হারিয়ে গেল। হিউয়েন সাঙ হস্তীপৃষ্ঠে নদী পার হলেন।

কপিশের রাজা তখন উদকখণ্ড নগরে ছিলেন। স্থানটি আটকের উত্তরে আধুনিক উন্ড হবে হয়তো। অতিথির আগমনসংবাদ পেয়ে নদীতীরে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর যখন শুনলেন যে অতিথি পরিব্রাজক ফুলের বীজ নিয়ে নদী পার হতে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন – 'মাঝদরিয়ায় ঝড়ের কারণ ফুলের বীজ। আগে কখনো কেউ ফুলের বীজ নিয়ে নদী পেরোতে পারে নি।'

তারপর কপিশার রাজা হিউয়েন সাঙকে নিয়ে নগরে ফিরলেন। সেবার হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে আসার সময় এই রাজ্যের রাজাই বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে তখন ছিল আচার্য প্রজ্ঞাকর। দ্বিতীয় দফায় এসে কপিশার বিহারে পঞ্চাশ দিন বাস করতে হল। এবারেও তিনি শলাকা বিহারে ছিলেন কিনা বলা হয়নি। কপিশার রাজা হাত পুঁথির নকল আনতে উদয়নে লোক পাঠিয়েছেন। কাশ্যপ শাখার ত্রিপিটক গ্রন্থ সেখানে পাওয়া যাবে।

এদিকে কাশ্মীরে না যাওয়ার জন্য কাশ্মীরের রাজাই ছুটে এলেন প্রিয় অতিথিকে শেষ বিদায় জানাতে। কী বিস্ময়কর এই সম্মান! কী অভাবিত এই অভ্যর্থনা! এমনটা

সত্যি সহসা কোথাও হয় না! রাজা এলেন আর সারাটা দিন বিদেশী অতিথির সান্নিধ্যে কাটিয়ে তারপর বিদায় নিলেন।

এরপর কপিশার রাজার পরিসেবায় উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করে মাসাধিক কাল লাগল **লম্পক** রাজ্যে পৌঁছতে। আগেই বলা হয়েছে কাবুল নদীর উৎসের কাছে অবস্থিত লমঘন অতীতের লম্পক। ইতিমধ্যে যুবরাজকে রাজার নির্দেশ – আগেভাগে রাজধানী পৌঁছে সম্মানীয় অতিথিকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে। পিছনে রাজা ও অতিথি ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। রাজধানী পৌঁছে দেখলেন কয়েক হাজার মানুষ সন্ন্যাসী ভিক্ষু পতাকা হাতে শোভাযাত্রা করে অতিথিকে নিয়ে যেতে নগরপ্রাচীরের বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা চৈনিক পণ্ডিতের পুনরায় দর্শনলাভ করে আনন্দ প্রকাশ করল। ভূয়সী প্রশংসা জ্ঞাপন করল অতিথির। রাজধানীতে হিউয়েন সাঙ মহাযান বিহারে রাত্রিবাস করলেন। এই উপলক্ষ্যে রাজা পাঁচাত্তর দিন ধরে ভিক্ষাদান উৎসবের সূচনা করলেন।

লম্পক থেকে পনেরো দিন ধরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে ফ-ল-ন অথবা **বরণ** (বান্নু) রাজ্যে পৌঁছলেন। গুমল নদীর মধ্যপথে অবস্থিত রাজ্য। কপিশা রাজ্যের অধীনস্থ দেশ – আয়তন ৪০০০ লি সীমানায় ঘেরা। রাজধানী ২০ লি সীমানায় বেষ্টিত। পর্বত অরণ্যে ভরা শীতের দেশ। ঘন জনবসতি আছে। অধিবাসীরা সাহসী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। বেশ কিছু বিহার থাকলেও অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধ সংখ্যায় তিনশ'র মতো। পাঁচটি দেবমন্দির আছে – প্রধানত পাশুপত ধর্মীয়দের জন্য। নগরের দক্ষিণে প্রাচীন বিহারে তথাগত ধর্মপ্রচার করেছিলেন। লোকে বলে, রাজ্যের পশ্চিমে কি-কিয়াং-ন বা কিকন রাজ্য। খণ্ড খণ্ড উপজাতির বাস। রাজা নেই। সেখানে ভেড়া ও অশ্ব পালিত হয়। এখানকার অশ্বাদি বড়ো আকারের বলে চাহিদা খুব।

তারপর উত্তর-পশ্চিমে অ-পো-কন (**অভকন**) হয়ে সাও-কু-টা (**জাগুদা**) রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। রাজধানীর নাম হো-সি-না (যাকে আফগানিস্তানের গজনি অথবা আরো সঠিকভাবে গজনীর কাছে জবল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে)। রাজধানীর সীমানা ৩০ লির মতো। দ্বিতীয় রাজধানীর নাম হো-সা-লো (গুজরা বা গুজারিস্তান)। পার্বত্য এলাকা। উঁচু জমি। অন্যতম উৎপাদন গম। এখানে লো-মো-ইন-তু (হেলমন্দ) নদীর উপত্যকায় হিঙ উৎপাদিত হয়। রাজ্যে প্রধানত জাফরান ও হিঙ জন্মে। কয়েক শত বিহার আছে। দশ হাজার মহাযানী বৌদ্ধ বাস করে। গোটা দশেক অশোকস্তূপ আছে। দেবমন্দিরও আছে। তীর্থিকের সংখ্যা বেশি – তারা পূজা করে শু-না (চু-না) দেবতার যিনি কপিশের মাউন্ট অরুণ থেকে রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত শু-ন-হি-লো পর্বতে উপনীত হয়েছেন। দেশের লোক ঐ দেবতাকে ভয় ও ভক্তি করে। তাঁর পূজার জন্য দূরদেশ থেকেও পূজার্থীর আগমন হয়। রাজ্যবাসীরা আবেগপ্রবণ ও কপট। কার্যসম্পাদনে আগ্রহী কিন্তু বুদ্ধিহীন চতুর।

সাওকুটা থেকে ৫০০ লি উত্তরে পড়ল ফু-লি-শিহ-স-তং-ন (**বৃজিস্থান** বা ওয়র্ধস্থান) রাজ্যে। অবস্থান গজনির চল্লিশ মাইল উত্তরে ওয়র্ধাকে। আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ২০০০ লি ও উত্তর-দক্ষিণে ১০০০ লি। রাজধানীর নাম হু-পি-ন যাকে আধুনিক হুপিয়ান বা কাবুল হিসেবে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। রাজা তুর্কি বৌদ্ধ। শীতের দেশ। অধিবাসীরা দুর্দম প্রকৃতির। অনেকটা সাওকুটার মতো দেশ হলেও রাজ্যের ভাষা অন্যরকমের।

হিউয়েন সাঙ অন্যান্যদের সঙ্গে অনেক পর্বত ও নদনদী অতিক্রম করে অগ্রসর হলেন কপিশার সীমান্ত রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে। উপনীত হলেন হিন্দুকুশ পর্বতমালার পোলোসেন পর্বতে। অত্যন্ত উঁচু অত্যন্ত খাড়াই সেই পর্বত। সঙ্কীর্ণ চড়াই পাকদণ্ডী পথ। খাড়া পাহাড় একে অপরকে ছাড়িয়ে উন্নত। গভীর খাদ থেকে উত্তুঙ্গ শিখরে যাত্রা করতে হয়। মাঝ গ্রীষ্মেও ভয়ানক ঠাণ্ডা। বরফের মধ্যে কেটে কেটে পা ফেলে অগ্রসর হওয়া। তিনদিন ধরে চড়াই ভেঙে তবে গিরিপথে ওঠা গেল। মনে হয় এখানে পঞ্জশির উপত্যকার শীর্ষে হিন্দুকুশের খেবক বা খাওয়াক পাসের কথা বলা হচ্ছে। তীব্র শীতার্ত বাতাস বইছিল। নিচের উপত্যকা ভরে উঠছিল ঝুরো ঝুরো বরফে। এক লহমার জন্য পথিক বিশ্রাম নিতে পারে না। এমন কি পরিযায়ী পাখিরা পর্যন্ত এখানে উড়ে যেতে পারে না, তারা পায়ে পায়ে নিচে নেমে আসে। নিচের দিকে দৃষ্টি দিলে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়ের তাল নজরে আসে। জম্বুদ্বীপের সর্বোচ্চ পর্বতমালা এটাই। নিষ্পাদপ জায়গা। রয়েছে শুধু পাথুরে শিখরের অরণ্য।

এমনি করে পূর্বদিকে যেতে যেতে **কপিশা** (কাফিরিস্তান) রাজ্য এসে গেল। রাজা সঙ্গে ছিলেন। রাজ্যে পৌঁছে তিনি সাতদিন ধরে বিশাল ভিক্ষাদান উৎসবের সূচনা করলেন। তারপর পা বাড়ালেন উত্তর-পূর্ব দিকে। এক যোজন এগিয়ে কপিশার রাজধানী গ্রোসপম নগরে পৌঁছলেন। এতটা পথ স্বয়ং রাজা তাঁকে সঙ্গ দিয়ে নিয়ে এসেছেন। অতঃপর হিঁউয়েন সাঙকে বিদায় জানাতে হল। রাজা তাঁর এক মন্ত্রীকে সঙ্গে দিলেন। তার সঙ্গে দিলেন পশুখাদ্য, রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বয়ে নিয়ে যেতে একশত কুলি।

সাতদিন চলার পরে সদলবলে বিশাল পর্বতের শিখরে উঠতে পারলেন। চারদিকে নানা আকারের গিরিচূড়া আর অসংখ্য শৃঙ্গ। এই পাহাড়ে চড়াই ভেঙে চলার দুঃসহ কষ্ট বর্ণনাতীত। হিঁউয়েন সাঙ ঘোড়ায় চড়ে আর চলতে পারছেন না। লাঠি হাতে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন।

আরো সাতদিন চলার পরে তাঁরা এক বিশাল পর্বতের কাছে পৌঁছলেন। নিচে একশ' পরিবারের গ্রাম। সেখানকার পালিত ছাগল গাধার মতো বড়োসরো। সন্ধ্যাবেলা কাটালেন ঐ গ্রামে। মধ্যরাতে যাত্রা শুরু করলেন। তুষার পর্বত (হিন্দুকুশ পর্বত?) অতিক্রম করতে হবে। গ্রামের কয়েকজনকে বললেন, পার্বত্য উটে চড়ে তাঁদের পথ প্রদর্শন করতে। স্থানটি বরফ-খাদে আর হিমবাহে ভরা। গ্রামের পথপ্রদর্শক ছাড়া চলতে

গেলে তাঁরা ঐ খাদে গিয়ে পড়বেন নিশ্চিত। একদিন পরে তুষার পর্বত অতিক্রম করতে সফল হলেন। গিরিশিরা অতিক্রম করে ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন মাত্র সাতজন সন্ন্যাসী, কুড়িজন কুলি, একটি হাতি, দশটি খচ্চর ও চারটি ঘোড়া সঙ্গে রয়েছে।

পরদিন পর্বতের পাদদেশে উপনীত হলেন। পাকদণ্ডী পথে আরো একটি পর্বতমালা অতিক্রম করতে হল। দূর থেকে যাকে তুষার পর্বত মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে দেখেন সেটি সাদা পাথরের পর্বত। সন্ধ্যায় পর্বতশীর্ষে আরোহণ করতে পারলেন। ভীষণ ঠাণ্ডা। বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব। গাছপালা নেই। রাশি রাশি পাথর আর খাড়াই পাহাড়। যেন পাথরের অরণ্য। উত্তুঙ্গ পর্বত ও প্রবল বাতাস থাকার জন্য এর উপর দিয়ে পাখি পর্যন্ত উড়তে পারে না। কয়েক শ' পা ডানা মেলে যেতে পারে শুধু। জম্বুদ্বীপের পর্বতমালার মধ্যে উচ্চতায় বুঝি একে অন্য পর্বতগুলি পরাস্ত করতে পারে না।

উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে অবতরণ করে কয়েক লি চলার পরে খানিকটা সমতল ভূমি পাওয়া গেল। রাতের মতো সেখানে বিশ্রাম নিলেন। পরদিন আবার চলা। পাঁচ-ছয় দিন চলার পরে পার্বত্যরাজ্য ছেড়ে এসে পৌঁছলেন অন-ত-ল-ফো (**অন্তরাব**) রাজ্যে। সম্ভবত এটি আধুনিক কালের তেলিঙ্গন রাজ্যে। তুখারা রাজ্যের প্রাচীন অংশ। আয়তন ৩০০০ লি সীমানায়। রাজধানী ১৪-১৫ লির মতো পরিধির। পার্বত্য এলাকা। কৃষিজমি সামান্য। অধিবাসীরা প্রচণ্ড প্রকৃতির – কোন রকম সামাজিক নিয়ম-প্রণালী নেই, না আছে নৈতিক প্রতিদান না আছে শিক্ষাব্রতীর সম্মান। তিন সঙ্ঘারামে বেশ কিছু শ্রমণ আছে। মহাসাঙ্ঘিক শাখার বৌদ্ধ তারা। একটি অশোক স্তূপ আছে। দেবমন্দিরে প্রতি মনোযোগ অধিক। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বলতে কিছু নেই।

পাঁচ দিন বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গতিমুখ উত্তর-পশ্চিমে। দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে পৌঁছে পর্বতমালা অতিক্রম করে বেশ কয়েকটি ছোট নগর পেরিয়ে গেলেন। ৪০০ লি পথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন কুয়ো-সি-তো বা **খোস্ত** রাজ্যে। তুখারার প্রাচীন রাজ্য। সীমানা ৩০০০ লি না ১০০০ লি স্পষ্ট নয়। তুর্ক রাজ্যের অধীনস্থ দেশ। রাজধানীর সীমানা দশ লির মতো। ফসল ভালোই জন্মে। ফল ফুলও হয়। রাজ্যবাসীরা প্রচণ্ড প্রকৃতির ও বিশৃঙ্খলপরায়ণ। তিনটি বিহার আছে। বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই কম।

আবার পাহাড় পর্বত উপত্যকা ভেঙে গোটাকয়েক নগর পেরিয়ে পৌঁছলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩০০ লি দূরের **কুন্দুজ**। অন্য নাম হুয়োহ রাজ্য। অবস্থান তুখারা রাজ্যের পূর্বতম সীমায়। ৩০০০ লি সীমান্ত। বক্ষু (অক্সাস বা পো-চু) নদীর ডান তীরে রাজধানী ২০ লি সীমানা ঘেরা। লৌহদ্বার পেরিয়ে সেবার পা রেখেছিলেন কুন্দুজে। তারপর গিয়েছিলেন বামিয়ান। রাজ্যটি মোটামুটি সমতলভূমিতে অবস্থিত। চাষবাস নিয়মিত হয়। গাছপালা আছে; ফুল ফল যথেষ্ট। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা সদাচারী

কিন্তু আবেগপ্রবণ। জমাট বা মোটা পশমের বস্ত্র পরিধান করে। বৌদ্ধ সংখ্যায় অধিক। দশটির বেশি বিহার আছে। কয়েক শত হীনযানী ও মহাযানী। দেবপূজকরাও আছে। রাজা তুর্কি; লৌহ-গিরিপথের দক্ষিণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক – নির্দিষ্ট রাজধানী বা প্রাসাদ নেই; রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়ান।

রাজা সেহু খানের পৌত্রের সঙ্গে দেখা হল। যেহেতু ইনি জেনারেল তার্দুর পরে তুখারা শাসন করছিলেন, তাই নিজেকে সেহু বলেই ঘোষণা করেছেন। তাঁর সরকারী ভবনে এক মাস (? আগস্ট, ৬৪৪ খৃঃ) রইলেন। তারপর সেহু খান কয়েকজন প্রহরীকে সঙ্গে দিল। ভারতযাত্রার সময় হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন উত্তরের পথে। সমরকন্দ থেকে। এবার তিনি স্বদেশে ফেরার জন্য দক্ষিণের পথ ধরছেন।

কুন্দুজের উত্তরে সাঙলিং পর্বতমালা। অর্থাৎ পলাণ্ডু রেঞ্জ যাকে বোলোরতাগ ও কারাকোরম পর্বতমালার অংশ বলা যায়। এটাই নাকি জম্বুদ্বীপের কেন্দ্র। দক্ষিণে এই পর্বতমালা হিন্দুকুশের সঙ্গে যুক্ত; উত্তরে প্রসারিত হয়েছে উষ্ণসাগর ও সহস্রঝর্ণা অবধি; পশ্চিমে হুয়োহ রাজ্য আর পশ্চিমে উ-শা রাজ্য। যেদিকেই যাওয়া যাক না কেন হাজার লি দূরত্ব অবধি কেবল পর্বতশিখর ও গিরিশিরা – সেই সঙ্গে গম্ভীর দুর্লঙঘ্য সঙ্কীর্ণ সব গিরিসঙ্কট। জমাট-বাধা বরফ ক্রমাগত জমেই চলেছে। তীব্র শীতল বাতাস। জমিতে প্রচুর পেঁয়াজ তথা পলাণ্ডু হয় বলে পর্বতমালার ঐ নাম। আবার পর্বতচূড়ার রঙ পেঁয়াজের মতো বলে অমন নামকরণও হতে পারে।

এক বণিকদলের সঙ্গে পূর্বদিকে দুদিন ধরে যাত্রা করে মেঙকন বা মুঙকন বা মুঙঘন বা **মুঞ্জন** পৌছলেন। এটি সম্ভবত আধুনিক তালিখান – হিন্দুকুশের ঢালে অবস্থিত বাদাকসানের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজ্যের আয়তন মোটে ৪০০ লি সীমান্তে ঘেরা। রাজধানী পনেরো-ষোলো লির। উৎপন্ন দ্রব্য ও লোকাচার কুন্দুজের মতো। রাজা নেই। তুর্কি শাসনাধীন।

মুঞ্জনের পাশে কয়েকটি দেশের নাম জানা যায় – অর্নি, রঘ, কৃশমা, পারিকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র রাজ্য। সবই প্রাচীন তুখারা রাজ্যের অংশ।

অর্নি বা অ-লি-নি বক্ষু নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠেছে। বর্তমান পরিচয় হজরত-ইমাম। রাজ্যের সীমান্ত মাত্র ৩০০ লি। রাজধানী চৌদ্দ লি। লোকজন কুন্দুজের মতো।

রঘ (হো-লো-হু বা রাহু) রাজ্যের উত্তরে বক্ষু নদী। এর সীমানা মাত্র ২০০ লি। কোকচা ও অক্সাস নদীর মধ্যবর্তী বাদকসানের করদ রাজ্য।

কৃশমা বা কিহ-লিহ-সেহ-মো রাজ্যের অবস্থান তালিখান বা ইশ-কেশম হবে – ওয়াখান উপত্যকার নিচের ভাগে। রাজ্য ৩০০০ লি সীমানা বিশিষ্ট। মুঙঘন থেকে ৩০০ লি পূর্বদিকে। আর সবকিছু মুঙঘনের মতো হলেও স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্বেষপরায়ণ। পারিকা বা পো-লি-হোহ বা পৃহা কৃশমার উত্তর-পূর্বে। কোকচা নদীর দক্ষিণ তটে বা

দক্ষিণে অথবা কোকচা ছাড়িয়ে। পূর্ব-পশ্চিমে ১০০ লি ও উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ লি রাজ্যের আয়তন। প্রধান নগরটি কুড়ি লি সীমানার।

জীবনীকারের মতে **মুঞ্জন** থেকে ৩০০ লি পূর্বদিকে আর ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে কৃশম থেকে ৩০০ লি পূর্বে অগ্রসর হলেন। পৌছলেন হি-মো-ত-লো তথা **হিমতল** রাজ্যে। অবস্থান সম্ভবত বাদাকসান বা দারায়েম প্রদেশে। এটিও তুখারার প্রাচীন এলাকা। রাজ্যটি ৩০০০ লি সীমানা দিয়ে ঘেরা। সমগ্র রাজ্য জুড়ে পাহাড় আর উপত্যকার ঢেউ। জমি উর্বরা – উৎপন্ন হয় গম, সবজি ও ফল। জলবায়ু অত্যন্ত ঠাণ্ডা। রাজ্যবাসীরা ভয়ঙ্কর আবেগপ্রবণ মেজাজের যারা নৈতিক প্রতিদান অবধি স্বীকার করে না। ক্ষুদ্রকায়, কুৎসিতদর্শন ও রুচিহীন। পরিধেয় বস্ত্র চামড়া ও জমাট বা মোটা পশমের।

তুর্কিদের দিয়ে ঘেরা রাজ্য। ফলে দেশের লোকজনের রীতিনীতিও তুর্কিদের মতো। পূর্বে রাজ্যের রাজা ছিলেন শাক্য বংশোদ্ভুত। প্রায়শ লুঠতরাজ হত। লুণ্ঠন করত না লুণ্ঠিত হত, সেটা স্পষ্ট নয়। ভবঘুরে লোকজন পশমের তাবু নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ করে যাযাবরের মতো। পশ্চিমে কৃশম রাজ্য পর্যন্ত চলাচল ছিল তাদের। গোটা দশেক শক্ত ঘাঁটি আছে রাজ্যে –সেই সব নগরের শাসকরা সকলেই স্বাধীন।

এক আশ্চর্য সামাজিক প্রথা নজরে এল পরিব্রাজকের। হিমতলের বিবাহিত রমণীরা তিন ফুট উঁচু কাঠের শিঙ মুকুটের মতো মাথায় ধারণ করে। সামনের দিকে শিঙের দুটি শাখা – রমণীর শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতীক। উপরের শাখাটি শ্বশুড়কে বোঝায় আর নিচেরটা শাশুড়িকে। দুজনের মধ্যে একজন মারা গেলে সেই শাখাটি ভেঙে ফেলা হয়। দুজনেই মারা গেলে মুকুট খুলে ফেলা হয়।

হিমতল থেকে ২০০ লি পূর্বদিকে পো-তো-চ্যাঙ-ন বা **বাদাকসান** রাজ্য। এও প্রাচীন তুখারার অংশ। রাজধানী বর্তমানে ফৈজাবাদ। ২০০০ লি রাজ্যের সীমান্ত। রাজধানী পর্বতচূড়ার উপরে – সীমানা পাঁচ-ছয় লির মতো। পাহাড় আর উপত্যকার রাজ্য। বালি-পাথরে ঢাকা। উৎপন্ন হয় মটর-শিম ইত্যাদি, গম, আঙুর, আখরোট, নাসপাতি ও কুল। লোকজন সাহসী কিন্তু সদাচারহীন ও অশিক্ষিত। তিন-চারটি বিহার আছে। বৌদ্ধ খুবই কম। রাজা নিষ্ঠাবান ও দৃঢ়চেতা। বৌদ্ধধর্মে গভীর আস্থা।

হিউয়েন সাঙ বাদাকসানে এসে দেখলেন তুষারঝড়ের জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাস খানেকের উপর তাঁকে থেকে যেতে হল সেখানে। তারপর ঝড়ের দাপট কমলে দক্ষিণ-পূর্বে যাত্রা করলেন। পৌছলেন ২০০ লি দূরের রাজ্য ইন-পো-কিয়েন বা **ইয়মগান** রাজ্যে। এটি আধুনিককালের জার্মের উপরের দিকে কোকচা উপত্যকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য। মাত্র ১০০০ লি পরিসীমা। রাজধানী দশ লির মতো। পার্বত্য অঞ্চল – মাঝে মাঝে রয়েছে সঙ্কীর্ণ কৃষিযোগ্য উপত্যকা। লোকজন ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাদাকসানের মতো। ভাষা অন্যপ্রকার। রাজ্যের রাজা দুষ্ট ও নিষ্ঠুর।

পর্বত উপত্যকা পার করে আরো ৩০০ লি গমন করে এসে পৌঁছলেন কু-লাঙ-না বা **কুরান**। রাজ্যটি কোকচা উপত্যকার উপর দিকে যার দক্ষিণে হিন্দুকুশ আর উত্তরে কুলু নদী। ২০০০ লি সীমানা। প্রাচীন তোখারার অংশ। অধিবাসীরা বদমেজাজের, সভ্য সমাজব্যবস্থা নেই। সামান্য কয়েকজন বৌদ্ধ আছে এবং কয়েকটি বিহার। রাজা (হুতিপো) নিষ্ঠাবান ব্যক্তি – বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এখানে পর্বতদেশ থেকে পাথর গুড়ো করে সোনা পাওয়া যায়।

কুরান থেকে উত্তর-পূর্বের পার্বত্যপথে ৫০০ লি অগ্রসর হয়ে উপনীত হলেন ত-মো-সি-টিয়ে-তি বা **টার্মিস্তাত** যা কি না আধুনিক কালের ওয়াকান আর প্রাচীন কালের হুয়ো-মি বা হুমি। আরেক নাম ধর্মস্থিতি বা তমস্থিতি। বক্ষু (অক্সাস) নদীর ধারে দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান। রাজ্যটি বালি আর নুড়ি-টিলায় ভরা। বাতাস হিমশীতল। গম ও মটর-শিম জন্মে। অল্প গাছপালা আছে। জীবনীকারের মতে রাজধানীর নাম কন্দুত। ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে হুন-তে-তো।

রাজ্যটি উত্তর-দক্ষিণে ১৪০০-১৫০০ লি দীর্ঘ। প্রস্থে চার-পাঁচ লির মতো। উৎকৃষ্ট ঘোড়া পাওয়া যায় – আকারে ছোট কিন্তু দীর্ঘযাত্রায় উপযোগী। কুদর্শন অধিবাসীরা অসভ্য ও বদমেজাজী। অধিকাংশের নীল চোখ যা এদিকে সহসা দেখা যায় না। দশটির বেশি বিহার আছে।

রাজধানীতে পূর্বতন রাজা যে বিহার নির্মাণ করেছেন সেটি পাহাড় খনন করে ও খাদ ভরাট করে। বিহারে প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি আছে – মূর্তির মাথার উপরে সোনালি রঙে চিত্রিত ব্রোঞ্জের তৈরী ছত্র ঝুলছে। অতীব আশ্চর্যের কথা হল এই যে সেই ছত্রটি দর্শকের মূর্তি-প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। দর্শক থেমে গেলে চক্রঘূর্ণনও থেমে যায়। কি করে যে তা সম্ভব, তা কেউ জানে না। হিউয়েন সাঙ বিহারের প্রাচীর পরীক্ষা করেছেন, বাসিন্দাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু সেই অলৌকিক স্বতপ্রণোদিত চক্রঘূর্ণনের রহস্য ভেদ করতে পারেননি।

এরপর ধর্মস্থিতির উত্তরের পর্বত ডিঙিয়ে তিনি পৌঁছলেন শিহ-কি-নি বা **শিগনি**। (আধুনিক কালের শঘন। আসলে হয়তো চিত্রল জেলায়। অন্য নাম কাসকার।) ২০০০ লি সীমান্ত বেষ্টিত রাজ্য। বালু-নুড়ি পাথরের উচ্চাবচ দেশ। ক্ষুদ্র একটি রাজধানী আছে পাঁচ-ছয় লি সীমানার। শীতের দেশ। মটর-শিম ও গম জন্মে। গাছপালা দুষ্প্রাপ্য। ফুল ফল সামান্য মেলে। লোকজন হঠকারী প্রকৃতির ও দৃঢ়চেতা। আদবকায়দার ধার ধারে না। সঙ্কীর্ণ ও লঘু মনোভাবসম্পন্ন। ডাকাতি ও রাহাজানি করে জীবন কাটায়। সামাজিক ন্যায় নৈতিকতা গ্রাহ্য করে না। ভবিষ্যতের পতিদানের ভরসায় নয়, ইহজীবনের দুর্ভাগ্যকেই বেশি ভয় পায়। লিপি তোখারার মতো, কথ্য ভাষা ভিন্ন। মোটা উলের বস্ত্র পড়ে। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। দুটি বিহার আছে। রাজা শাক্যবংশীয় বৌদ্ধ।

ধর্মস্থিতির পরে আরেক অজানা পর্বতের দক্ষিণে এসে পড়া যায় **শাঙ-মি** রাজ্যে। ২৫০০-২৬০০ লি সীমানা নিয়ে রাজ্য। পর্বত আর উপত্যকার দেশ। নানা আকারের টিলার ছড়াছড়ি। সমস্ত রকমের শষ্য জন্মে — মটর-শিম, গম আর আঙুর হয় প্রচুর। পর্বতদেবতাদের সন্তুষ্ট না করলে মুস্কিল — তাঁরা ঝড়-শিলাবৃষ্টির কারণ হন। রাজা শাক্য বংশোদ্ভূত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। দুটি বিহার আছে। পাথর ভেঙে এখানে উৎপাদিত হয় আর্সেনিক সালফাইডের যৌগ যা রঙ ও বাজি বানাতে ব্যবহৃত হয়।

তারপর আবার ভয়ঙ্কর পথ সামনে — পর্বত আর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে দীর্ণ। শাঙ-মির উত্তর-পূর্বে ৭০০ লি দূরে পো-মি-লো (**পামির**) উপত্যকায় পৌঁছলেন। আসলে নাকি এদিকে আটটি পামির নামে রাজ্য আছে। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত শিগনি বা শাঙমি রাজ্যে যাননি। সোজাসুজি ওয়াখান থেকে পামির উপত্যকার নানা রাজ্যের মধ্য দিয়ে মহা পামির রাজ্যে উপনীত হয়েছেন। জীবনীকারের মতে, শিগনি থেকে সায়মক তথা মাস্তুজ হয়ে পামির উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন ৭০০ লি পার্বত্য পথ পেরিয়ে।

দুই তুষারমৌলি পর্বতমালার মধ্যে মহাপামিরের অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে এক হাজার লি দীর্ঘ আর উত্তর-দক্ষিণে একশ' লির মতো প্রশস্ত। জায়গাটি পামিরের মধ্যস্থলে বলে প্রচণ্ড হিমেল বাতাস ও তুষারঝড়ের প্রকোপ আছে। অবিরাম। তা সে বসন্তই হোক বা গ্রীষ্মকাল। মাটিতে লবণের ভাগ একটু বেশি। আর নুড়িপাথর মেশানো। প্রায় কোন চাষবাস হয় না। খুব সামান্য গাছপালা আছে। সম্পূর্ণ জনমানবহীন পরিত্যক্ত প্রান্তর।

উপত্যকায় পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ লি দৈর্ঘ্যের একটি নাগ হ্রদ আছে। পরিচিত নাম লেক ভিকটোরিয়া তথা সরিকুল হ্রদ। জম্বুদ্বীপের মাঝখানে সাঙলিং পর্বতমালার উপরে অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত হ্রদের জল বিশুদ্ধ ও অত্যন্ত পরিষ্কার। রঙ নীলাভ। হ্রদের গভীরতা অনেক। জলজ পাখিরা সেই জলে এমন তুমুল কলরোল তোলে যে হট্টগোলে-ভরা বাজারের মতো মনে হয়। কিছু কিছু পাখি দশ ফুটেরও বেশি লম্বা। তাদের ডিম বিশাল আকারের। হ্রদ থেকে পশ্চিমে যে বৃহৎ জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা টার্মিস্তাতের পূর্বদিকে বক্ষু (অক্সাস) নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপর পশ্চিমে প্রবাহিত। দক্ষিণের সকল জলধারাই পশ্চিমবাহিনী। পূর্বদিক থেকে জাত আরেকটি বৃহৎ নদী কাশগরের পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে এবং তারপর সিতা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। বাঁদিকের সমস্ত স্রোত পূর্ববাহিনী।

পামির উপত্যকার দক্ষিণ দিকে পর্বত ডিঙিয়ে পো-লু-লো (বোলোর) রাজ্য যা আধুনিক কালের বালটিস্তান গিলগিট ও কানজুট কেন্দ্র করে গঠিত। প্রচুর সোনা ও রূপো পাওয়া যায়। সেই সোনার রঙ আগুনের মতো রাঙা।

তারপর পামিরের মধ্য উপত্যকা থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। পথে কোন জনবসতি নেই। জমাট বরফাবৃত চারদিক। ৫০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁরা

পৌঁছলেন কিয়ে-পান-তো রাজ্যে। গতিমুখ পূর্বদিকে না দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিয়েপানতো মানে হয়তো **খবন্দ** বা **কভণ্ড** রাজ্য যা বর্তমানে সোলগোল বা সারিকগোল বা সারিকুল নামে চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্যের সীমানা ২০০০ লির উপরে। রাজ্যের উত্তরদিশায় রয়েছে পূর্বগামী সিতা নদী। আসলে একটি লবণ ঝর্ণা – অস্মকুট পর্বত থেকে উৎসারিত। (রাজধানী সম্ভবত তাসকুরঘান নয়, ইয়ারকন্দ নদীর উপনদী কারচুর তীরবর্তী কারচু। এই কারচুকেই সিতা বলা হয়েছে হয়তো।)

পরিব্রাজক বলেছেন – কুড়ি লি সীমান্তে ঘেরা রাজধানীর অবস্থান পাথুরে গিরিশিরার উপর। পিছনে সিতা নদী প্রবাহমান। রাজ্যটি জুড়ে পাহাড় আর গভীর গিরিখাত আর নদীখাত। ঢালু জায়গা আর জলাজমি সবটাই পতিত। ফসল তেমন করে কিছু হয় না – সামান্য ফল জন্মে। তবে মটর-সিম আর গম প্রচুর। গাছপালা কম। অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির, সাহসী এবং কুদর্শন। শিক্ষাদীক্ষা নেই বললেই চলে। সামাজিক রীতিনীতি বা অধিকারবোধও নেই। তবে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। ভাষা কাশগরের মতো। দশটির বেশি বিহার আছে। বৌদ্ধদর সংখ্যা পাঁচশ'র বেশি।

কথিত আছে, রাজ্যের রাজারা চিনা রাজকুমারী ও সূর্যদেবতার বংশজাত। ভ্রমণ কাহিনীতে এই ঘটনা সম্পর্কে বিশদে বলা হয়েছে। পোলিসসু রাজ্যের এক রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল চিনা রাজকুমারীর। পতিগৃহে যাত্রাকালে কবন্দে এসে সাময়িক যাত্রা বিরতি করতে হয় চারদিকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে। রাজকুমারীকে পর্বতশীর্ষে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়। অনতিকালের মধ্যে রাজকুমারী সন্তানবতী হয়ে পড়ে। জানা যায় এর কারণ সূর্যদেব। তারপর সেখানেই প্রাসাদ নির্মাণ করে চিনা রাজকুমারী বাস করতে থাকেন। যথাকালে এক পুত্রসন্তান হয়। ক্রমে পুত্র সুদর্শন ও শক্তিমান রাজা হয়ে ওঠে। রাজধানীর একশ' লি দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতগুহায় ঐ রাজার প্রস্তরীভূত দেহ আছে।

পরবর্তী রাজারা তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না। এ রাজ্য একদা নাকি সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল। তিনি রাজপ্রাসাদে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। পুরাতন রাজপাসাদে সমকালীন রাজা শাস্ত্রবিদ তুঙ-শাউ তথা কুমারলব্ধের জন্য চমৎকার একটি বিহার নির্মাণ করে দেন। কুমারলব্ধ আদতে তক্ষশিলার লোক। বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বহু শাস্ত্রবিদ ও প্রখ্যাত পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত সৌত্রান্তিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিদিন বত্রিশ হাজার শব্দ আবৃত্তি করতে ও সমপরিমাণ শব্দ লিখতে পারতেন। তাঁর সময় পূর্বে অশ্বঘোষ, দক্ষিণে দেব, পশ্চিমে নাগার্জুন এবং উত্তরে কুমারলব্ধ – চার দিকে এই চার মহান সূর্য ভাস্বর ছিল। কভণ্ডের রাজা তক্ষশীলা আক্রমণ করে জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

রাজধানী থেকে ৩০০ লি দক্ষিণ-পূর্বে দুটি পর্বতগুহায় দু'জন অর্হৎ দীর্ঘকাল বাস করছেন। সাতশ' বছরের বেশি সময় তাঁদের আয়ু। কঙ্কালসার দেহে প্রাণের সাড়া মেলে

কেবল ক্রমবর্ধমান চুলে। সেখান থেকে ২০০ লি উত্তর-পূর্বে একটি পুণ্যশালা আছে। স্থানটি বন্য ও জনশূন্য হওয়ার কারণে মরুযাত্রীদলের চলাচলের সুবিধার্থে কোন অর্হৎ ঐ পুণ্যশালাটি নির্মাণ করেছিলেন। হিঁউয়েন সাঙ কভণ্ড রাজ্যে কুড়ি দিনেরও বেশি বাস করেন। তারপর যাত্রা করলেন।

পাঁচদিন চলার পরে এক ডাকাত দলের খপ্পরে পড়তে হল। সঙ্গের বণিকেরা ভয় পেয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেল। হিঁউয়েন সাঙের হাতিটিকে নদীতে তাড়িয়ে নিয়ে জলে ডুবিয়ে মারা হল। আর কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেসব জানা যায়নি। দস্যুর দল বিদায় নিলে আবার দলবল একত্রিত হয়ে যাত্রা শুরু করল। গতিমুখ পূর্বদিকে। সাঙলিং পর্বতমালার পূর্ব গিরিশিরা পার হতে হবে। সম্ভবত তাঁদের বিশাল মুস্তাগ-আটা পর্বত অতিক্রম করতে হয়েছিল।

এভাবে ৮০০ লি পথ পেরিয়ে পামির মালভূমি থেকে বেরিয়ে এলেন উ-স বা **ওশ** রাজ্যে। রাজ্যটি আধুনিক ইয়াঙ্গিহিসার নামে পরিচিত। রাজ্যের সীমান্ত ১০০০ লি দীর্ঘ। রাজধানী ১০ লির বেশি। দক্ষিণে সিতো (সিতা?) নদী। উর্বর জমি – নানা প্রকার ফসল ও ফল জন্মে। গাছপালা আছে। সাদা কালো গাঢ় নীল রঙের রত্ন পাওয়া যায়। জলবায়ু মৃদু। অধিবাসীরা রুক্ষ, কর্কশ ও কপট। কুদর্শনও বটে। চামড়া ও মোটা পশমের পোষাক পড়ে। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। কমপক্ষে দশটি বিহার আছে। বৌদ্ধ সহস্রাধিক। হীনযানের সর্বাস্তিবাদী শাখার বৌদ্ধ তারা। রাজ্যটি দীর্ঘকাল ধরে কভণ্ডের অধীনস্থ দেশ হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে।

রাজধানী থেকে ২০০ লি পশ্চিমে খাড়াই পাহাড়ের উপর একটি স্তূপ আছে। ঐ স্তূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অলৌকিক অর্হতের কাহিনী। কয়েক শত বৎসর আগে অশনিপাতে ঐ পর্বত বিদীর্ণ হলে এক কাঠুরিয়ার নজরে আসে যে সেখানে উপবিষ্ট আছে শুষ্কদেহী মুদিতনয়ন এক সন্ন্যাসী। তাঁর মুখমণ্ডল ও স্কন্ধ দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুরাশিতে ভরা। সংবাদ পেয়ে রাজা আসে, লোকজন আসে। তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে ননী ও দুধ মাখানো হয়। তারপর পেটানো ঘড়িতে শব্দ করা হয়।

অর্হৎ চোখ মেলে উপস্থিত ভিক্ষুদের দেখে জানতে চাইলেন – 'আমার শিক্ষক কাশ্যপ তথাগত এখন কোথায়?'

উনি দীর্ঘকাল আগে নির্বাণলাভ করেছেন শুনে আরো জানতে চাইলেন – 'শাক্যমুনি বুদ্ধ কি সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করেছেন?'

সকলে জানাল – ' হ্যাঁ তিনি বুদ্ধ হয়েছেন এবং লোকশিক্ষার দায় পালন করে নির্বাণলাভ করেছেন।'

তারপর অর্হৎ স্বীয় ধ্যানবলে নিজেকে ভস্মীভূত করলেন। তাঁর ভস্মাবশেষের উপর একটি স্মরণ স্তূপ নির্মাণ করা হল।

ওশ থেকে উত্তরদিকে পাহাড়ী এলাকা বালির টিলা আর পতিত সমতলভূমি পেরিয়ে ৫০০ লি পথ অতিক্রম করে পৌছলেন কিয়ে-শা তথা **কাশগর** রাজ্যে। সুলে নামেও পরিচিত রাজ্যটি। সীমানা ৫০০০ লি। উর্বর জমিতে প্রচুর ফসল, ফুল ও ফল উৎপাদিত হয়। উৎকৃষ্ট মানের উল ও উলেরবোনা কম্বল পাওয়া যায়। অদ্ভুত এক স্থানীয় প্রথা আছে – শিশুর মাথা চাপ দিয়ে চেপটা করা। এরা দেহে উলকি আঁকে। এদের চোখের মণির রঙ সবুজ। লেখ্য ভাষা অনেকটাই ভারতীয় ভাষার মতো। অধিকাংশ নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। কয়েক শত বিহার আছে এবং সর্বাস্তিবাদী শাখার সহস্র বৌদ্ধ আছে। তারা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বটে কিন্তু তার অর্থ জানেনা। জানতেও চায় না।

কাশগর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৫০০ লি দূরত্বে সিতা নদী ও বিশাল বালুময় পর্বতমালা অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ এসে পৌছলেন **চেকুক** রাজ্যে। সম্ভবত এটি সু-কু রাজ্য যার অবস্থান ইয়ারকন্দ প্রদেশে। বর্তমানে চিনের সিনকিয়াং-উইঘুর স্বশাসিত এলাকায়।

চেকুক রাজ্যে প্রবেশ করে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বদেশেই প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজ্যটি চিন সম্রাটের শাসনাধীন। রাজ্যের সীমান্ত ১০০০ লি দীর্ঘ। রাজধানীর সীমানা দশ লির উপর। সমৃদ্ধ জনবসতি আছে। দুই নদীর উপত্যকায় চাষবাস হয়। উৎপাদিত হয় নানাবিধ ফল যেমন আঙুর, নাসপাতি, কুল প্রচুর জন্মায়। বায়ুপ্রবাহ শীতল। অধিবাসীরা অশিষ্ট ও কপট প্রকৃতির। শিক্ষাসংস্কৃতি তেমন নেই। ডাকাতি করা একরকম খোলাখুলি পেশা। লেখ্য লিপি খোটানের মতো তবে কথ্য ভাষা ভিন্ন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আন্তরিক। বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহার ছিল তবে অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। শতাধিক মহাযানী বৌদ্ধ আছে। রাজ্যের দক্ষিণের পর্বতে অনেকগুলি গুহা আছে। সেখানে বহু ভারতীয় সাধক অর্হৎ সাধনা করেছেন ও নির্বাণলাভ করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্হতের স্মৃতিতে অনেক স্তূপ আছে। একটি গুহায় নাকি তিনজন অর্হৎ দীর্ঘকাল ধরে সমাধিস্থ আছেন। মহাযান ধর্মের চর্চা আছে। রাজ্যে বহুবিধ শাস্ত্র সংরক্ষিত আছে। লক্ষ শ্লোকের শাস্ত্রগ্রন্থ আছে দশটি। সাধারণভাবে স্বল্পসংখ্যক শ্লোকবিশিষ্ট গ্রন্থের প্রচারই বেশি।

চেকুকের পূর্বদিকে ৮০০ লি দূরে কু-স-তান-ন। আমরা জানি **খোটান** নামে। ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। নাকি বসন্তকালে?

রাজ্যের ৪০০০ লি দীর্ঘ সীমান্ত। অধিকাংশ এলাকাই মরুভূমি আর বালিয়াড়ি। কৃষিযোগ্য জমি কম। তবু উদ্বৃত্ত পরিমাণ খাদ্যশষ্য উৎপন্ন করে। প্রধানত খাদ্যশষ্য ও ফল জন্মে। কম্বল, উত্তম পশম ও শিল্পসম্মত সিল্কজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। পশম-বোনা তাঁতিরা তসরও বোনে। জলবায়ু মনোরম তবে ঘূর্ণিঝড় বেশি। বাতাসে ধূলোও ওড়ে খুব। খনি থেকে সাদা ও কালো রঙের পান্না পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সভ্য। শিক্ষা ও সঙ্গীত প্রেমী। ভারতীয় লিপিপদ্ধতি অনুসরণ করে সামান্য রদবদল ঘটিয়ে এদের বর্ণমালা

গঠিত হয়েছে। লোকজন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী -- একশত বিহার আছে। পাঁচ হাজার বৌদ্ধের মধ্যে অধিকাংশ মহাযান সম্প্রদায়ের।

খোটানের রাজারা দাবী করে তারা বৈশ্রবণদেবের বংশধর। জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে সম্রাট অশোকের এক পুত্র আগে তক্ষশীলায় বাস করত। পরে নির্বাসিত হয়ে হিন্দুকুশ পর্বমালার উত্তরে চলে আসে এবং মেষপালক হয়ে ঘুরতে ঘুরতে জল আর চারণভূমির খোঁজে খোটানে উপস্থিত হয়। সেখানে রাজ্য স্থাপন করে বাস করতে থাকে।

ভ্রমণবৃত্তান্তে বলা হয় যে তক্ষশীলায় অবস্থানকারী অশোকপুত্র কুণালকে যারা অন্ধ করার জন্য দায়ী, তাদের নির্বাসিত করা হয়। তারা সপরিবারে খোটানের পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করে।

এদিকে তখন চিন থেকেও এক যুবরাজ নির্বাসিত হয়েছিল। সে খোটানের পূর্বদিকে আস্তানা স্থাপন করে। ভারত ও চিন বংশোদ্ভুত সেই দুই দলের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল। যুদ্ধে তক্ষশীলার রাজা পরাস্ত ও নিহত হয়। রাজত্ব চলে যায় চিনের যুবরাজের অধীনে। রাজধানী নির্মাণের সময় এক পাশুপত তীর্থিক নাকি ঐ চিনা যুবরাজকে যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক পুত্রহীন রাজা তখন সন্তানকামনায় বৈশ্রবণদেবের পূজা করে। ঐ দেবতার মস্তক থেকে নির্গত হয় এক পুত্র। ঐ শিশুর জন্য দেবতার প্রভাবে ভূমি থেকে স্তনের উদ্ভব হয়। সেই স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধধারায় শিশুর জীবনরক্ষা হয়। তদবধি এই স্থানের নাম হয় কুস্তন (পৃথিবী-স্তন)। কুস্তন থেকে হয় খোটান।

খোটানের ভাগ্য নগরে সাত ফুট উঁচু উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আছে। তাঁর মাথায় রত্নখচিত মুকুট। মূর্তিটি কাশ্মীর থেকে আনা হয়েছে। হিঁউয়েন সাঙ খোটানে সাতদিন রইলেন।

এদিকে ভারত থেকে স্বদেশের পথে চিনা পরিব্রাজক রাজ্যে এসেছেন সংবাদ পেয়ে খোটানের রাজা স্বয়ং অভ্যর্থনা জানতে ছুটে এলেন। চার-পাঁচ দিন পরে রাজধানীতে পৌঁছলেন রাজ্যবাসীর সাদর সম্বর্ধনায়। পথের পাশে তারা ধূপ ফুল ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অপেক্ষা করছিল। মান্য অতিথির নিবাস হল এক সর্বাস্তিবাদী বিহারে।

রাজধানী থেকে দশ লি দূরে অর্হৎ বৈরোচনের জন্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন জনৈক পূর্বতন রাজা। বহুকাল আগে কাশ্মীর থেকে সেই অর্হতের আগমন ঘটেছিল খোটানের অরণ্যে। তখন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়নি। রাজা দেখা করতে এলে তিনি জানান যে তিনি জু-লাইর শিষ্য। জু-লাই চার প্রকার জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন এবং তিন ভুবনকে সঠিক পথ দেখান। সব শুনে রাজা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। রাজাও ঐ অর্হতের জন্য সঙঘারাম নির্মাণ করে দিল। খোটানে সেটাই প্রথম বিহার। পরে অর্হতের কথামতো আকাশপথে বুদ্ধমূর্তি এল। স্থাপিত হল ঐ বিহারে। তাঁর সঙ্গে ছিল বিহারে ব্যবহারের জন্য একটি ঘন্টা।

রাজধানীর দশ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে টিকপোফোন বিহার। কুচিহ্ থেকে ঐ বিহারে এক দণ্ডায়মান মূর্তিটি এসেছে ভক্তের একান্ত আরাধনার ফলে। কুড়ি লি দক্ষিণ-পশ্চিমে গোশৃঙ্গ পর্বতে আছে গোশৃঙ্গ বিহার। পশ্চিম দিকে তিনশ' লি দূরে পোকাই নগরে আছে সাত ফুট উঁচু উর্পবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। কাশ্মীর থেকে আনা মূর্তির মাথায় মুকুট আছে।

পশ্চিম দিকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেড়শ' লি দূরে পথের পাশে টিলা আছে। সেই টিলা আসলে ইঁদুরের রাজ্য। লোকেরা ঐ ইঁদুর পূজো করে। পশ্চিমে পাঁচ-ছয় লি দূরে শমোনো (সমজ্ঞা) বিহার। দক্ষিণ-পূর্বে মোশে বা লুশে সঙঘারাম। বিহারের নির্মাতা চিনের এক রানি। তিনিই দেশে রেশম চাষের প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্বে একশ' লি দূরে বড়ো নদী আছে। পূর্বদিকে তিনশ' লি দূরে লাল রঙের জলাভূমি। সেখানেই চিনা যুবরাজের সঙ্গে খোটানের ভারতীয় যুবরাজের যুদ্ধ হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ সিন্ধু নদ অতিক্রম করার সময় কিছু গ্রন্থ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কুচা ও কাশগরে পৌঁছেই হৃত গ্রন্থের পরিবর্তে অন্য পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। রাজা হিউয়েন সাঙকে তার রাজ্যে আরো কিছুকাল বাস করতে অনুরোধ করেছিল।

খোটান থেকে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ চিন সম্রাটের নিকট একটি পত্র লেখেন। কাওচাঙের এক যুবক, নাম মা-হুয়ান-চি। তাকে পত্রসহ এক বণিকদলের সঙ্গে চিনের রাজধানীতে পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন –

'ভিক্ষু হিউয়েন সাঙের বিনীত নিবেদন এই যে তিনি শুনেছেন মা ইয়ুঙ মহা জ্ঞানী ছিলেন আর তাঁর কাছে ফুফেঙে গিয়েছিলেন চেঙ সুয়ান। ফুসেঙ আরেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন আর তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণে সুনানে গিয়েছিলেন সাও সো। এ থেকে আমরা জানতে পারছি যে কনফুসিয় ধর্মের মতো অগভীর চর্চায়ও সেদিনের প্রাচীন ব্যক্তিরা দূরদেশে গমন করতে পারেন। তাহলে সর্বপ্রাণীর মঙ্গলের জন্য বুদ্ধ যে মহৎপথের সন্ধান দিয়েছেন আর ত্রিপিটক যে চমৎকার শিক্ষায় আমাদের দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় দেখাচ্ছে তা কি লাভ না করা উচিত ও দূরভ্রমণে যেতে ভয় পাওয়া উচিত? চেন-কুয়ানের তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ মাসে (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) রাজাদেশ লঙঘন করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতযাত্রা করেছিলাম। রাজধানী চ্যাঙান থেকে শুরু করে প্রশস্ত চলমান মরুপ্রান্তর পার হয়ে, তুষার পর্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আরোহণ করে, লৌহদ্বারের ভয়ঙ্কর পথ পেরিয়ে, উষ্ণসাগরের তরঙ্গ পার হয়ে অবশেষে রাজগৃহে পৌঁছেছিলাম পঞ্চাশ হাজার লি পথ অতিক্রম করে। মনোবাসনা চরিতার্থ করতে দর্শন করেছি গৃধকূট পর্বত, উপাসনা করেছি বোধিবৃক্ষ। ... সতেরো বৎসর ব্যপী দীর্ঘ পরিভ্রমণ করে প্রয়াগরাজ্য ত্যাগ করে, কপিশার মধ্য দিয়ে পামির পর্বতমালা আরোহণ করে ও পামির উপত্যকা পেরিয়ে আমি প্রত্যাবর্তনের পথে কুস্তনে এসে উপনীত হয়েছি। আমার হাতিকে জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। সঙ্গে প্রচুর শাস্ত্রগ্রন্থ আছে যেসব বহন করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অশ্ব

এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই আমাকে যাত্রাপথে কিছুকালের জন্য বিরতি করতে হচ্ছে। সেকারণে মহান সম্রাটের সামনে আরো আগে উপস্থিত হতে অপারগ হয়ে পড়েছি। এজন্য আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত। এখন কাওচাঙের এক নাগরিক মা সুয়ান-চিহ নামক ব্যক্তিকে এক বণিকদলের সঙ্গে মহামান্য সম্রাটের দরবারে এই পত্র অগ্রিম পেশ করার জন্য পাঠালাম।'

চিনসম্রাটের কাছে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতির জন্য প্রার্থনা-পত্রটি যখন চ্যাঙানে পৌঁছল, সম্রাট তখন লুয়্যো-ইয়াঙে বসে লিয়াও-দঙ আক্রমণের তোড়জোড় করছেন। রাজা দেখলেন — সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। হিউয়েন সাঙের কাছ থেকে পশ্চিমের দেশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যাদি জানা খুব জরুরী। গোক-তুর্কদের বারবার আক্রমণে চিনের সঙ্গে পশ্চিমী দেশের বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছিল খুব। সিল্ক রুটের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দেশের স্বার্থে প্রয়োজন।

সম্রাট স্বয়ং পত্রোত্তর দিয়ে পরিব্রাজককে চিনের রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করলেন — 'আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে বিদেশভূমিতে ধর্মপথের সন্ধানের পরে শিক্ষকগুরু ঘরে ফিরছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে আপনি সাক্ষাত করুন। আপনি আপনার সঙ্গে বিদেশী সন্ন্যাসীদের নিয়ে আসবেন যারা সংস্কৃত ভাষা জানেন ও শাস্ত্রগ্রন্থের অর্থ জানেন। আমি ইতিমধ্যে কুস্তনের প্রশাসন ও অন্য স্থানের শাসকদের নির্দেশ দিয়েছি আপনাকে প্রহরাদানের জন্য যাতে আপনার বাহন ও অশ্বের সমস্যা না হয়। আমি তুনহুয়াঙের কর্মচারীদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছি যাতে তারা মরুভূমিতেই আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারে। চেমোতেও আপনাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য শানশানের কর্মচারীদেরও জানিয়েছি।'

পত্র পেয়ে হিউয়েন সাঙ আর বিলম্ব করলেন না। প্রায় সাত-আট মাস কুস্তনে কাটিয়েছেন। দ্রুত প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হলেন। খোটানের রাজা অতিথির আসন্ন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করল।

নভেম্বর মাসে হিউয়েন সাঙ খোটান থেকে পূর্বদিকে ৩০০ লি পথ পরিক্রমা করে পৌঁছলেন পিমো (**ভিমা**)। বর্তমান পরিচয় উজুন-তাটি। নগরে ত্রিশ ফুট চন্দনকাঠের দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি আছে। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মূর্তি। অসুস্থ ব্যক্তি যদি মূর্তির দেহে, যেখানে তার ব্যথাবেদনা সেই দেহাঙ্গে, চন্দনের প্রলেপ লাগায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সব রোগবালাই দূর হয়ে যায়। কথিত আছে ঐ মূর্তিটি কৌশাম্বির রাজা উদয়ন বুদ্ধের জীবদ্দশায় নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পরে পিমোর উত্তরে ওলাওলোক বা রল্লক নগরে মূর্তিটি আকাশপথে অবতীর্ণ হয়। পরে তা ভিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়, সদ্ধর্মের পতন হলে মূর্তিটি নাগপ্রাসাদে প্রবেশ করবে।

ভিমা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করে প্রবেশ করলেন মরুভূমির রাজ্যে। ২০০ লি পথ পেরিয়ে পৌঁছলেন নি-জাং বা **নিয়া** নগরে। বর্তমান অবস্থান ইউতিয়েন জেলায়। তিন-

চার লি পরিসীমা নগরের। অবস্থান প্রায় জলাভূমির উপর। চারদিকে নালখাগড়ার বন খুব। রাস্তা এড়িয়ে চলা দায়। নিয়াকে কুস্তন রাজ্যের পূর্বসীমান্তের প্রতিরোধ বলা যেতে পারে। হিউয়েন সাঙের গতিমুখ এখন কেবল পূর্বদিশায়।

সামনে পড়ল এক সচল মরুভূমি। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বালুরাশি সেখানে অবিরত স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রবাহিত হয়। আর যখন বাতাস বইতে থাকে মানুষ ও পশুপ্রাণীরা অসুস্থ বোধ করে। সর্বদা কানে ভেসে আসে গানের সুর নয়তো শিসের শব্দ নয়তো কান্নার শব্দ। দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এর ফলে জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে। লোকে বলে এসব দানো বা দুষ্টাত্মার কাজ। পথে জল নেই। পশুখাদ্য নেই। শুধুই প্রখর তাপ ও দানবের দল। সে অর্থে কোন রাস্তা নেই বালির রাজ্যে। জড়ো করে রাখা কঙ্কালস্তূপ থেকে পথের হদিশ মেলে। চলার গতি খুবই কম। এমনি করে ৪০০ লি দূরত্ব অতিক্রম করে হিউয়েন সাঙ প্রবেশ করলেন প্রাচীন তূ-হো-লো রাজ্যে। একে **ক্ষুদ্র তুখারা বা তোখারা** রাজ্যও বলা যায়। রাজ্য ও নগর প্রায় মানব বর্জিত।

তারপর ৬০০ লি এগিয়ে পৌঁছলেন নিয়েমো বা চেমো-দের রাজ্য চে-মো-তো-ন (চু-মো, আধুনিক **চের্চেন**)। নগর ঘিরে উঁচু উঁচু প্রাচীর আছে; জনবসতি নেই।

উত্তর-পূর্ব দিকে ১০০০ লি পথ অতিক্রম করে লপনোর হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে পৌঁছলেন প্রাচীন **না-ফো-পো** রাজ্যে। এটাই প্রাচীন লৌলান রাজ্য। একদা বর্ধিষ্ণু দেশ ছিল। চিনের দখলে আসার পরে এর নাম হয় শান-শান। কুস্তন থেকে যেসকল প্রহরী এসেছিল সঙ্গে, তারা নাফোপো থেকে ঘোড়া-উট নিয়ে ফিরে চলে গেল। চিনের কর্তৃপক্ষ তাদের পুরস্কার দিতে গেলে তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল।

সুদীর্ঘকাল বিদেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বদেশে ফিরছেন। অনেক অনেক বছর পরে। মধ্য এশিয়ার উত্তর রেশমপথ দিয়ে তাঁর ভারতে আগমন। দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন দক্ষিণ রেশমপথ দিয়ে। পামির, কাশগড়, ইয়ারখণ্ড, খোটান ও লপনোর হয়ে। ভারতযাত্রার পথ যেমন কণ্টকাকীর্ণ ছিল, প্রত্যাবর্তন ততদূর সমস্যার হয়নি। তখন তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন ছিল। ভারতীয় রাজন্যবর্গ স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁর যাত্রার সুব্যবস্থা করেছেন। যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবশ্য ছিলই। আর ছিল দস্যু-ডাকাতদলের আক্রমণ। একবার তুষারধ্বসে তো তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে রাজা শীলাদিত্যর মৃত্যু হয়েছে। আচার্য শীলভদ্রের স্থানে অধ্যক্ষ-পদে আসীন হয়েছেন আচার্য ধর্মকীর্তি।

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকথা এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল। জীবনীকার আরো কিছু কথা লিখে গেয়েছেন।

নাফোপো থেকে আলতিন-তাগ পর্বতমালার কোল দিয়ে এসে উপনীত হয়েছিলেন **সা-চাউ**। সেখানে পৌঁছে তিনি সম্রাটের নিকট আরেকটি পত্র লেখেন। সম্রাট তখন লোইয়াঙে। লিয়াংকুয়োর ডিউক ও প্রধানমন্ত্রী ফ্যাঙ সুয়াং লিং তখন পশ্চিম রাজধানীর

ইম্পেরিয়াল গার্ড। তাকে সম্রাট নির্দেশ দিলেন অগ্রসরমান পরিব্রাজকের যথোচিত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে।

হিউয়েন সাঙ তখন দ্রুতবেগে রাজসকাশে চলেছেন। সম্রাট শীঘ্রই যুদ্ধে রওনা দেবেন – তার আগে পৌঁছতে হবে রাজধানীতে। সা-চাউ থেকে তিনি সম্ভবত ইয়োমেন দ্বার ও **লিয়াং-চাউ** হয়ে চিনের পশ্চিম রাজধানী **চ্যাঙান** পৌঁছলেন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে – সম্ববত এপ্রিলে। চিনা চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাসে – চেঙ-কুয়ানের ১৯তম বর্ষের চতুর্থ মাসে।

দেশে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। সীমান্ত থেকে রাজধানী পর্যন্ত রাজকীয় শোভায় তাঁকে বরণ করা হল। রাজধানী চ্যাঙানে জনগণ বিশাল সমাবেশে সম্বর্ধনা জানাল। রাস্তার দুধারে তারা অপেক্ষা করছিল। এমন কী, সম্রাট সেদিন রাজ্য জুড়ে একদিনের ছুটি পর্যন্ত মঞ্জুর করলেন। ইতিহাসে এমন নজির বুঝি আর একটিও নেই।

চিনসম্রাট তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। হিউয়েন সাঙ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন শান্তভাবে। রাজাও চমৎকৃত হলেন ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বুদ্ধি ও জীবন-জগত দর্শনের আশ্চর্য ক্ষমতায়। তাঁকে রাজদরবারের আসন অলঙ্কৃত করতে অনুরোধ জানালেন। বিনয়ের সঙ্গে তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা তিনি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ কর্মে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে চান। তবে সম্রাটের মনোমতো একটি কাজও করলেন। রাজার আগ্রহ অনুধাবন করে তিনি পশ্চিমের দেশে তাঁর যাত্রাপথের অভিজ্ঞতার বিবরণ রচনা করতে সম্মত হলেন। তারই ফলশ্রুতি একটি ভ্রমণকাহিনী। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চিন সম্রাট তাঙ-তাই-জঙ (তাই-সুঙ)-এর অনুরোধে বিয়াজি (বিয়ান-চি)-র সাহায্য নিয়ে রচনা করলেন সেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত – তা-তাঙ-সি-ইউ-কি, সংক্ষেপে, সি-ইউ-কি, (জার্নি টু দ্য ওয়েস্ট ইন দ্য তাঙ ডিনাস্টি)।

হিউয়েন সাঙ ভারত থেকে প্রায় ৬৫৭টি সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যান। কুড়িটি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ঐ সকল পুঁথি ও অন্যান্য নিদর্শন নিয়ে যেতে হয়েছিল। তারপর সম্রাটের অর্থানুকূল্যে চ্যাঙানে (জি-অ্যান) অনুবাদের কাজে হাত দেন। অনুবাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি কেন্দ্র ডা-ইয়ান-টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছিল। পূর্ব এশিয়া থেকে অনেক ছাত্র ও অনুগত লোকজন এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েছিল।

সংস্কৃত থেকে চিনা ভাষায় প্রায় ৭৩টি শাস্ত্রগ্রন্থ ১,৩৩৫টি খণ্ডে অনূদিত হয়েছিল। তিনি নিজে হয়তো ৭৫টি অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথম ছয় বৎসর ৬৪৫ তেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি যোগাচারশাস্ত্র, পরবর্তী দশ বৎসর অভিধর্মশাস্ত্র এবং অন্তিম চার বৎসর মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনূদিত গ্রন্থ সম্পর্কে একটি প্রামান্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন – চেঙ-উয়েই-শি-লুন নামে। উয়েই-

শি কথার অর্থ চেতনামাত্র। যোগাচার মতবাদের মূল বিষয় যে তাই। মনই আসল। আর সবকিছু অবাস্তব। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রধান শিস্য কুইজি (কুয়েই-চি)-র সাহায্যে স্থাপিত হয়েছিল ফ্যাসিয়াং (ফা-সিয়াং) নামে এক চৈনিক যোগাচার সম্প্রদায়। ধর্মবিশ্বাসে তিনি মহাযান পন্থী। ঝোঁক ছিল সম্ভবত যোগাচার মতবাদের প্রতি।

ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর বিবরণ ঐতিহাসিকদের কাছে অমূল্য তথ্যস্বরূপ। আশ্চর্যের কথা তিনি সাঁচী স্তূপ সম্পর্কে কিছু লিখে যাননি। অজন্তা গুহাচিত্র সম্পর্কেও তেমন কিছু লেখেননি। চিনদেশ থেকে এসে ভারত ভ্রমণ করে ফিরে যাওয়ার মতো দুরূহ কর্ম করার পরেও তিনি প্রচুর পরিশ্রমে নানা অনুবাদ কর্মে ধর্মপ্রচারে তর্কবিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। এত শ্রমের মাশুল দেবার সময় এসে গেল। নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দিল। জটিলতা নিরাময়ের বাইরে। মৃত্যু হল রাজধানীর ইয়ু-হোয়া-গঙ মঠে। ৫ই ফেব্রুয়ারী ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। তাঙ সম্রাট তিনদিন ধরে রাজ্য জুড়ে শোকদিবস ঘোষণা করেন।

পাঁচ বৎসর পরে মাউন্ট ঝোঙ-নান সমাধিস্মৃতি নির্মাণ সম্পন্ন হল। সেখানে তাঁর পার্থিব মরদেহ স্থানান্তরিত করা হল। প্রায় দুশ' বৎসর সেখানেই সমাহিত ছিলেন সবুজ শান্তির মধ্যে আর মাউন্ট ঝোঙ-আনের জলকল্লোলের মধুরতায়। তারপর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সমাধিস্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল। আর তাঁর মরদেহ একবার করে নিখোঁজ হতে লাগল আবার হদিশ পাওয়া যেতে লাগল। বিংশ শতকে জাপান যখন চিনদেশ দখল করেছিল, তখন নানকিং-য়ে তাঁর মরদেহের অবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকটুকরো হাড় এবং এক থলি ভস্ম ছিল তাতে। জাপানে তা স্থানান্তরিত করার উপক্রম হচ্ছিল দেখে কোনক্রমে চিন সরকার তা রোধ করেছিল। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় ঐ দেহাবশেষ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ জাপানে যাবে। অন্য চার ভাগ চিনের নানা স্থানে সংরক্ষিত হবে।

কথিত আছে হিউয়েন সাঙের মাথার খুলি টিয়ানজিনের 'টেম্পল অব গ্রেট কম্পাসন'-এ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। পরে তা নালন্দায় চলে যায়। অভিযোগ ওঠে দলাই লামার বিরুদ্ধে। নিদর্শনটি নাকি বর্তমানে পাটনা যাদুঘরে আছে। সেচুয়ান প্রদেশে চেংদুর কাছে ওয়েনসু মঠেও খুলির অংশবিশেষ আছে। দাবী – সেটি সম্রাট-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের। সম্রাট পরিব্রাজকই বটে!

কী প্রবল আর্তি বুকে লালন করে যে এই প্রকার দুরূহ অভিযানে একা একা বেরিয়ে পড়া যায় তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য! পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে কিংবা পূর্বে। এ পারে শুধু মানব কল্যাণে নিয়োজিত মহামানবেরা। আমরা পারি বড়ো জোর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। কতকাল আগেকার কথা সেসব। ভগবান বুদ্ধকে শরণ করে হিউয়েন সাঙ গত হয়েছেন।

গত হলেও কোন মহাজীবনেরই কোন পরিসমাপ্তি (



জুয়ান জ্যাঙ মেমোরিয়াল হল, নালন্দা, বিহার